১০
সেরা
শিশুসাথী

শ্রী সুদীপ
Princip.. Secretary,
..ons School, Khulna.
সেরা
সম্পাদক
..নীল গঙ্গোপাধ্যায়
শিশুসাথী
১৩৯১

প্রকাশক :
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিমিটেড
স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী
৫-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
শুভ মহালয়া, ১৩৯১

প্রচ্ছদ :
অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

রেখাচিত্র :
সর্বশ্রী ফণী গুপ্ত, পূর্ণ চক্রবর্তী, বীতপাল, ধীরেন বল, শৈল চক্রবর্তী, নারায়ণ দেবনাথ,
সূর্য রায়, সমর দে, মৈত্রেয়ী মুখার্জী ও অন্যান্য।

সম্পাদনা :
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সহ-সম্পাদনা :
রবিদাস সাহারায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
সর্বশ্রী খোকনদা ও দীলিপদা, বাঁপ মুনশী, তপন জানা ও অন্যান্য।

মুদ্রণ :
ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও (প্রাঃ) লিমিটেড
১৮৫/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১২

মূল দাম—
বিশেষ পূজা ছাড়—
বর্তমান দাম— ২৫.০০

বই নং ০৫ সুদীপ্ত
KL-00228

সূচীপত্র

উপন্যাস :—

কবিতা ও ছড়া :—

প্রবন্ধ :—

নাটক :—

গল্প :—

অভিনন্দন

দীর্ঘদিন পর পুনরায় শিশুসাথীর বিশেষ সংকলন প্রকাশে অনেকেই ইহাকে অভিনন্দন জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। এ অভিনন্দন পাইবার প্রকৃত অধিকারী তাঁহারাই, যাঁহারা এই দীর্ঘ বাষট্টি বৎসরকাল শিশুসাথীকে অন্তরের স্নেহ দিয়া পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা ইহার শুভানুধ্যায়ী লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, শিল্পী-সংঘ এবং ইহার প্রতি সহানুভূতিশীল প্রত্যেককে — অভিনন্দন জানাইতেছি! তাঁহাদের শুভেচ্ছায় শিশুসাথী আরও সুন্দর, সুশোভন ও দীর্ঘজীবি হইয়া উঠুক, ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

শিশুসাথীর সহিত সংশ্লিষ্ট সকলেই এই আনন্দের দিনে আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

সুনীল সান্যাল

শিশু-সাথীর কাহিনী

সাগর—৭

শ্রীবরদাকুমার পাল

শিশু-সাথীর কাহিনী লিখিতে বসিয়া প্রথমেই আমরা শিশু-সাথীর প্রথম বর্ষের প্রথম পাতাখানি হুবহু তুলিয়া দিলাম।

শিশু-সাথী

১ম বর্ষ } বৈশাখ, ১৩২৯ { ১ম সংখ্যা

আমার কথা।

আমি আসিয়াছি—আসিয়াছি। তোমরা অনেক দিন হইতে আমার প্রতীক্ষা করিয়া আছ, তাহা আমি জানি। আমারও আসিবার আগ্রহ কম ছিল না, তবু আসিতে পারি নাই। সময় না হইলে ফলগাছে ফল ধরে না, ফুলগাছে ফুলের পাপড়ি খোলে না, তোমাদের পায়ের নীচে ঐ যে ঘাসগুলি, তাদের গায়েও নূতন পাতার শ্যামল শোভার বিকাশ হয় না। বিশ্ব-সংসারে সকলই সময়ের অধীন; কেবল সময়ই কাহারও অধীন নয়। আমিও এই বিশ্বসংসারের একটা টুকরা ত বটে, তা যত ক্ষুদ্র টুকরাই হই না কেন। আমারও সময় এত দিন পূর্ণ হয় নাই—তাই আমি আসিতে পারি নাই।

১৩২৯ সালের ১লা বৈশাখ শিশুসাথী প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল

শিশুসাথী আসিবার সময় যখন হইল, তার আগেকার কথা। ১৩২৮ সালের শীতকাল। শীতটা বেশ্ জমজমাট। আশুতোষ লাইব্রেরীর আফিস-ঘরে সান্ধ্য বৈঠকও খুব জমজমাট। সকল বৈঠকের মতই সেখানে রাজা-উজীর জার্মান-বলকান থেকে আলোচনা সুরু হইত, কিন্তু শেষ হইত ভিন্ন ভাবে—শিশু-সাহিত্য প্রকাশের পরিকল্পনায়। এ-রকম রোজই চলিত, এখনও চলে; তবে এখন সান্ধ্য-আইন এবং আরো সব আনুষঙ্গিক উপদ্রবে জমজমাট আর ততটা হইবার সুযোগ পায় না প্রায়ই।

যাক, যা বলিতেছিলাম। স্কুল-পাঠ্য বই প্রায় সব প্রকাশকই বাহির করে, আশুতোষ লাইব্রেরীও করে। কিন্তু খুব মৃদু সমালোচনা করিলেও একথা অকুণ্ঠ ভাবে বলা চলে, আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে স্কুলের পাঠ্যকে এমন এক সংকীর্ণ সরকারী গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় যে, তাহার মধ্যে পড়িয়া শিশুর স্বাধীন ও স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি লোপ পায়, শিশুর চিরজিজ্ঞাসু মন মরিয়া যায়। আশুতোষ লাইব্রেরীর যাঁরা নায়ক, তাঁরা শিশুশিক্ষার এ বিপদ উপলব্ধি করিয়াছিলেন অনেক দিন আগে। তাই তাঁহারা বহু পূর্ব্ব হইতে স্কুল-পাঠ্যের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর বাইরে বিশাল বিশ্বের দিকে শিশুর মনকে প্রসারিত করিয়া দিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ব্রত কিরূপে সুষ্ঠুভাবে পালন করা যায়, তাহারই আলোচনা চলিত ঐ সান্ধ্য বৈঠকে। আশুতোষ লাইব্রেরী শিশু-সাহিত্য প্রকাশে যে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে, তার এক প্রধান উৎস ছিল ঐ সান্ধ্য বৈঠক। আমি আশুতোষ লাইব্রেরীর প্রশস্তি কীর্ত্তন করিতে বসি নাই, শুধু এই পুস্তক-প্রকাশালয় যে আজ বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্য প্রকাশকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছে, সেই সর্ব্বজনবিদিত সত্যেরই পুনরুল্লেখ করিতেছি মাত্র।

যাউক সে-কথা। ১৩২৮ সনের এক শীতের বৈঠকে কথা উঠিল, ছোটদের মত একখানা মাসিক পত্রিকা বাহির করা যায় কিনা। এ বিষয় নিয়া কয়েক দিনই খুব আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, উপায়-অপায় বিশ্লেষণ চলিল। শেষে একটা পরিকল্পনা স্থির হইয়া গেল। সেই পরিকল্পনা অনুসারে শিশুসাথী বাহির হইল আশুতোষ লাইব্রেরীর অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত আশুতোষ ধর মহাশয়ের সম্পাদকতায় আর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরিচালনায়।
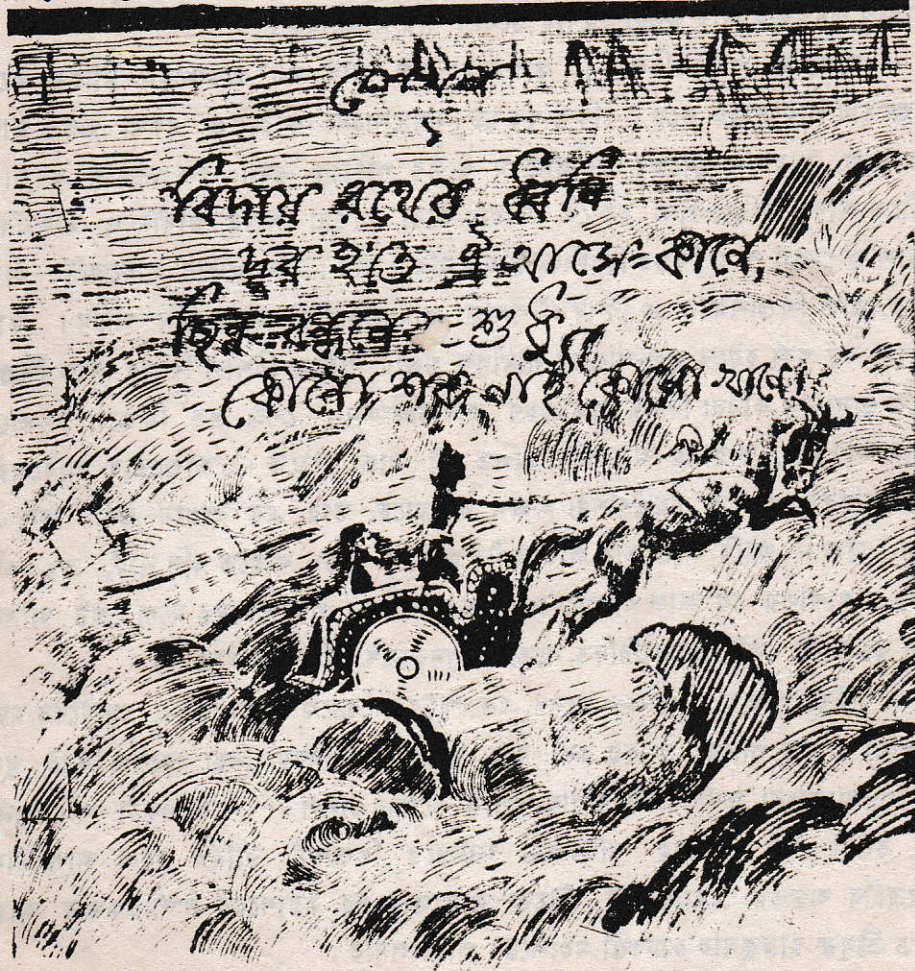
১
বিদায় রথের ধ্বনি
দূর হতে ঐ আসে কানে,
ছিন্নবন্ধনের শুধু
কোনো শব্দ নাই কোনোখানে।

ওই দেখি ভক্তের মূর্তি
বট-অশ্বত্থের ঋষি।
রবে-তার সংস্কার কায়াটি
ধ্যানধর গম্ভীর ছায়াটি,
মর্মরে বন্ধন মন্ত্র জাগায় রে
বিরাগী কোন্ সমীরণ।
১৩৫০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশীর্বাদ

অমলধারা ঝরনা যেমন
স্বচ্ছ তোমার প্রাণ
পথে তোমার জাগিয়ে তুলুক
আনন্দময় গান।
সম্মুখেতে চলবে যত
পূর্ণ হবে নদীর মতো,
দুই কূলেতে দেবে ভরে
সফলতার দান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯শ বর্ষের "বার্ষিক শিশুসাথী"
হইতে পুনর্মুদ্রিত
১৩৫১

আষাঢ়ে গল্প

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি. আই. ই., ডি. লিট্

বাঁশের মই, তার ঘাড়ে পা রেখে সবাই উঠে যায় উপরে খুব উঁচুতে—কেউ উঠে যায় মই বেয়ে স্বর্গে, কেউ যায় নেমে মই বেয়ে পাতালে—এই চলেছিল সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ ধরে!

অরূপ-সুন্দরী কন্যা—তাকে চুরি করে নিতে দৈত্যপুরী থেকে রাজপুত্র চলে গেল মই বেয়ে গগনস্পর্শী কেল্লার বুরুজ-ঘরে। চিলে-ঘরের ছাতের কানাচে পাখীর বাসা, পাঠশালার ছেলে সে-ও সেখানে উঠে গেল মই বেয়ে অধরা-পাখীর বাচ্ছা ধরতে! মেঘ-ছোঁওয়া গাছের

ফল-ফুল পাড়তে উঠে গেলো—বাঁশের মই বেয়ে মেয়েরা ছেলেরা সবাই! চিলও হার মানে যাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে এমন দুর্জ্জয় পাহাড়ের পাঁচিল তাকেও টপ্‌কে গেল বাচ্ছা সিন্দবাদ আর চোর চক্রবর্ত্তীর দল—মই বেয়ে! মই বেচারা সে আড় হয়ে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়েই থাকলো—উঠতে পেলে না কোনদিন আপনাকে ছাড়িয়ে একটুখানিও উপরে!

যে-মাটিতে মই দাঁড়িয়ে থাকে সত্য ত্রেতা দ্বাপর—সেই মাটি কলির আরম্ভে হঠাৎ একটা ভূমিকম্পে তলা থেকে একটা বিষম ধাক্কা দিয়ে মইখানাকে আধ আঙুল উপরে তুলে দিয়ে মজা করলে; মই সেই সময় চকিতের মতো নিজের মাথার উপরে না-দেখা যা-কিছু তাই দেখে নিয়ে কাত হয়ে পড়লো মাটিতে—উঁচু থেকে নীচে পড়ার ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেল সে সেদিন ঘন বর্ষার শেষ রাতে! তিনকেলে বুড়ো পাকা বাঁশের মই জলে না ভেজে সেই জন্যে বেঙ-রাজা হুকুম দিলেন, ওকে ছাতা দিয়ে মুড়ে রাখতে। সেদিন থেকে আপনার কাজ বন্ধ করে পড়ে রইলো মই আকাশের দিকে চেয়ে!

পাখী উড়ে চলে উপর থেকে উপরে। ছাগলছানা লাফিয়ে ওঠে পাহাড়ের চূড়োয়। আটাকাটি দিয়ে ধরে পাখী ছেলেরা, বাঁশের আঁকসি দিয়ে উঁচু ডালের ফুল পেড়ে নেয় মেয়েরা, উড়ো কলের পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে চলে যায় রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালের পুত্র, কত পুত্র মিত্র তার ঠিক-ঠিকানা নেই—আজবদেশের দিকে মেঘ ছাড়িয়ে, সাত সমুদ্র পেরিয়ে! মইখানা এই সব কাণ্ড-কারখানা দেখে আর দুঃখু পায়। বাঁশের ছিপ দিয়ে যখন টেনে তোলে অতল জলের তলা থেকে মৎস্য-কন্যাকে মেছুয়ার দল—মই দেখে আর দুঃখু পায় আর মনে মনে বলে—আর কি আমার কাজ আছে বেঁচে থেকে?

এমনি দুঃখের ঘুণ্ বাঁশের মইকে ভিতরে ভিতরে ফোঁপরা করে যখন দেয় তবে সে দেখতে পায় সুখদুঃখের উপরের বাসায় ধরা আছে যত কিছু অধরা অজানা না-দেখা তাদের!

জীবনের মধু-নিশীথে জাগো মাধবী!
আনো ধরণীতে চাঁদের প্রতিচ্ছবি।
সুরভি তোমার, নবরূপ, মাধবিকা,
মাখাক চৈত্র-ভালে চন্দন-লিখা।

নজরুল ইসলাম

[কাজী নজরুল ইস্‌লামের এই অপ্রকাশিত কবিতাটি শ্রীকল্যাণ দাসের সৌজন্যে প্রাপ্ত]
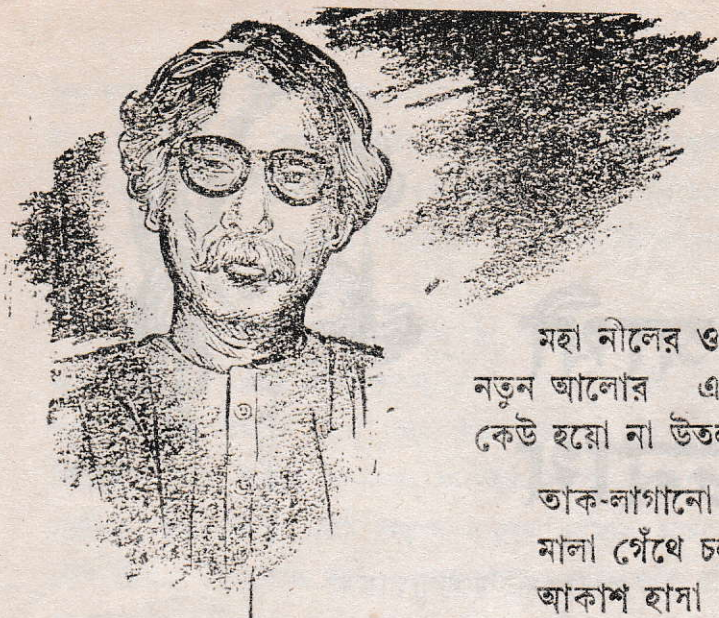
মহা নীলের ওপার থেকে যদি
নতুন আলোর   এসে থাকে ডাক,
কেউ হয়ো না উতলা ; হয়ো না অবাক !

তাক-লাগানো দিন ও বছর, যুগ,
মালা গেঁথে চলছে সে, চলুক।
আকাশ হাসা   দিনের ঝঙ্কারে,
কেন,
জাগার ঝাঁক ?

তুমি যতই হও দুরন্ত, অবুঝ,
বন্ধু তরুণ ! কচি ! দারুণ ! সবুজ !
তোমার সাথেই সব অচেনার
জানা-শুনোর জাঁক !

দাও হেসে সে সথার মালায় ধরা,
তোমার মালাও, চলুক, সুরু-করা !
আলোর ডাকের আসার পরে আসার
আশা
পূর্ণ হয়ে যাক্ !*

১৩৬৮

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

* 'আশীর্ব্বাদ ও আশীর্ব্বাণী' পুস্তক থেকে পুনর্মুদ্রিত।

॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥

তোমাদের মনে রোজ কত কল্পনা আসে। কখনও মনে হয় অনেক দূরে বেড়াতে যাবার কথা। কখনও মনে হয় গাছে দোল্‌না বেঁধে নানা রকম খেলার কথা। কখনও বা ভাবো বড় হলে কি করবে—এই রকম আরও কত কি! তোমাদের মনের কথা খুব ভালো করে বুঝতে পারতেন যিনি, সেই ছেলেভুলানো মানুষটির কথাই তোমাদের কাছে খানিকটা বলছি। পৃথিবীর লোকে তাঁকে জানে কবি এবং জ্ঞানী গুণী বলে। কিন্তু তিনি যে ছিলেন তোমাদেরও মস্ত খেলার সাথী সে কথাও তোমাদের কাছে বলা দরকার। বড় হয়ে তোমরা পড়বে তাঁর লেখা শারদোৎসব নাটক; তাতে দেখবে শরৎকালের ভোরবেলা এই মানুষটির মনের মানুষ ঠাকুর্দা ছেলের দলকে নিয়ে খেলতে বেরিয়েছেন বেতসিনী নদীর ধারে। শরতের রোদে ছেলের দল ঠাকুর্দাকে ঘিরে ধরে গান ধরেছে আনন্দে। আজ পৃথিবী জুড়ে যাঁর জন্ম শতবার্ষিক উৎসব হচ্ছে, সেই রবীন্দ্রনাথ তোমাদের জন্যেই গড়লেন এমন একটি বিদ্যালয়, যেখানে লেখাপড়াকে জুজুর মতন ভয় করতে হবে না। সেখানে তোমাদের মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে পড়ার মধ্যে, কাজের মধ্যে আনন্দ পায়, সেইটাই হল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি চাইতেন তোমরা যেন প্রাণ খুলে বলতে পার

'মোদের যেমন খেলা, তেমনি যে কাজ,
জানিস্ নে কি ভাই,
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।'

বর্ষাকালে যখন ঘনঘটা করে বৃষ্টি আসে, তখন তোমরা নিশ্চয়ই আনন্দে লাফাতে থাক। মনে মনে কত ছবিই না তোমরা আঁক। তোমাদের মনের কথাটাই তিনি জানতেন বলে লিখেছিলেন,

"এমনি তরো মেঘ করছে সারা আকাশ ব্যেপে,
রাজপুত্তুর যাচ্ছে মাঠে একলা ঘোড়ায় চেপে।"

আবার মনে হয়, বাঃ চারিদিক কেমন সবুজ হয়ে গেছে বর্ষাকালে ; কোথায় ছিল এই সবুজ পাতা আর ঘাসের দল। তোমাদের হয়ে সে কথাটাও তিনি লিখেছেন কবিতার মধ্য দিয়ে—

"যেমনি মাগো গুরু-গুরু মেঘের পেলে সাড়া,
যেমনি এল আষাঢ় মাসে বৃষ্টি জলের ধারা
পূবে হাওয়া মাঠ পেরিয়ে যেমন পড়ল আসি,
বাঁশবাগানে শোঁ শোঁ করে বাজিয়ে দিল বাঁশি—
অমনি দেখ্ মা চেয়ে, সকল মাটি ছেয়ে
কোথা থেকে উঠল যে ফুল এত রাশি রাশি।"

তোমাদের মনের ভিতরকার কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ লিখতে পেরেছিলেন তোমাদের মতন করে পাঠ্যপুস্তক—"সহজ পাঠ", "ইংরাজী শ্রুতিশিক্ষা", "ইংরাজী সোপান", "অনুবাদ চর্চা" ইত্যাদি। কেমন করে ভাষা শেখাতে হয়, সে সম্বন্ধে নিজে ভেবে তোমাদের এবং তোমাদের মাস্টারমশাইদের জন্য লিখেছেন সহজ করে ঐসব বই। তোমাদের ছোট ভাইবোনদের মজার মজার কাণ্ড দেখে তোমরা কত না আনন্দ পাও। রবীন্দ্রনাথও ছোট্ট খোকার রকম দেখে তার মার কি আনন্দ হয়, তা প্রকাশ করেছেন এই ভাবে—

"কিসের সুখে সহাস মুখে নাচিছ বাছনি
দুয়ার পাশে জননী হাসে হেরিয়া নাচনি।"

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রথম আরম্ভ হয় কয়েকটি শিশুকে নিয়েই। নাম হল ব্রহ্ম বিদ্যালয়। খেলা, পড়া, কাজ—সবটাই একসূত্রে বাঁধা। ছোটরা যাতে নিজে নিজে কিছু রচনা করতে পারে, তার জন্য বিদ্যালয়ে হাতেলেখা কাগজ বার হত কতকগুলি—সেগুলির নাম 'পঞ্চমী', 'প্রভাত', 'বাগান', 'শান্তি' ইত্যাদি। ছাত্ররা সাহিত্য-সভা পরিচালনা করত। নিজেরাই সভা সাজায়, নিজেদের লেখা প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা পড়ে, গান করে, অভিনয় করে। এমন কি সভার শেষে সাধারণের বক্তব্যে সভার সব কিছুই সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করার চেষ্টা করে। এইসব সভার অনেকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে উপস্থিত থাকতেন। এমনভাবে ছোটদের মধ্যে যার যে রকম ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতার চর্চা করার পুরোপুরি সুযোগ পায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশু বয়সে বিদ্যালয়েব মধ্যে এইসব দিকের অভাব অনুভব করেছিলেন বলেই বড় হয়ে শিশুদের জন্য এই রকম একটি বিদ্যালয় তৈরী করলেন।

শিশুদের উৎসাহে তিনি কখনো বাধা ত দেনই নি, বরং আরও উৎসাহ দিয়েছেন। একবার

একদল ছেলে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির—তাদের হাতে লেখা পত্রিকা 'হাতেখড়ি'র জন্য কয়েক ছত্র লিখে দেবার জন্যে। গুরুগম্ভীর জিনিস গুরুগম্ভীর চালে লেখা চলে; কিন্তু সহজ করে কিছু লেখা বেশ কঠিন - এই কথাটাই তিনি ছেলেদের জানিয়ে দিলেন কয়েক ছত্র কবিতা লিখে—

"লেখার কথা মাথায় যদি জোটে লিখতে তখন পারি আমি হয়ত,
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে যা' তা' লেখা তেমন সহজ নয়ত।

ছোট মেয়েরা গেল তাদের হাতে লেখা "গুরুপল্লী" পত্রিকা নিয়ে। লিখে দিলেন এরোপ্লেন সম্বন্ধে একটা কবিতা—

"ওরে যন্ত্রের পাখী, ওরে রে আগুনখাকী
এ কি ডানা মেলি আকাশেতে এলি,
কোন্ নামে তোরে ডাকি ?"

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা যাতে নিজেরা অভিনয় করতে পারে, সেইরকম একটি নাটক তিনি লেখেন ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহাসিক একটি কাহিনী নিয়ে। নাম দেন "মুকুট"।

তাঁর শেষ বয়সে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের অনুরোধে তিনি লেখেন তাঁর নিজের শিশুকালের কাহিনী "ছেলেবেলা"। এই বইএর শেষে তিনি 'বালক' নাম দিয়ে যে কবিতা লিখে তাঁর ছেলেবেলার ছবিটি ফুটিয়ে তুলেছেন, তার থেকে কিছুটা এখানে তুলে দিলাম—

"বয়স তখন ছিল কাঁচা, হাল্‌কা দেহখানা
ছিল পাখীর মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।
উড়ত পাশের ছাদের থেকে পায়রাগুলোর ঝাঁক,
বারান্দাটার রেলিং'পরে ডাকত এসে কাক।

... ...

বেহালাটা হেলিয়ে কাঁধে ছাদের 'পরে দাদা
সন্ধ্যাতারার সুরে যেন সুর হোত তাঁর সাধা।
জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজী পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে ঘের দেওয়া তাঁর শাড়িটি লালপেড়ে।
চুরি করে চাবির গোছা লুকিয়ে ফুলের টবে
স্নেহের রাগে রাগিয়ে দিতেম নানান উপদ্রবে।

জানার সঙ্গে আধেক জানা, দূরের থেকে শোনা
নানা রঙের নানা সুতোয় সব দিয়ে জাল-বোনা।
নানা রকম ধ্বনির সঙ্গে নানান চলাফেরা
সব দিয়ে এক হাল্‌কা জগৎ মন দিয়ে মোর ঘেরা।
ভাবনাগুলো তারি মধ্যে ফিরত থাকি থাকি,
বানের জলে শ্যাওলা যেমন মেঘের তলে পাখি।"

এমনি কত ভাবেই তিনি তোমাদের কল্পনা, চিন্তা ও কাজের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন।

শিশুসাথী রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকীতে তোমাদের মনে যদি সঙ্কল্প জাগে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে তাঁকে আরও ভালো করে জানবার ও বুঝবার, তবেই এই শতবার্ষিক উৎসব পালন সফল হবে।

ভেক ও ষাঁড়

কেউটে কুড়ির বিল,
তা'তে ছুড়্‌লে পরে ঢিল,
দেখ্‌তে পারো বেঙের নাচন—
কিল্ বিল্, কিল্ বিল্!

তা'তে একটা ছিল ব্যাঙ্,
তার লম্বা সরু ঠ্যাং;
বাদ্‌লা দিনে গাল ফুলিয়ে
ডাক্‌ত' ঘ্যাংঙর ঘ্যাং!

তার বড্ড ছিল জাঁক,
কথায় লাগিয়ে দিত তাক্!
বল্‌ত' সদা—একলা আমি
মারতে পারি লাখ!

সে-দিন নাম্‌রু মিঞার ষাড়
এল চর্‌তে বিলের ধার;
ব্যাঙ্‌টা বলে,—তফাৎ রহ
ছোট্ট জানোয়ার!

রাগে ফুলিয়ে দেহখান,
তিনি ষাঁড়টী হ'তে চান্,
শেষ কালেতে পেট্‌টা ফেটে
হলেন লবেজান!!

১৩২৯

—হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত

বিয়েপাগ্‌লার দুর্গতি

এহেন বাগচি মশায় ষাট বৎসর বয়সে তাঁর গৃহলক্ষ্মীটিকে হারিয়ে আবার বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠলেন! টাকা থাক্‌লে ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্যে এই হতভাগা দেশে মেয়ের অভাব হয় না। রামতারণের বড় ছেলে হরিতারণের বয়স তখন প্রায় চল্লিশ; তারও ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। তবু কালাচাঁদপুরের কানাই ভাদুড়ী তার বার বছরের মেয়ে রাইকিশোরীকে বুড়া রামতারণের হাতে সম্প্রদান করবার সঙ্কল্প করল!

বাগচি মশায়ের বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল; নব বধূর জন্যে তিনি ভাল ভাল সোনার গহনার ফরমাস দিয়ে স্যাকরার হাতে একশখান গিনি তাঁর সিন্দুক থেকে বের ক'রে দিলেন; কারণ মেয়ের বাপ কানাই ভাদুড়ী তাঁকে ব'লেছিল যদি তিনি তার মেয়েকে সত্তর ভরি গিনি সোনার গহনা আর বিয়ের খরচের জন্যে তাকেও নগদ তিনশ' টাকা দিতে রাজী না হন, তা হ'লে সে তাঁর হাতে কন্যা সম্প্রদান করবে না। বাগচি মশায় কিন্তু সস্তায় উদ্ধার হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কানাই ভাদুড়ী এক পয়সাও কমে রাজী হ'ল না; অগত্যা বুড়ো তার প্রস্তাবেই সম্মত হ'য়ে খুব উৎসাহের

সঙ্গে বিয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। বাগচি মশায়ের কোন কোন বন্ধু বল্‌লেন, "ভায়া, বিয়েতে বিস্তর পয়সা খরচ কর্‌চো; কিছু বাদ্যভাণ্ডের আয়োজন কর।"

বাগচি মশায় হেসে বললেন, "না, না; সে সব হাঙ্গামায় আর দরকার নেই দাদা! বয়সটা একটু বেশী হয়েছে কি না; আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েও সাতটি বর্ত্তমান—এ অবস্থায় এই শুভকর্ম্মে যদিস্যাৎ বাদ্যভাণ্ড করা যায়, তবে সেটা কিঞ্চিৎ দৃষ্টিকটু হবে; তার আর আবশ্যক নেই।"

আমাদের বাল্যবন্ধু মুনু ভাদুড়ী সে সময় সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে মাথা নেড়ে বল্‌ল, "আপনি ও কি কথা বল্‌ছেন, জ্যাঠা মশায়? শুভকর্ম্মের অঙ্গহানি! এ অতি অসঙ্গত কথা। একদল রশুন-চৌকী, একদল ব্যাগপাইপ, আর একদল ইংরাজি বাজনা আনা চাই-ই। তা ছাড়া ঢাক, ঢোল, চড়বড়ে শানাই, এ সকল ত থাক্‌বেই।"

বাগচি মশায় বল্‌লেন, "ঢাক কি হবেরে মুনু! ঢাক বাজিয়ে কেউ কি বিয়ে কর্‌তে যায়? বিয়েতে ঢাকের বাদ্যির রেওয়াজ নেই।"

বাগচি মশায়ের আগের পক্ষের সম্বন্ধী জটাধারীও সেই মজলিশে উপস্থিত ছিল; সে বল্‌ল, "হাঁ, সাধারণ বে-থাওয়ায় ঢাকের বাদ্যির রেওয়াজ নেই বটে, কিন্তু বাট বছরের পাকাগুঁফো খোকার বিয়ে যে অসাধারণ ব্যাপার! আপনি এই কচি বয়সে যে অসাধারণ কাজ কর্‌তে ব'সেছেন, সেই কীর্ত্তি ঘোষণা কর্‌বার জন্যে ঢাকের আমদানী করা নিতান্তই দরকার।"

বাগচি মশায় গর্জ্জন ক'রে বল্‌লেন, "যাও, যাও, ফাজিল ছোকরা কোথাকার! আমাকে ঠাট্টা?"

—দীনেন্দ্রকুমার রায়

১৩৩১

ঘুণ

তোমরা বোধ হয় মনে করিতেছ, ঘুণের পোকারা উড়িয়া কাঠের ও বাঁশের উপরে বসে এবং সেখানে দাঁত দিয়া ছিদ্র করে। কিন্তু আসল ব্যাপার তাহা নয়। ঘুণের পোকারা পতঙ্গ জাতীয় প্রাণী। তাই ডিম হইতে ইহাদের শুঁয়ো-পোকার মতো বাচ্চা বাহির হয় এবং পরে সেইগুলিই বড় হইয়া ডানা-ওয়ালা ঘুণের পোকা হইয়া দাঁড়ায়। ঘুণের পোকারা যখন শুঁয়ো-পোকার আকারে থাকে, তখনি উহারা কাঠে ও বাঁশে ছিদ্র করে এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া কাঠ খাইয়া ফেলে। কিন্তু ছিদ্র করার সময়ে বিশেষ শব্দ হয় না। সেই কটাস্ কটাস্ শব্দ ডানাওয়ালা ঘুণেরাই উৎপাদন করে। কি রকমে করে, তাহা বোধ হয় তোমরা জানো না। বড় বড় ঘুণেরা প্রথমে তাহাদের বাচ্চাদের তৈয়ারী গর্ত্তের ভিতরে প্রবেশ করে এবং তারপরে কঠিন আবরণে ঢাকা মাথাগুলিকে

গর্ত্তের গায়ে ঠুকিতে থাকে,—ইহাতেই "কটাস্ কটাস্" শব্দ হয়। তোমরা "চিড়ে-কোটা" পোকা দেখিয়াছ কি? এই পোকাদেরও সর্ব্বাঙ্গ কঠিন আবরণে ঢাকা থাকে। চিড়ে কোটার সময়ে ঢেকি যেমন উপর-নীচে যাওয়া-আসা করে, চাপিয়া ধরিলে এই পোকারাও সেই রকমে মাথা উপর-নীচে করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করিতে থাকে। ঘুণের পোকারাও কতকটা এই রকমেই গর্ত্তে মাথা ঠুকিয়া শব্দ করে।

অনেক দিন পরে বৃষ্টি হইলে রাত্রিকালে পুকুরে ব্যাঙেরা কি রকম কলরব আরম্ভ করে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। "গোঁ—গাঁ, কোঁ—কাঁ, কটর্—কটর্, কট্—কট্" এই রকম নানা শব্দ ব্যাঙেদের গলা হইতে বাহির হয়। তাহাদের চোখে আর ঘুম থাকে না, সমস্ত রাত্রিই তাহারা চীৎকার করিয়া কাটাইয়া দেয়। কেবল ব্যাঙেরাই যে এ রকম চীৎকার করে, তাহা নয়। একটু আনন্দ হইলে পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীই চীৎকার করিয়া দুই-চারিটি সঙ্গীকে কাছে আনিতে চায়। তোমরা একা থাকিতে ভালবাস কি? একা থাকিলেই প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। তখন দুই একজন বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া গল্প করিতে ইচ্ছা হয়। ঘুণের পোকাদের মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। ইহারা একা থাকিতে চায় না। তাই কাঠের ভিতরকার গর্ত্তের গায়ে মাথা ঠুকিয়া ইহারা যে শব্দ করে তাহা শুনিয়া সঙ্গীরা আসিয়া জুটে। তাহা হইলে দেখ, ঘুণ-পোকাদের সেই "কটাস্ কটাস্" শব্দ সঙ্গীদের ডাকিয়া আনার জন্য সঙ্কেত ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে দেখিবে—কোনো জায়গায় ঘুণের পোকারা শব্দ করিতে আরম্ভ করিলে, ঘরের অন্য জায়গা হইতে অন্য পোকারা শব্দ করিয়া সাড়া দেয় এবং যেখানে একটি পোকা ছিল কিছুক্ষণ পরে সেখানে চারি-পাঁচটি পোকা আসিয়া মিলিত হয়।

১৩৩৩ —জগদানন্দ রায়

কেনারাম

"ঠাকুর আমাকে গ্রহণ করিলে না? কেনই বা করিবে? তুমি দেবর্ষি নারদ, দেবলীলা গান করিয়া বেড়াও। আমি দস্যু—আমার প্রতি দয়া হইবে, এমন সুকৃতি আমি কি করিয়াছি!"

এই বলিয়া কেনা পুনরায় খাণ্ডা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিজ হাতে নিজের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত হইল।

এইবার বংশিদাস তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম, আজি হইতে তুমি মায়ের নামে কেনা হইয়া কেনারাম নাম সার্থক করিলে। তুমি আজি হইতে আমার

গৃহে আইস, তোমাকে মন্ত্র দিব।" যদিও কেনার চেহারা ছিল অতি ভীষণ, কিন্তু তাহার কণ্ঠ ছিল কোকিল-কণ্ঠের ন্যায় মিষ্ট। দ্বিজবংশী তাহাকে ভাসান গান শিখাইলেন। ক্রমে—

এক দুই দিন যায় গুরু সঙ্গে থাকি,
কেনারাম শিখে গীত পিঞ্জিরার পাখী।

আকাশ ছাপাইয়া গান যায় স্বর্গপুরে;
মৃদঙ্গ বাজাইয়া কেনা বাড়ী বাড়ী ঘুরে।
কক্ষেতে ভিক্ষার ঝুলি "মুক্তি ভিক্ষা চাই,"
এক মুষ্টি চাউল পাইলে খুসী হইয়া যাই।
নাইচা গাইয়া ফিরে যেমন ভাবের পাগল,
গাইতে গাইতে কেনার চক্ষে আসে জল।
যারে দেখ্যা দেশের লোক আগে পাইত ভয়,
তাহারে ডাকিয়া লোকে গীত গাইতে কয়।
যাহারে দেখিলে লোকের উড়িত পরাণ,
শুনিলে তাহার গান গলয়ে পাষাণ।
শিউরি উঠিত লোক যে কেনার নামে,
পাগল হইয়া যায় সে কেনার গানে।
পাষাণ মানুষ হইল মহাজনের বরে,
কেনারাম গায় গীত প্রতি ঘরে ঘরে।
কেনারাম গায় গীত ঝরে বৃক্ষের পাতা,
পয়ার প্রবন্ধে ভণে দ্বিজবংশী-সুতা।

১০০৪

—ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন

নূতন বছর

বুক ফুলিয়ে ভর্‌সা করে' বলো দেখি ডেকে।
সত্য ছাড়া, মিথ্যা কথা বল্‌বো না কাল থেকে॥
পরের জিনিস নেবো না কো অসাক্ষাতে তার।
লোভের মত পাপ নাইকো রাখবো জেনে সার॥
সকল সময় শুন্‌বো আমি গুরুজনের কথা।
ইতর জীবের প্রাণে আমি দিব নাকো ব্যথা॥
ঝগড়া বিবাদ কারো সনে কর্‌বো নাকো আর।
শিখবো সতের সঙ্গে থেকে সাধু ব্যবহার॥
রাগটা বড় খারাপ, সেটা ছাড়বো করে পণ।
কাল থেকে ঠিক পড়াশুনায় দিব আমি মন॥
এ সব কথা শোনো যদি আমায় ভালবেসে।
সার্থক হয় নূতন বছর তোমার কাছে এসে॥

১৩৩৭

—নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

চোর সাঁওতালের সাধু পুত্র

সে বহুকালের কথা।

বদন্ মাঝি সাঁওতাল বড্ড চোর ছিল। পরের জিনিষ যা দেখ্‌তে পেতো, তাই সে চুরি কর্‌তো। এই রকম করে চুরি কর্‌তে কর্‌তে, সে ক্রমে একজন পাকা চোর হয়ে উঠলো। তখন সে একদিনও চুরি না করে স্থির থাক্‌তে পার্‌তো না—চুরি না কর্‌লে, সে দিন তার গা' যেন আটি-মাটি কর্‌তো।

এইভাবে দিন যেতে যেতে, সে-বৎসর অগ্রহায়ণ মাস এলো। তখন মাঠে মাঠে কাটা-ধান পড়ে আছে। বদন্ মাঝি এখন মনের সুখে, রাত্রিবেলায় সেই কাটা-ধান চুরি কর্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু সে একা কতই বা চুরি কর্‌বে? তাই সে মনে মনে, তার একজন জুড়িদার খুঁজ্‌তে লাগলো।

অনেক ভেবেও সে তার মনের মত জুড়িদার হবার লোক ঠিক কর্‌তে পার্‌ল না! পাঁচ-কান হ'লে, তার চুরিবিদ্যা ধরা পড়্‌বে, এই ভয়ে সে অপর কোন লোককে না ব'লে, তার মেঝান্‌কে বল্ল—'দেখ বহু (স্ত্রী), আজ তুই আমার সঙ্গে চল্। আমরা দু'জনে ধান চুরি করে হাঁকুপাকু (শীঘ্র শীঘ্র) বয়ে নিয়ে আস্‌বো। আমি একলা আন্‌লে, কতই বা আন্‌বো—আর তাথে আমাদের ক'দিনই বা চল্‌বে? তাই বল্‌ছি—তুই চল্; আমরা দু'জনে গেলে, ঢের করে ধান আন্‌তে পার্‌বো।'

তার বহু বল্ল—'আমি যাব নাই—তুই একাই যা কেনে। আমি মেয়েমানুষ—লোকে তেড়ে এলে, আমি তোর সঙ্গে দৌড়ে পালাতে পারবো কেনে?'

মেঝান্ রাজি হলো না দেখে বদন্, তার তের বছরের ছেলে সোরাইকে বল্ল—'বেটা, তুই আমার সঙ্গে চল্, আমি ধান বেন্ধে দিব, আর তুই মাথায় করে বয়ে আন্‌বি।'

সোরাই বল্ল—'মাঠে মাঠে পাহারাদার বেড়ায়—তা'রা যদি আমাদের ধরে ফেলে?'

বদন্—না বেটা, আঁধার রাত—কেউ আমাদের দেখ্‌তে পাবে না। আমি ত এই কাজই এতদিন কর্‌ছি—কৈ, কেউ ত আমায় ধর্‌তে পারে নাই! কোন্ সময়ে, কোথায় কোন্ মাঠে চুরি করি, তা আজ পর্য্যন্ত কেউ জান্‌তে পারে নাই! তোর কোন ভয় নাই—তুই আয় আমার সনে—চুরি কর্‌তে যাবার এই ত ঠিক্ সময়।

বদন্ মাঝি, আর তার বেটা সোরাই—দু'জনে কেদে-দড়ি (কাস্তে-দড়ি) নিয়ে, ধানের ক্ষেতে ধান চুরি কর্‌তে চল্‌লো।

—শিবরতন মিত্র

১৩৩৭

লড়াইএর কায়দা

পশু, পাখী, পোকা-মাকড়দের মধ্যেও রীতিমত লড়াই বাধে। তবে, মানুষের লড়াইএর সঙ্গে এই লড়াইএর তফাৎ এই যে, এদের আল্‌গা অস্ত্র থাকে না। একেবারেই যে থাকে না এমন কথা বলা চলে না, কারণ, বানরদের অনেক সময় পাথর নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ কর্‌তে দেখা গেছে। তা'রা পাথর ছুঁড়ে মার্‌তে জানে না—গড়িয়ে ফেলে দেয়। শত্রু নীচে থাক্‌লে তাদের এ অস্ত্র কাজে লাগে।

অনেকের আবার স্বাভাবিক অস্ত্রও থাকে। এক জাতের গোবরে পোকা আছে তাদের "কামানবাজ গোবরে পোকা" (Bombardier Beetle) বলে। কেউ এদের আক্রমণ করলে প্রথমে পালাতে আরম্ভ করে। যখন শত্রু খুব কাছে আসে, তখন এরা শরীরের পিছন দিক থেকে ফুস্ ক'রে এক রকম হাওয়া ছাড়ে যা'র দুর্গন্ধে শত্রুকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছেড়ে সরে পড়্তে হয়!

দল বেঁধে লড়াই করাও—জানোয়ার, পোকা-মাকড়দের মধ্যে অনেক দেখা যায়। পিঁপড়েরা তো এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ। এমন কি, কোন কোন জাতের পিঁপড়ে দল বেঁধে বড় বড় জানোয়ারকেও আক্রমণ করে। নিজেদের জাতের সঙ্গেও কোন কোন সময়ে লড়াই বাধে। বানরেরাও অনেক সময় দল বেঁধে লড়াই করে। হিংস্র জন্তু দল বেঁধে লড়াই করে না।

মানুষের মধ্যে যেমন আপোষে লড়াই হয়, জানোয়ারেরাও সে রকম আপোষে লড়ে। তবে, অনেক সময়ই এদের আপোষের লড়াই শেষটায় মারামারিতে দাঁড়ায়। মানুষের লড়াইএ প্রায়ই মধ্যস্থ থাকে; তা'র বিচারে যে জিতে সেই জয়ী হয়। আবশ্যক হ'লে মধ্যস্থ লড়াই থামিয়েও দিতে পারে। বক্সিংএর প্রতিযোগিতায় অনেক সময়ই লড়াই থামাবার দরকার হয়। জানোয়ার, পোকা-মাকড়দের লড়াইএ মধ্যস্থ থাকে না; কাজেই শেষটায় অনেক সময়ই বিভ্রাট ঘটে। পোকার লড়ায়ে অনেক সময় দেখা যায়, যে জিতে সে অন্যকে খেয়ে ফেলে! জানোয়ারের লড়াইএ অনেক সময় একজন আর একজনকে মেরে ফেলে। সব সময় যে ইচ্ছা ক'রে মারে এমন নয়; হয় তো শিংএর গুঁতাগুঁতি কর্তে গিয়ে একজন আর একজনের পেটেই শিং বসিয়ে দিল।

১৩৩৮ —সুবিনয় রায়

মূলে ভুল

সৌভাগ্য, সম্পদ, যশঃ, ঐশ্বর্য্যের করিতে সন্ধান,
চলিয়াছে মানুষের চিরকাল কত অভিযান—
কত রক্তক্ষয়, কত সাধনার সমুদ্র-মন্থন,
কত প্রাণপণ চেষ্টা—কত মরু গিরি উল্লঙ্ঘন!

ধনী হ'তে মানী হ'তে সবে চায়,—চাহে না কেবল
মানুষ হইতে কেহ; এসংসার কি ভ্রান্তি-বিভল!
পাণ্ডিত্যের নামে করে ছেলেখেলা শুধু মূর্খতার,—
মূলেই ভুলের বাসা—রথে এসে কলা বেচা সার!

১৩৪০ —অক্রূরচন্দ্র ধর

হিত-বচন

দেহের মঙ্গল যদি চাহ তুমি করিতে সাধন,
প্রতিদিন সযতনে বাসস্থান করিও মার্জ্জন।
আত্মার মঙ্গল যদি কর তুমি একান্ত কামনা,
রাখিতে চিত্তের শুদ্ধি অবহেলা ক'রো না, ক'রো না।
আবর্জ্জনাপূর্ণ গৃহে অতিথিরে কে দেয় আসন ;
পঙ্কিল হিয়ায় তুমি করিবে কি প্রভুরে বরণ ?

—শেখ ফজলল্ করিম

১৩৪২

সভ্যতার জন্মকথা

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

জল ও বাতাস আমরা খুব সহজেই পাই, তাই জীবন ধারণের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হলেও আমরা এদের বেশী মূল্য দেই না। এগুলি ভগবানের দান এবং আমাদের এতে ন্যায্য অধিকার আছে, এই কথাই আমরা মনে করি। কিন্তু মানুষের আবিষ্কারের মধ্যেও এমন অনেক জিনিষ আছে যা আমাদের জীবন ধারণের পক্ষে প্রায় জল-বাতাসের মতই প্রয়োজনীয়, অথচ সহজেই পাওয়া যায় বলে এবং বহুকাল যাবৎ তার ব্যবহারে অভ্যস্ত থাকায় আমরা তার প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে খুব সচেতন নই। জল ও বাতাসের মতই আমরা তাকে স্বাভাবিক বলে মনে করি, এবং তার পশ্চাতে যে মানুষের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও ধীশক্তি কি পরিমাণে কাজ করেছে তা এক রকম ভুলেই যাই।

অ্যাটম বোমা আবিষ্কারের কথা আজ লোকের মুখে মুখে চলেছে। এত বড় বিস্ময়কর আবিষ্কার পৃথিবীতে আর হয় নাই এবং এর ফলে পৃথিবীর সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন হবে অনেকেই এরূপ মনে করেন। কিন্তু এমন অনেক আবিষ্কার মানুষে করেছে যার ফলে মানব-সভ্যতার আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে—অথচ তার কথা আমরা একবারও ভাবি না। আজ এমনি দু-একটি আবিষ্কারের কথাই আলোচনা করব।

প্রথমেই মনে পড়ে আগুনের কথা। আগুন না থাকলে আমাদের জীবনযাত্রা চলে না। কারণ কাঁচা জিনিষ খেয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। আর বিদ্যুতের আবিষ্কারের পূর্ব্বে হাজার হাজার বছর আগুন না থাকলে লোককে রাত্রে অন্ধকারে থাকতে হ'ত। এখনও অধিকাংশ লোকই আগুনের সাহায্যেই রাত্রে কাজ করে। বিদ্যুৎ বা আধুনিক বড় বড় আবিষ্কার (টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে, ষ্টীমার, রেডিও, এরোপ্লেন প্রভৃতি) আমাদের খুবই কাজে লাগে এবং মানুষের সুখ-সুবিধা অনেকগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে, একথা খুবই সত্য। কিন্তু এ সকল আবিষ্কারের চেয়ে আগুনের আবিষ্কার অনেক বড় জিনিষ। কারণ এগুলি না থাকলেও মানুষ বাঁচতে পারে এবং আমাদের পিতামহ বা প্রপিতামহগণ পর্য্যন্ত এ ছাড়াও বেঁচে ছিলেন। কিন্তু আগুন ছাড়া যে মানুষ বাঁচতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না, অন্ততঃ যে প্রকার মানুষ বাঁচতে পারে তাদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা দূরের কথা, সাদৃশ্য কল্পনা করাও কঠিন।

মানব সমাজের আদিম অবস্থায় আগুনের ব্যবহার জানা ছিল না। তখন তাদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল আজকের দিনে আমাদের তা ভাবতে গেলেও অদ্ভুত মনে হয়। অনেকে হয়ত মনে করতে পারে যে, সুপক্ক ও সুস্বাদু অনেক ফল তাদের প্রধান আহার ছিল। কিন্তু তা নয়। কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্য ও ফল উৎপাদন—এও আর একটা বড় আবিষ্কার তখন মানুষের জানা ছিল না। বন্য সহজ-জাত ফলমূল ও পশু-পক্ষীর মাংসই ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। এগুলি কাঁচা খেয়েই তাদের বাঁচতে হ'ত—এ বিষয়ে জীবজন্তুর সাথে তাদের বিশেষ প্রভেদ ছিল না। রাত্রের অন্ধকার দূর করার কোন উপায় ছিল না—অন্ধকারেই থাকতে হ'ত। এই অবস্থায় যে মানুষ প্রথমেই আগুনের আবিষ্কার করেছিল, সে মানুষের কত বড় উপকার করেছে সেটা ভাবলে আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি যে তার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না বা তার আবিষ্কারের মূল্য সম্বন্ধে আমরা কখনও ভাবি না। এই আবিষ্কার না হলে মানুষ আজও আদিম অসভ্য অবস্থায় থাকত। যে সকল আদিম অসভ্য জাতি আমরা দেখি, যেমন সাঁওতাল, কোল, ভীল প্রভৃতি, তাদের চেয়েও মানুষ আজ নীচের পর্য্যায়ে থাকত, কারণ এরাও আগুনের ব্যবহার জানে এবং মাছ-মাংস তরিতরকারী শস্য প্রভৃতি রান্না করে খায়। এগুলি কাঁচা খেলে মানুষের শরীরের অবস্থা অন্য রকম হ'ত, বুদ্ধিও জন্তু জানোয়ারের চেয়ে খুব বেশী উন্নত হ'ত না।

এই আগুন কে কবে আবিষ্কার করেছিল তার কিছুই আমরা জানি না। কি উপায়ে প্রথমে এই আবিষ্কারের সূত্রপাত হয়, সে সম্বন্ধেও আমাদের কোন সঠিক জ্ঞান নাই; তবে এ বিষয়ে আমরা কিছু কিছু অনুমান করতে পারি। খুব গরমের সময় জঙ্গলে গাছের ডালে ডালে ঘষা লেগে অনেক সময় আগুন বেরয়, হয়ত এই দৃশ্য দেখেই আগুনের কল্পনা প্রথম মানুষের মনে জাগে। হয়ত কোনদিন পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি করতে যেয়ে সে আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পায়। এই রকম কোন ইঙ্গিত থেকেই প্রথমে হয়ত তার মাথায় আগুনের স্বরূপ ও শক্তি সম্বন্ধে

অস্পষ্ট কোনও ধারণা জন্মে। তারপর ঐরূপভাবে নিজেই আগুন তৈরী করতে শেখে। তারপর এই আগুনকে রান্না করা, আলো জ্বালানো প্রভৃতি মানুষের অতি প্রয়োজনীয় কাজের জন্য ব্যবহার করতে হয়ত শত শত বছর কেটে গেছে। ক্রমে এই আগুনের উপকারিতা বুঝে মানুষ তাকে দেবতার আসন দেয়, দেবতার মত পূজা করে। আজকাল দেশলাই দিয়ে অতি সহজেই আমরা আগুন জ্বালাই। কিন্তু অতি প্রাচীন কালে আগুন জ্বালানো অত সহজ ছিল না—তাই লোকে আগুন জ্বালিয়েই রাখত, নিবতে দিত না। ক্রমে এটাও একটা ধর্ম্মের অঙ্গে পরিণত হয়। আমাদের সর্ব্বপ্রাচীন শাস্ত্র ঋগ্‌বেদে আগুন এক প্রধান দেবতা বলে পূজিত হয়েছেন, তাঁর অনেক স্তোত্রও আছে। আমাদের দেশে ও প্রাচীন পারস্য দেশে প্রতি বাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে রাখা ধর্ম্মকার্য্যের মধ্যে গণ্য ছিল। হাজার বছরেরও আগে একদল পারশী যখন মুসলমান আক্রমণের ফলে স্বদেশ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নেন, তখন তাঁদের ধর্ম্মের নিয়মানুযায়ী পবিত্র অগ্নিশিখা সঙ্গে নিয়ে আসেন। আজ পর্য্যন্তও তাঁরা তা নিবতে দেন নি। আমাদের দেশেও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণদের বলত সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। এঁদের বাড়ীতেও সর্ব্বদা একটি অগ্নিশিখা জ্বলত। আগুনের উপকারিতার জন্যই প্রাচীনকালে তাকে এইভাবে দেবতার মতন সম্মান ও পূজা করত।

আগুনের প্রসঙ্গে শস্যের কথা তুলেছি। আজকাল চাল ডাল আটা অথবা অন্যান্য শস্য আমাদের প্রধান খাদ্য। মাছ-মাংস তরিতরকারী যতই খাই, ভাত রুটি অথবা ছাতু প্রভৃতি না হলে কারও চলে না, তা সে ধনীই হউক আর দরিদ্রই হউক। এই কয় বৎসর বাংলা-দেশে অভাব হওয়ায় আমরা চাউলের মূল্য কিছু বুঝেছি। তা না হলে এ সম্বন্ধে কেউ বড় একটা মাথা ঘামায় নি। সাধারণ চাষারা অনায়াসে এগুলি উৎপন্ন করে, সুতরাং এর মধ্যে যে কোন বাহাদুরি আছে আমরা তা কখনও ভাবি নি। কিন্তু বীজ মাটিতে পুঁতে দিলে তার থেকে গাছ হয়, এ জিনিষটা একটা খুব বড় আবিষ্কার। মানুষের প্রথম অবস্থায় এটা জানা ছিল না এবং কে কবে প্রথমে এই আবিষ্কার করে তারও আমরা কিছু জানি না। কেমন করে প্রথমে এই আবিষ্কারের সূত্রপাত হয়, আমরা তা কতকটা অনুমান করতে পারি মাত্র। হয়ত মানুষ অন্য কোন ফলমূল খেয়ে তার বীজ নিকটেই মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। তার পর অনুকূল আবহাওয়ায় তার থেকে ছোট একটি অঙ্কুর বেরয়। কোন একজন বুদ্ধিমান মানুষের দৃষ্টি পড়ে তার উপর। নিউটন যেমন 'একটি আপেল মাটিতে পড়ে কেন' এই প্রশ্নের উত্তর ভাবতে ভাবতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করেন, সেই আদিম জগতের মানুষটিও তেমনি এই অঙ্কুরটি কেমন করে গজাল, এই কথা ভাবতে ভাবতে ক্রমে উদ্ভিদের জন্মরহস্য আবিষ্কার করে। একদিনে বা এক বছরে নয়, হয়ত শত শত বছর লেগেছে মানুষের এই আবিষ্কারকে কাজে লাগাতে, নানা রকম শস্য উৎপাদন করতে এবং কত শত শত মানুষের বুদ্ধি ও অধ্যবসায় আছে এর পশ্চাতে। তাদের বাহাদুরি নিউটন ফ্যারাডের চেয়ে হয়ত কম

নয়, কিন্তু আজ তাদের নাম কেউ জানে না, তারা যে কত বড় আবিষ্কার করেছে এবং তাতে মানুষের কত উপকার হয়েছে তাও কেউ ভাবে না।

ধাতুর আবিষ্কার সভ্যতার উন্নতির আর একটি বিশেষ চিহ্ন। তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতু আমাদের নিত্য কাজে লাগে,—অথচ পৃথিবীতে এদের প্রথমে সহজ অবস্থায় পাওয়া যেত না। মাটির নীচে বা পাথরের সঙ্গে সূক্ষ্ম ধাতুখণ্ড মিশে থাকত; সে সকল একত্র করে গালিয়ে যে শক্ত পদার্থ নির্ম্মাণ করা যেতে পারে, আদিম মানুষের তা জানবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। হয়ত বনে জঙ্গলে কোন পাথরখণ্ডের উপর মাটির পাত্র রেখে রান্না করার ফলে সেই পাথরের মধ্যেকার ধাতুর গুঁড়া গলে ছোট ছোট তাল হয়েছিল এবং তা কোন বুদ্ধিমান মানুষের নজরে পড়েছিল। তার পর ক্রমে ক্রমে তামা, লোহা প্রভৃতির আবিষ্কার হয়। এই সব আবিষ্কারের ফলে তখনকার মনুষ্য-জগতে কিরূপ বিপ্লব হয়েছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। প্রথমে কাঠ ও জন্তুর হাড় এই দিয়েই মানুষকে আত্মরক্ষার ও পশুহত্যার অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করতে হ'ত। যারা প্রথমে তামার অস্ত্র তৈরী করেছিল, তারা অনায়াসে আশেপাশের অন্যান্য জাতিকে হারিয়ে তাদের প্রাধান্য স্থাপন করেছিল, আর জীবজন্তু মারাও তাদের পক্ষে এত সহজ হয়েছিল যে, তাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারত। তারপর যারা প্রথমে লোহার আবিষ্কার করল তারা অনায়াসেই তামার অস্ত্রধারীদের হারিয়ে দিল—কারণ লোহার অস্ত্র তামার চেয়ে অনেক বেশী মজবুত। এমনি করে নূতন নূতন ধাতু (ব্রঞ্জ প্রভৃতি) আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক জাতির উত্থান-পতন, অনেক রাজ্যের ধ্বংস, অনেক নূতন রাজ্যের সৃষ্টি, অনেক নূতন নূতন শিল্প-কলার উদ্ভব হয়েছে। মানুষের ইতিহাসে সে এক প্রকাণ্ড অধ্যায়,—যদিও আমরা তার বিশেষ বিবরণ কিছুই জানি না, কিছু কিছু অনুমান করতে পারি মাত্র।

মানুষের আর একটি বড় আবিষ্কার—অক্ষরের সৃষ্টি। আজ কেবলমাত্র গুটি কয়েক অক্ষরের সাহায্যে আমাদের চিন্তা, কল্পনা, মনের ভাবনা পৃথিবীর সকলকে জানাতে পারি। শত শত বছর আগে যাঁরা বেঁচে ছিলেন তাঁদের কথা ও কল্পনা আমাদের কাছে জীবন্ত হয়ে আছে। সভ্যতার ইতিহাসে এটা কত বড় জিনিষ একটু চিন্তা করলেই আমরা বুঝতে পারি। যদি মানুষ লিখতে না জানত, তবে সভ্যতার যে বিশেষ কোন উন্নতি হ'ত না তা বলাই বাহুল্য। আজ চার-পাঁচ বছরের শিশু অনায়াসে ক, খ, গ, অথবা এ, বি, সি, ডি শিখে পড়তে সুরু করে। কিন্তু কত শত বছরের চেষ্টায়, কত বুদ্ধির জোরে যে মানুষ এই অক্ষর-প্রণালীর আবিষ্কার করেছে, তা হয়ত অনেকেই জানে না। সৌভাগ্যের বিষয় এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। এখন থেকে পাঁচ-ছ' হাজার বৎসর পূর্ব্বে মানুষ প্রথমে নিজের মনের কথা লিখে জানাতে চেষ্টা করে। সে লেখা ছিল অনেকটা ছবি আঁকার মত। যেমন ধর সে বোঝাতে চায় যে একজন রাজা সৈন্য নিয়ে যাচ্ছেন। তার জন্য সে একজন রাজার মূর্ত্তি আঁকল—পেছনে একদল সৈন্য, আর তাদের পায়ের

ভঙ্গী এমন করে আঁকল যাতে বেশ বোঝা যায় যে তারা হেঁটে চলেছে। এরূপ ভাবে মানুষ খাচ্ছে, ঘুমুচ্ছে প্রভৃতি কথা ভিন্ন ভিন্ন ছবি দিয়ে বোঝাত। এতে অনেক সময় লাগে। ক্রমে তারা এটাকে সংক্ষেপ করল। মানুষ বোঝাবার জন্যে একটা ছবি—আর খাওয়া, ঘুমান প্রভৃতির জন্য আলাদা একটা চিহ্ন বের করল। ক্রমে তারা দেখল যে একজন মানুষের ছবি বারে বারে আঁকতে অনেক কষ্ট হয়, সময় লাগে, অনেকে পারেও না। সুতরাং মানুষের ছবি না এঁকে সংক্ষেপে কয়েকটি রেখা টেনে মানুষ বুঝিয়ে দিত। তার পর দেখলে যে, মানুষ, মাছ, মাদুর প্রভৃতি আলাদা চিহ্ন দিয়ে না এঁকে, মা প্রভৃতি শব্দ একটা চিহ্ন দিয়ে বোঝালে অনেক সংক্ষেপে লেখার কাজ শেষ হয়। এমনি করে ছোট করে আনতে আনতে সমস্ত শব্দ বিশ্লেষণ করে করে, তাদের মূলগত ধ্বনিগুলি আলাদা করে, প্রত্যেকটি একটি চিহ্ন দিয়ে অঙ্কিত করে সর্ব্বশেষে অক্ষরের সৃষ্টি হয়। এ সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে যা বর্ণনা করলাম তা কাজে পরিণত করতে হাজার হাজার বছর লেগেছে। কোন কোন জাতি এখন পর্য্যন্তও অক্ষর তৈরী করতে শেখেনি। যেমন চীনা জাতি। তাদের মধ্যে এখনও এক একটা কথা বোঝাবার জন্য একটা চিহ্নের ব্যবহার হয়—ফলে প্রায় হাজার পাঁচেক চিহ্ন আঁকতে না শিখলে তারা লিখতে পড়তে পারে না। সকল দেশেই একদিন এই ব্যবস্থা ছিল। মানুষের বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তির বলে এই ব্যবস্থার উন্নতি হতে হতে মাত্র ছাব্বিশটি অথবা অনধিক পঞ্চাশটি চিহ্নের (অক্ষরের) সাহায্যে আজ আমরা আমাদের যাবতীয় মনোভাব লিখে জানাতে পারি।

এই রকমের আর একটা আবিষ্কারের কথা বলেই এই প্রসঙ্গ শেষ করব। টাকা-পয়সার কথা সকলেই জানি—এ না থাকলে সংসার চলে না। কিন্তু তিন হাজার বছর আগে মানুষ আমাদের মত টাকা-পয়সার ব্যবহার জানত না। টাকা-পয়সার প্রচলনও ছিল না। তখন কোন জিনিষ কিনতে হলে টাকা-পয়সায় তার দাম না দিয়ে তার বদলে অন্য জিনিষ দিতে হ'ত। যেমন—যার চাউল আছে, তার কাপড় তেল নুণের দরকার হলে কিছু কিছু চাউল দিয়ে ঐ সব জিনিষ কিনত। কিন্তু এতে অসুবিধা হ'ত অনেক। কারণ যার কাছে কাপড় আছে, তার হয়ত চাউলের দরকার নাই—সুতরাং যার কেবল চাউল আছে, তার কাপড় কেনা মুস্কিল হ'ত। সুতরাং মানুষ ভাবল যে, কোন একটা মাত্র জিনিষকে মূল্য স্বরূপ ব্যবহার করতে হবে। গরু এরূপ একটি মূল্য বলে নির্দ্ধারিত হ'ল। যে কোন জিনিষ কিনতে হলে একটি বা তার বেশী গরু দিতে হ'ত। কিন্তু এতেও অসুবিধা ছিল অনেক। বাজার করতে যেতে হলে গরুর পাল সঙ্গে নিয়ে যেতে হ'ত। তা ছাড়াও অল্প পরিমাণ জিনিষ কিনবার অসুবিধা ছিল। যেমন একটা গরু দিয়ে দশ সের চাউল পাওয়া যায়। কিন্তু আমার দরকার মাত্র পাঁচ সের চাউলের। গরুটাকে তো আর কেটে অর্দ্ধেক করে দাম দেওয়া যায় না ; সুতরাং দশ সেরই কিনতে হ'ত। এই সব অসুবিধা দূর করার জন্য বুদ্ধিমান মানুষ স্থির করল যে, কোন ধাতুকে দামের মতন করে ব্যবহার করতে হবে। ধাতু নেওয়াও সুবিধা এবং তা ভাগ করে খুব অল্প জিনিষ কিনলেও তার দাম দেওয়া চলবে। তামা, ব্রঞ্জ, লোহা,

রূপা, সোনা প্রভৃতি নানা ধাতু—যে দেশে যেটা পাওয়া যায়—এই ভাবে ব্যবহৃত হতে লাগল। ক্রমে যখন কেনা-বেচা বাড়তে লাগল তখন এতেও অসুবিধা হতে লাগল। প্রতি জিনিষ কিনবার পরই সোনা, রূপা, তামা, টিন প্রভৃতি ওজন করে তার দাম দিতে হ'ত। ধাতু বিশুদ্ধ কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হ'ত। মোটের উপর একটি জিনিষের দাম দিতেই বেশ খানিকটা সময় লাগত। সুতরাং অনেক জিনিষ বেচা-কেনার সময় ও সুবিধা হ'ত না। যখন ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে চলল, তখন মানুষ আর একটু বুদ্ধি খাটিয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের ধাতুর চাক্তি ব্যবহার করতে আরম্ভ করল। যেমন এক তোলা আধতোলার ধাতুখণ্ড তৈরী থাকত, লোকে তাই দিয়ে জিনিষের দাম দিত। প্রতিবার ধাতুর ওজনের দরকার হ'ত না। কিন্তু দেশে চিরকালই ভালমন্দ দু'রকম লোকই থাকে। দুষ্ট লোক হয়ত কম ওজনের ধাতুখণ্ড বেশী ওজনের বলে চালিয়ে দিত অথবা খারাপ ধাতু মিশিয়ে ওজন ভারী করত। তখন ঠিক হ'ল যে, প্রতি ধাতুখণ্ডের উপর কোন জানা-শোনা লোকের মুদ্রা অর্থাৎ চিহ্ন অঙ্কিত থাকবে, যাতে সকল লোকই বুঝতে পারে যে, এতে নির্দ্দিষ্ট ওজনের বিশুদ্ধ ধাতু আছে। কোন বড় বণিক, অথবা কোন নগরসভা অথবা কোন রাজা বা গণতন্ত্রের চিহ্নযুক্ত ধাতুখণ্ড এরূপে ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু যখন দূর বিদেশে এর ব্যবহার হ'ত তখন কোন ছোট সহর বা তার বণিকের চিহ্ন দেখে লোক বিশ্বাস করত না। সুতরাং রাজার নাম অথবা তাঁর চিহ্ন ব্যবহার করতে হ'ত। এই রকমে ধীরে ধীরে আমাদের পরিচিত টাকা-পয়সার প্রচলন আরম্ভ হ'ল। আমাদের টাকা ও পয়সায় একটি নির্দ্দিষ্ট ওজনের রূপা বা তামা থাকে এবং তার উপর রাজার নাম থাকায় আমরা ঐ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে উহা ব্যবহার করি। এখন এ বিষয়টি আমাদের কাছে খুব সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়, কিন্তু এই জিনিষটি আবিষ্কার করতে মানুষের শত শত বছর লেগেছে এবং অনেক রকম উপায় উদ্ভাবন ও পরীক্ষা দ্বারা তার ভাল-মন্দ যাচাই করে তবে এটা বার হয়েছে। রাজার নাম ও মূর্ত্তিওয়ালা টাকা-পয়সা যে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক, আমাদের মনে এ ধারণা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মতই মনে হয়, কিন্তু প্রাচীন কালের বড় বড় রাজাদের আমলে এ ব্যবস্থা ছিল না। রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৌরাণিক রাজার কথা ছেড়ে দিলেও, মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি রাজার আমলেও এই রকম মুদ্রার প্রচলন ছিল না।

উপরের আবিষ্কারের সবগুলিই মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়—এমন কি, এগুলি ছাড়া যে মানুষের চলতে পারে এরূপ ধারণা করাও আজ আমাদের পক্ষে কঠিন। অথচ এর প্রত্যেকটিই বহু বুদ্ধি, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে মানুষ লাভ করেছে। অতি পরিচিত বলেই আমরা এই সব আবিষ্কারের প্রকৃত মূল্য বুঝতে চেষ্টা করি না। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে হলে বর্ত্তমান যুগের বিস্ময়কর আবিষ্কারের সঙ্গে এগুলির কথাও ভাবা উচিত।

শঙ্করাচার্য্যের দর্পচূর্ণ

শ্রীকুলদারঞ্জন রায়

শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের কেরলরাজ্যের চিদম্বর গ্রামে জন্ম গ্রহণকরেন। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্য এবং বেদ-বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে জ্ঞাতিদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল এবং বাড়ীতে মাতাকে একাকী রাখিয়া তিনি ধর্ম্মলাভের জন্য দেশভ্রমণে বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুকাল পরে শঙ্করাচার্য্য গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—মা অত্যন্ত অসুস্থ, জ্ঞাতিবর্গ কেহই তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন না। শঙ্কর একমনে মায়ের সেবায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু মায়ের অসুখ সারিল না, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন একাকী, বাড়ীর উঠানের মধ্যেই মায়ের সৎকার এবং পরে শ্রাদ্ধাদি করিয়া, তিনি চিরজীবনের জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্মের জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ষোল বৎসর বয়সের সময় তিনি কাশীতে গিয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারকরেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল ছিল। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া, অনেক স্থানে আবার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিলেন।

মধ্যভারতে মাহিষ্মতী নগরীতে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্র বাস করিতেন, সেখানে গিয়া শঙ্কর তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। মণ্ডনমিশ্র ছিলেন কর্ম্মে ব্রহ্মবাদী। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল সরস্বতী দেবী। সরস্বতী দেবীর ডাক-নাম "উভয় ভারতী"। অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য, তিনি সরস্বতীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। শঙ্কর-মণ্ডন-বিচারে সরস্বতী হইলেন মধ্যস্থ, এবং তাঁহার বিচারে মণ্ডন হারিয়া গেলেন। তখন সরস্বতী দেবী শঙ্করকে বলিলেন—"স্ত্রী স্বামীর আত্মার অর্দ্ধেক, সুতরাং আমাকে পরাজয় না করা পর্য্যন্ত, আমার স্বামীর পরাজয় স্বীকার করিব না।" প্রথমে শঙ্কর স্ত্রীলোকের সহিত বিচার করিতে রাজি হইলেন না, কিন্তু সরস্বতী দেবীর যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়া পরে সম্মত হইলেন।

ক্রমাগত সাত দিন এই বিচার চলিল। বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে কোন প্রশ্ন দ্বারাই শঙ্করকে হারাইতে না পারিয়া অবশেষে সরস্বতী দেবী তাঁহাকে এমন একটি শাস্ত্রসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন যেটি শঙ্করের জানা ছিল না। তিনি উত্তরের জন্য এক মাস সময় চাহিয়া লইলেন। এক মাসের মধ্যে এই নূতন শাস্ত্রটিতে জ্ঞানলাভ করিয়া, শঙ্করাচার্য্য যখন আবার সরস্বতী দেবীর নিকট আসিলেন, তখন তিনি বিনা বিচারেই, তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। মণ্ডনমিশ্রকে শঙ্করের শিষ্য হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণকরিতে হইল। সরস্বতী দেবীর প্রতি শঙ্করাচার্য্যের গভীর শ্রদ্ধা হইয়াছিল, সেজন্য তিনি দ্বারকায় সরস্বতী দেবীর নামে সারদা মঠ প্রস্তুত করাইয়া, তাহাতে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রেও শঙ্করাচার্য্যের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। গণনা করিয়া তিনি যাহার সম্বন্ধে যাহা বলিতেন—তাহাই হুবহু ফলিত। এই অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য শঙ্করের মনে অহঙ্কার ছিল খুব—বিধাতা তাঁহার এই দর্প চূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

একবার কাশীর কোন স্থানে, পথের ধারে বসিয়া শঙ্কর লোকের ভাগ্য-গণনা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে কাশীতে খুব উঁচুদরের একজন যোগী ছিলেন। এই যোগীর এক শিষ্য একদিন পথে যাইতে যাইতে দেখিল, শঙ্করাচার্য্য লোকের ভাগ্য-গণনা করিয়া দিতেছেন। শিষ্য তাঁহার নিকট গিয়া, তাহার মৃত্যু-কাল জানিতে চাহিল। শঙ্করাচার্য্য গণিয়া তাহার মৃত্যুর সময় বলিয়া দিলেন, এবং ইহাও বলিলেন—"বজ্রাঘাতে তোমার মৃত্যু হইবে।"

শিষ্য, গুরুর নিকট গিয়া, শঙ্করের গণনার কথা বলিল। শুনিয়া গুরু বলিলেন—"ভয় নাই, শঙ্কর যে সময়ে তোমার মৃত্যু হইবে বলিয়াছেন, সে সময়ে কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না।" শিষ্য আবার শঙ্করাচার্য্যের নিকট গিয়া গুরুর কথা বলিল—শঙ্কর পুনরায় গণনায় বসিলেন। অনেকক্ষণ গণনার পর বলিলেন—"তোমার গুরুকে গিয়া বল, আমার নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোমার মৃত্যু নিশ্চিতই হইবে, যদি না হয়—আমার সমস্ত জ্যোতিষ শাস্ত্র জলে বিসর্জ্জন দিয়া তোমার গুরুর শিষ্য হইব।"

শিষ্য গুরুর নিকট ফিরিয়া গিয়া ঐ কথা বলিলে পর, গুরু বলিলেন—"বেশ, শঙ্করকে গিয়া বল, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে আমি তাঁহার শিষ্য হইব।"

শঙ্করাচার্য্যের নির্দ্দিষ্ট শিষ্যের মৃত্যুর দিনে সিদ্ধপুরুষ যোগী—যোগবলে শিষ্যকে অচেতন করিলেন এবং মাটিতে গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া শিষ্যকে তাহার মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেন। শঙ্কর, মৃত্যুর যে সময় বলিয়া দিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে সেই স্থানে মাটির উপরে বজ্রপাত হইল বটে, কিন্তু শিষ্যের চেতনাহীন দেহের উপরে তাহার কোন কাজ হইল না। ইহার পর যোগী শিষ্যের দেহ মাটির নীচ হইতে তুলিলেন এবং তাহার শরীরে চেতনা দিয়া শঙ্করাচার্য্যের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

যোগী শিষ্যকে জীবিত দেখিয়া শঙ্করাচার্য্যের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। যাহা হউক, তখন তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া, গণনার পুঁথিগুলি গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়া যোগীর শিষ্য হইলেন এবং একান্ত নিষ্ঠার সহিত যোগ অভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু গণনার মহামূল্য পুঁথিগুলি বিসর্জ্জন দেওয়াতে তাঁহার মনে দারুণ কষ্ট হইয়াছিল, সেজন্য সর্ব্বদা তাঁহার মুখ বিষণ্ণ থাকিত। যোগী শঙ্করের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন—শঙ্করের জন্য তাঁহার দুঃখ হইল।

একদিন যোগী বলিলেন—"শঙ্কর! তুমি মণিকর্ণিকার ঘাটে গিয়া গঙ্গার নিকট আমার আদেশ নিবেদন করিয়া, তোমার পুস্তকগুলি প্রার্থনা কর।" শঙ্করাচার্য্য তাহাই করিলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইলে পর, গুরুর আদেশ তাঁহার মনে উদিত হওয়ামাত্র, গঙ্গার জলে হঠাৎ একটি ঢেউ উঠিয়া তাঁহার পুঁথির তাড়াটি তীরে আনিয়া, একেবারে তাঁহার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল—শঙ্কর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যোগীর এইরূপ অসাধারণ যোগবলের পরিচয় পাইয়া, শঙ্করের প্রকৃত চৈতন্যের উদয় হইল। তিনি আসক্তির বস্তু সেই পুঁথিগুলি পুনরায় গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিলেন এবং সেই সঙ্গে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও বিদ্যার অহঙ্কার সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া গুরুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তখন আর তাঁহার মুখে বিষণ্ণভাব রহিল না। তিনি প্রসন্নমনে, একান্ত নিষ্ঠার সহিত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

বেদান্তনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমতই শঙ্কর নিজে মানিতেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের জন্য তিনি শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠের নাম—দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, দাক্ষিণাত্যে শিঙ্গারী মঠ এবং কেদারতীর্থে যোশী মঠ। শঙ্করের শিষ্যগণ তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া মানেন। ৮২০ খৃষ্টাব্দে ৩২ বৎসর বয়সে, কেদার তীর্থে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

শিশুর সঙ্কল্প

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

সবার কাছে এম্‌নি যেন ছোট হয়েই থাকি ;
ছোট হলেও সদাই কিন্তু বড় খবর রাখি।
নিত্য করি' মাথা নীচু   থাকি যেন সবার পিছু,
দেহে মনে গুরুজনের চরণধূলা মাখি।

ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞানে মানে সত্যি বড় যাঁরা—
যে জাতই হোক্, যেখানে থাক্, শ্রদ্ধাভাজন তাঁরা ;
সামর্থ্য বা অর্থবলে   মানুষকে যে পায়ের তলে
রাখ্‌তে চাহে তুচ্ছ ব'লে শুধু তারাই ছাড়া।

হোক্ না সে জন দেশের রাজা, জমীর জমীদার,
ছোট হলেও মানিনে তার শাসন-অধিকার ;
আমরা প্রজা বৃহৎ জনের   আমরা প্রজা মহৎ মনের,
সত্যকারের বড় যে জন, ভক্ত মোরা তাঁর !

উদ্ধতকে শাস্তি দিতে রই যেন উদ্যত,
দাম্ভিকেরে দগ্ধ করি বজ্রানলের মত ;
শক্তি যেথায় স্বার্থভরে   আত্মাকে আচ্ছন্ন করে
ধূলার মত চূর্ণ করি, এই যেন হয় ব্রত।

স্নেহের কাছে প্রেমের কাছে হই দাসানুদাস,
তৃণের মত অবনত রই বারোটি মাস ;
যেথায় দেখি দুঃখী যে-বা,   নিত্য করি তাদের সেবা,
মনবাসী অহঙ্কারে পাঠিয়ে বনবাস।

বিশ্বমাকে দেখ্‌তে না পাই, দেখি স্বদেশ-মাকে,
অন্নে-জলে পালেন যিনি ক্ষুদ্র এ প্রাণটাকে ;
জন্ম থেকে যে মা'র বুকে   জীবন কাটাই দুঃখে-সুখে,
তাঁরই সে দান তাঁকেই দিব সেই মা যদি ডাকে।

বুকের আশা, মুখের ভাষা, মনের এ আশ্বাস,
স্বর্গ চেয়েও সেই মা বড় ধ্রুব এ বিশ্বাস ;
বাপ-মায়েরও মা হ'ন তিনি,   মনে প্রাণে তাঁরেই চিনি
তাঁরই ঋণে নিত্য ঋণী, য'দিন বহে শ্বাস।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

খোকাবাবুর ডাকাত ধরা

শিবপুর গ্রামের গঙ্গার পাড়ে ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। ভৈরববাবু খুব বড়লোক। কলিকাতায় অনেক দোকান ও বিদেশে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। পৈত্রিক জমিদারীও আছে। পুত্রেরা সব ব্যবসায়-বাণিজ্য দেখাশুনা করে, নিজে বৃদ্ধ হইয়াছেন। পৌত্র-পৌত্রী দৌহিত্র-দৌহিত্রীতে, দাস-দাসী ও আত্মীয়স্বজনে বাড়ী ভরপুর—পুরাণো ধরণের সেকেলে বাড়ী। বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের বাড়ী, সর্ব্বদা লোকজনে সরগরম থাকে।

বাড়ীর চারিদিক প্রাচীর ঘেরা। মস্ত বড় বাড়ী—বাড়ীর পেছনে রান্নাঘরের গা ঘেঁসিয়া বাগান। বাগানে আম, জাম, নারিকেল, কাঁঠাল, তালগাছও যেমন, তেমনি বাঁশের ঝাড়, তারই পাশে সব্জী বাগান। খিড়কির পুকুর। বাড়ীর সম্মুখে পূজামণ্ডপের অল্প দূরে প্রকাণ্ড দীঘি—কালো জলে ঢেউ খেলিয়া বেড়ায়। এপার ওপার দেখা যায় না। বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। দোল, দুর্গোৎসব ত হয়ই, তা ছাড়া নানা ব্রত, বিবাহ ও অন্নপ্রাশন—বড় পরিবারের যেরূপ হইবার সেইরূপ হইয়া থাকে। পাড়ার লোকেরা ভৈরববাবুর বাড়ীতে তাস-পাশা খেলিতে আসেন।

বাড়ীর ভিতরে একেবারে পশ্চাদ্দিকে অন্দরমহল। এ পরিবারের ছোট-বড় সকল মহিলাই পর্দ্দানশীন। বাহিরে কেহ বড় একটা বাহির হন না, যদি কখনও প্রয়োজন হয়, যেমন গঙ্গাস্নান, কালীঘাট দর্শন, বা দেবমন্দির দর্শন, তীর্থযাত্রা—সে সময়েও পাল্কীতে করিয়াই চোপদার, বরকন্দাজসহ যাওয়া-আসা করেন। ছাদের উপর সন্ধ্যায় মেয়েদের আসর বসে।

ভৈরববাবুর ধন-সম্পদের কথা সে তল্লাটে জনপ্রবাদের মত প্রচলিত ছিল। একদিন ভৈরববাবু বৈঠকখানায় বসিয়া 'রামায়ণ' পড়িতেছেন—পাশে দু'চারিজন বৃদ্ধ সঙ্গী ছাড়া কেহ নাই, এমন সময় তাহাকে একটি লোক একখানি চিঠি দিয়া পলকমধ্যে সরিয়া পড়িল। চিঠিখানি পড়িয়া ভৈরববাবু ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা ভৈরববাবুর এইরূপ বিকট মুখের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বাঁড়ুয্যে মশাই, কি খবর? মিরাটের পত্র কি?—কোন দুঃসংবাদ নয়ত? মিরাটে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সৈন্য-বিভাগে কাজ করেন।

বাঁড়ুয্যে মহাশয় সেই চিঠিখানা বন্ধুদের পড়িতে দিলেন, চিঠিখানা সংক্ষিপ্ত। তাহাতে

লিখা ছিল—ভৈরববাবু, আজ রাত্রি ১২টার পর তোমার বাড়ীতে আমরা ডাকাতি করিতে যাইব। সাবধান! প্রস্তুত থেকো। এইমাত্র সংবাদ, কাহারো নাম ছিল না। লেখাও অস্পষ্ট।

বন্ধুরা ভৈরববাবুকে বলিলেন—থানায় সংবাদ দিন্ এবং দারোগা পুলিশকে জানাইয়া কলকাতা শ্যামবাজারে যে আপনার মধ্যম জামাতার বাড়ী আছে, সেখানে মূল্যবান জিনিষপত্র ও টাকাকড়ি লইয়া চলিয়া যান। বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের কাছে এ প্রস্তাব সঙ্গত মনে হইল এবং তিনি পরিজনসহ কলিকাতা চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে একটি সোরগোল পড়িয়া গেল—বাক্স-পেটারা খোলা, সিন্দুক পেটারা খোলা, সব গুছান-গাছান, কম কথা ত নয়—কোন্‌টা নিলে ভাল হয়, কোন্‌টা ডাকাতরা লইয়া গেলেও ক্ষতির কারণ নাই, এই সব নানা হৈ-চৈএর পর গাড়ীতে বা পাল্কীতে চড়িয়া বাড়ীর সব পুরুষ ও মহিলারা চলিয়া গেলেন নিরাপদ আশ্রয়ে কলিকাতা জামাতার বাড়ী। জামাতাও ধনী এবং সম্ভ্রান্ত লোক। বাড়ী একেবারে খালি হইয়া গেল। দরজা কপাট বন্ধ, যেন একটা নির্জ্জন পুরী। বাহিরের সদর দরজায় দুইজন মাত্র পাহারা রহিল।

সকলে নিরাপদে কলিকাতা পৌঁছিলেন। তখন দেখা গেল, ভৈরববাবুর ছোট বৌমা ও তার তিন বৎসরের ছেলে বাবলুকে আনা হয় নাই। বাড়ীর কর্ত্তা, কর্ত্রী এবং আত্মীয়স্বজনেরা প্রত্যেকেই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিবার সময় মনে ভাবিয়াছিলেন, ছোট বধূ বুঝি অন্য গাড়ীতে গিয়াছেন। ভৈরববাবু কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন, মহিলারা 'হায়—হায়' করিতে লাগিলেন। তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে, কেই বা আবার সন্ধান লইতে যায়! সকলেরই প্রাণভয়ে দুরু-দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। বাবলু ও ছোটবৌ কমলা সেই নির্বান্ধব পুরীতেই রহিয়া গেলেন। কমলা আঁতুড়ে ছিলেন।

রাত্রি প্রায় বারোটার সময় ডাকাতেরা সদলবলে ভৈরববাবুর বাড়ী আসিয়া হানা দিল। কেষ্ট সাঁতরা নামে হাওড়ার ডাকাতদলের একজন লোকের মারফত বিখ্যাত ডাকাত সদানন্দ ঠাকুর ভৈরববাবুর বাড়ীর সংবাদ পাইয়া ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল। এ দলে রায় ঠাকুর, গোপাল মুখার্জি, যদু ডোম, হরিনারায়ণ কৈবর্ত্ত, নবীন গোয়ালা, গোবিন্দ চুনারী, জ্ঞান ঠাকুর; ঠাকুরদাস বাগদী, কালা কৈবর্ত্ত প্রভৃতি সব দুর্দ্দান্ত দস্যুরা আসিয়াছিল। বাবলুর মা বাবলুকে পাশের ঘরে শোয়াইয়া রাখিয়া নিজে অন্য এক ঘরে নবজাত শিশুকে লইয়া শুইয়াছিলেন।

ডাকাতেরা মশাল জ্বালিয়া হল্লা করিয়া এঘর-ওঘরের জিনিষপত্র টানাটানি করিয়া ফেলিয়া যাহা কিছু পাইতেছিল, তাহাই লুঠ করিতেছিল। ভৈরববাবুর ন্যায় সম্পদশালী ধনী গৃহস্থের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে ত আর বাড়ীশুদ্ধ সব জিনিষপত্র টানা-হ্যাঁচড়া করিয়া নেওয়া সম্ভবপর ছিল না, কাজেই ডাকাতদের ভাগ্যে 'মাল' আশানুরূপ না হইলেও বড় কম জোটে নাই। ডাকাতরা এঘর ওঘর ছুটাছুটি করিতেছিল, মাঝে মাঝে হারে-রে-রে শব্দে চারিদিক সচকিত

করিয়া তুলিতেছিল। কেন না তাহারা এ-বাড়ী লুঠ করিয়া যতটা লাভবান হইবে আশা করিয়াছিল, তাহা না পাইয়া অত্যন্ত নিরাশ হইয়া পড়িয়া আরও উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়াছিল—যাকে বলে 'মারমুখো'।

যে ঘরে মায়ের বিছানায় বাবলু ঘুমাইয়াছিল, এইবার ডাকাতেরা সে ঘরে হল্লা করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের চীৎকারে বাবলুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল। এতগুলি বীভৎস আকারের লোক, হাতে তরোয়াল, মশাল, কালিমাখা মুখ দেখিয়া বাবলু কাঁদিতেছিল—মা-মা, দাদু-দাদু করিয়া কাঁদিতেছিল। একজন ডাকাত তাহাকে দেখিয়া তরোয়াল লইয়া ছুটিয়া আসিল। সরল শিশুকে কাটিয়া ফেলিবে বলিয়া যেমন তরোয়াল তুলিয়াছে, এমন সময় হরিয়া বাবলুর কাছে আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিল—কেঁদ না, লক্ষীটি আমার! বাবলু তাদের বাড়ীর চাকর হরিয়াকে দেখিয়া নির্ভয়ে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল। হরিয়া তাহার হাতে সন্দেশ দিল এবং ছড়া বলিয়া আদর করিয়া আবার তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া ডাকাত দলের সহিত গিয়া মিশিল। বাবলু নিশ্চিন্ত মনে আবার ঘুমাইয়া পড়িল। হরিয়া বাবলুর বাবার খাস চাকর!

পরের দিন। ভোরের আলো সবে মাত্র উঁকি মারিয়াছে। এমন সময় ববিলুর মা পাগলের মত বাবলুর বিছানার পাশে আসিয়া দেখিলেন—বাবলুর ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। সে নিশ্চিন্ত মনে বিছানার পাশে আধখানি সন্দেশ হাতে লইয়া বসিয়া আছে। মাকে দেখিয়া সে খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মা তাহাকে কোলে তুলিয়া আদর করিয়া বলিলেন—বাবলু! কাল কি হয়েছিল বাবা! বলতে পার?

বাবলু মাথা নাড়িয়া বলিল—হুঁ পারি। মছাল! মছাল! ভূত কালো কালো, বল-বল দা—অনেক অনেক লোক—তরোয়াল দিয়ে একটা লোকে আমাকে কাটতে চাইল, হরিয়া দাদা আমাকে কোলে করে ছন্দেশ দিল, ঘুম পাড়ালো, ঘুমিয়ে পড়লাম। ছন্দেশ খাওয়া বড় মজা, না-মা? দাদু কোথায়?

বাবলুর দাদামশাই ভৈরববাবু সপরিবারে উৎকণ্ঠিত মনে বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তাহার পুত্রবধূ ও প্রিয় নাতি বাবলু—নিরাপদে আছে। তখন তিনি ভগবানের অসীম দয়া স্মরণ করিয়া বার বার ঈশ্বরের নাম বলিতে লাগিলেন। ডাকাতেরা বরকন্দাজ দু'জনকে হাত-পা বাঁধিয়া একটা জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

দারোগা পুলিশ আসিল। খোকাবাবু হরিয়াকে দেখাইয়া বলিল, হরিয়া দাদা—মছাল তরোয়াল। হরিয়া পরের দিনও নিজেকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্যই হউক বা যে কারণেই ঠিক নিয়মিত ভাবে কাজ করিতেছিল। ধরা পড়িয়া হরিয়া দোষ স্বীকার করিল। সে-ই যে

ডাকাতদের মারফতে ভৈরববাবুকে চিঠি পাঠাইয়াছিল, সে কথাও স্বীকার করিল· এবং সঙ্গী ডাকাতদের নাম বলিয়া দিল। দলের প্রায় সকলেই ধরা পড়িল। বাড়ীতে ও গ্রামের লোকের কাছে বাবলুর আদরের সীমা রহিল না, সকলে তাহাকে আদর করিয়া বলিত ডাকাত-ধরা বাবলু! সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতে পড়িত সন্দেশ ও রসগোল্লা।*

১৩৫৭ * সরকারি বিবরণীতে এই ডাকাতির বিবরণ আছে।

ধাঁধা

শিল্পী বলেন—এই ছবিতে পাঁচটি লুক্কায়িত মানুষের মুখ আছে।

মুখগুলি বাহির কর দেখি!

[এই ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে হইবে না]
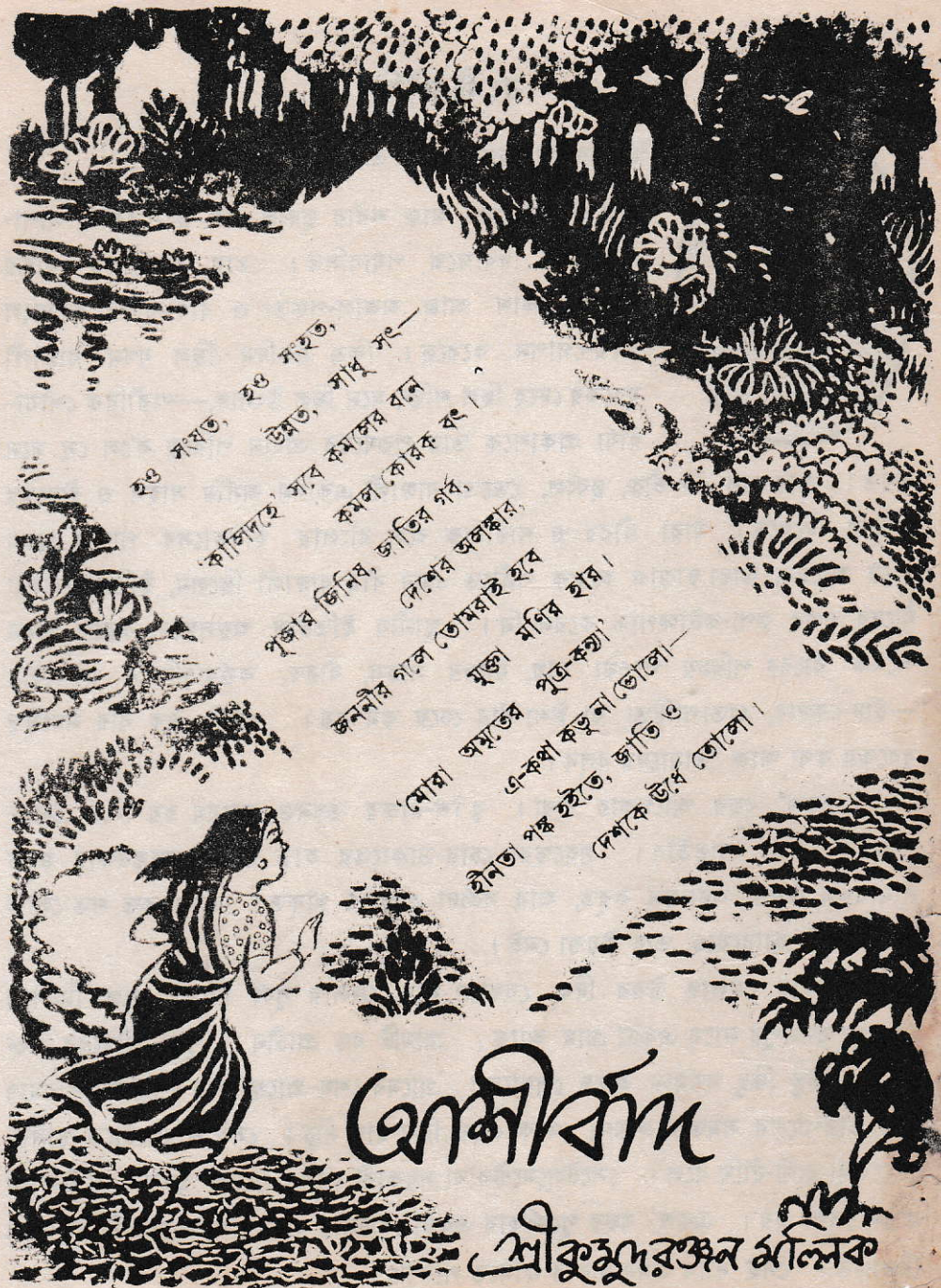
হও সংযত, হও সংহত,
উন্নত, সাধু সৎ—
'কাসিদহে' সবে কমলের বনে
কমল কোরক রং।
পূজার জিনিষ, জাতির গর্ব,
দেশের অলঙ্কার,
জননীর গলে তোমরাই হবে
মুক্তা মণির হার।
'মোরা অমৃতের পুত্র-কন্যা'
এ-কথা কভু না ভোলো—
হীনতা পঙ্ক হইতে, জাতি ও
দেশকে ঊর্ধ্বে তোলো।
আশীর্বাদ
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বংশী-দীঘি

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ., বি. টি., সরস্বতী

বাঙ্গালীর ছেলের আজ শরীর দুর্ব্বল, মন উৎসাহহীন, আশা-আকাঙ্ক্ষা দিবাস্বপ্নে পর্য্যবসিত। তার স্বাভাবিক বুদ্ধির সতেজ বিকাশ আজ অকাল-পক্কতা ও বাঁধা-বুলির আড়ালে আত্ম-গোপন করেছে। কিন্তু একদিন ছিল যখন বাঙ্গালী যুবকের দেহে ছিল শক্তি, মনে ছিল উৎসাহ,—শারীরিক শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশকে তার পুরুষত্বের প্রধান পরিচয় ব'লে সে মনে কর্‌ত। আজকার এই ভীরু, দুর্ব্বল, ভেতো বাঙ্গালী একদিন অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। যাঁরা বীরত্ব ও শারীরিক বলে বাংলার ইতিহাসের পাতায় অমর হ'য়ে আছেন, তাঁরা ছাড়াও অনেক পল্লীতে এমন বীর বাঙ্গালী ছিলেন, ইতিহাস-লক্ষ্মী যাঁদের ওপর কৃপা-কটাক্ষপাত করেন নি। স্থানীয় ইতিহাস অনুসন্ধান কর্‌লে এমন অনেক বীরের পরিচয় পাওয়া যায়, যাদের সাহস, বীরত্ব, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও দেশপ্রেম —চাঁদ-কেদার, প্রতাপাদিত্য বা ঈশা খাঁর চেয়ে কম নয়। এম্‌নি এক বীর নমঃশূদ্র যুবকের কথা আজ তোমাদের বল্‌ব।

একশ' বছর আগেকার কথা। বৃটিশ-রাজত্ব তখনও কায়েম হয় নি। চোর-ডাকাতের বড্ড প্রাদুর্ভাব। গৃহস্থেরা চোর-ডাকাতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নানারকম উপায় অবলম্বন কর্‌ত, আর সর্ব্বদা প্রস্তুতও থাক্‌ত। তবুও কত শত লোক যে ধন-প্রাণ হারিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

যশোর জেলার উত্তর দিক যেখানে নদে' জেলার পূর্ব্ব দিকের সঙ্গে মিশেছে সেখানে রতনপুর নামে একটা গ্রাম আছে। গ্রামটি বহু প্রাচীন। পূর্ব্ব-গৌরবের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে সেখানে। গ্রামের শেষ-প্রান্তে প্রায় দশ বিঘা পরিমাণ জমি চারপাশের সমতল জায়গা থেকে প্রায় তিন হাত নীচু। সেই জায়গাটাকে স্থানীয় লোকেরা বংশী-দীঘি বলে। সেটেল্‌মেন্টের বা সরকারী কাগজ-পত্রেও ওটাকে বংশী-দীঘি ব'লে লেখা হয়। একশ' বছর পূর্ব্বেকার একটা শোচনীয় ঘটনার সঙ্গে সেই দীঘির স্মৃতি বিজড়িত। সেই দীঘি এখন চাষের জমিতে পরিণত।

রতনপুর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি বহু জাতির বাস। গ্রামের জমিদার কালীকান্ত রায় অতি সদাশয় ব্যক্তি। সকলের মুখেই তাঁর প্রশংসা। একদিন সকালবেলায় কালীকান্তবাবু বৈঠকখানায় ব'সে আছেন, এমন সময় তাঁর পেয়াদা বেহারী ঘরে ঢুকে বল্‌ল—"বাবু, কাল রাত্রে শুকচাঁদ আর তার স্ত্রী কলেরায় মারা গেছে। বিকেল থেকে শুকচাঁদের দাস্ত-বমি আরম্ভ হ'ল, আর তার স্ত্রীর সন্ধ্যের পর থেকে। কোব্‌রেজ মশায় যেয়ে কত ওষুধ-পত্র দিলেন, কিন্তু কোন ফলই হ'ল না।"

কালীকান্তবাবু যেন আকাশ থেকে পড়্‌লেন! চীৎকার ক'রে ব'লে উঠ্‌লেন—"সে কি! বলিস্ কিরে!" পরক্ষণেই অসাধারণ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কিছুক্ষণ নীরব থেকে রুক্ষকণ্ঠে বল্‌লেন—"আমায় খবর দিলি না কেন?"

বেহারী কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে জোড়হাত ক'রে বল্‌ল—"আজ্ঞে, ওদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম আর কোব্‌রেজ মশায়ের অনুপান, গাছ-গাছড়া জোগাড় কর্‌তে এত ছুটাছুটি কর্‌তে হয়েছিল যে, খবর দিতে পারি নি। বাবু, অপরাধ মাপ কর্‌বেন।"

কালীকান্তবাবু ভাব্‌লেন, তিনি উপস্থিত থাক্‌লেই বা কি কর্‌তেন। কোব্‌রেজ মশাই ত ছিলেন। গ্রামের রমানাথ কবিভূষণ ত এই অঞ্চলের নামজাদা কোব্‌রেজ। তিনি যখন চিকিৎসা করেছেন, তখন পরমায়ু তাদের নিশ্চয়ই ছিল না।

অনেক কথা কালীকান্ত রায়ের মনে পড়্‌ল। শুকচাঁদ ছিল কালীকান্তের লেঠেল-সর্দ্দার। সেকালে প্রত্যেক জমিদারই প্রতিবেশী জমিদারের সঙ্গে বুঝাপড়া কর্‌বার, ডাকাতের হাত থেকে বাঁচ্‌বার ও নিজের জমিদারীর মধ্যে শাসন কায়েম রাখ্‌বার জন্যে কতকগুলো লেঠেল রাখ্‌তেন। তা'রা জমিদারের কাছ থেকে নিষ্কর জমাজমি ভোগ কর্‌ত, আর বিশেষ অনুষ্ঠান ও পর্ব্বদিনে পুরস্কার পেত। সে-বার নিয়োগীদের সঙ্গে বিবাদের সময় শুকচাঁদ কি সাহস আর বীরত্ব দেখিয়েই না লক্ষ্মীপুরের চরটা দখল কর্‌ল! একটা লোকের সাম্‌নে পঞ্চাশজন দাঁড়াতে পার্‌ল না! অতবড় বিশ্বস্ত ভৃত্য আর কালীকান্তবাবুর কেউ ছিল না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে কালীকান্তবাবু বল্‌লেন—"ওর কে আছে আর?"

বেহারী বল্‌ল—"একটা ছ'-সাত বছরের ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। তারই বা কি দশা হবে—ছেলে-মানুষ!"

এই ব'লে, বেহারী বাইরে যেয়ে একটা হৃষ্টপুষ্ট ছেলের হাত ধ'রে ঘরের

মধ্যে ঢুকে বল্‌ল—"এইটেই বাবু, শুকচাঁদের ছেলে।" তারপর ছেলেটিকে বল্‌ল—"বাবুকে প্রণাম কর।"

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে মাটিতে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল। কালীকান্তবাবু একবার ছেলেটির দিকে তাকালেন, পরে "চণ্ডে চণ্ডে" ব'লে কয়েকটা ডাক দিলেন। চণ্ডীচরণ ছুটে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল। কালীকান্তবাবু বললেন—"এইটি শুকচাঁদের ছেলে, তোদের সঙ্গে থাক্‌বে।" চণ্ডীচরণ বাইরের চাকরদের প্রধান। সে গরু-বাছুরের তত্ত্বাবধান করে আর বাইরের কাজকর্ম্ম করে। সে ছেলেটিকে কোলে ক'রে জিজ্ঞেস কর্‌ল—"তোর নাম কিরে?" ছেলেটি বল্‌ল "বংশী।"... ...

"এইটেই বাবু, শুকচাঁদের ছেলে"

তারপর প্রায় পনের বছর চ'লে গেছে। সেদিনকার শিশু বংশী আজ যুবক। সে এখন তার বাপের পদ পেয়েছে। এখন সে কালীকান্তবাবুর সর্দ্দার লেঠেল। লোকে বলে, সাহস, শারীরিক শক্তি আর কৌশলে সে তার বাপকেও ছাড়িয়ে গেছে। তার সমকক্ষ হ'য়ে লাঠি আর সড়কি ধর্‌তে সে অঞ্চলে আর কেউ নেই। সে তার স্বজাতি নমঃশূদ্র ছেলেদের নিয়ে একটা প্রকাণ্ড লেঠেলের দল করেছে। বিভিন্ন পর্ব্ব উপলক্ষে লাঠি, সড়কি, তলোয়ার প্রভৃতি নিয়ে সে চমৎকার খেলা দেখায়। গ্রামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি সমস্ত জাতের লোকই বংশীকে ভালবাসে। শারীরিক শক্তি তার প্রচুর। জমিদারের সে প্রিয়পাত্র; তবুও তার ব্যবহারে কোন ঔদ্ধত্য নেই। সকলের কাছে সে নম্র—বিনয়ী।

সেকালে কোন বাড়ীতে ডাকাতি কর্‌বার পূর্ব্বে ডাকাতেরা গৃহস্থকে চিঠি দিত। তখন ডাকাতিও বীরত্বের অঙ্গীভূত ছিল। তাই নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডাকাতেরা

আক্রমণ করত। তখন থানার সংখ্যা ছিল কম—সেগুলোও দূরে দূরে অবস্থিত। সেজন্যও ডাকাতেরা ঐ রকম চিঠি দিতে সাহস করত। আবার ওরকম চিঠি দিয়েও তা'রা আস্ত না। গৃহস্থ প্রতীক্ষা কর্তে কর্তে বিরক্ত হ'য়ে পাহারা দেওয়া ছেড়ে দিলে হঠাৎ একদিন তা'রা আক্রমণ করত।

চৈত্রের প্রথম সপ্তাহে কালীকান্ত রায় এক বেনামী চিঠি পেলেন, আস্ছে শনিবারে তাঁর বাড়ীতে ডাকাত পড়বে। তাঁর বাড়ীতে আর গ্রামের মধ্যে মহা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল। বংশী আর তার দলের লোকজনের ছুটাছুটি ও ব্যস্ততা বেড়ে গেল। গাঁয়ের মধ্যে কোথায় তাদের বাধা দিতে হবে, বাড়ীর মধ্যে কোথায় কোন্ সুযোগে তাদের আটক কর্তে হবে, বংশী তার বন্দোবস্ত কর্তে লাগ্ল। রাতদিন জমিদার-বাড়ীর সাম্নে লাঠিখেলা চল্তে লাগ্ল। চারদিকে ভয় ও উৎকণ্ঠা। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে ডাকাতদের কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। তারপর কয়দিন ঐ অবস্থায় কেটে গেল। শেষে ঐ যাত্রায় আর ডাকাতেরা এল না ব'লেই সাব্যস্ত হ'ল।

কয়েকদিন পরে কালীকান্তবাবু খুব জরুরী একটা বৈষয়িক কাজে যশোরে যেতে বাধ্য হ'লেন। কিন্তু মন তাঁর নিশ্চিন্ত ছিল না। যাবার বেলায় বংশীকে বল্লেন—"তুমিই রইলে বাপ, দেখ—"

কালীকান্তবাবু না থাকায় বংশীর দায়িত্ব যেন বেড়ে গেল। সে-ই এখন জমিদার-বাড়ীর রক্ষাকর্ত্তা। সকল সময় তার মনে জাগ্তে লাগ্ল প্রভুর আদেশ।

অন্ধকার রাত্রি। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়্ছে। বংশী আর আট-দশজন লেঠেল কালীকান্তবাবুর বৈঠকখানা-ঘরে শুয়ে আছে। পূর্ব্বে বহু লেঠেল সমস্ত রাত জেগে পাহারা দিত, এখন আর কোন আশঙ্কা নেই জেনে মাত্র আট-দশজন থাকে। হঠাৎ সদর-দরজার কাছে ডাকাতদের হাঁক শোনা গেল। বংশীদের ঘুম গেল ভেঙ্গে। তা'রা পাল্টা হাঁক দিয়ে লাঠি, সড়কি, তলোয়ার নিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়্ল। কিন্তু ডাকাতদের সংখ্যা পঞ্চাশ-ষাট। হাতে তাদের বড় বড় জ্বলন্ত মশাল; মুখে কৃত্রিম গোঁফ-দাড়ী।

পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে জমিদার-বাড়ীর তেতালার ছাদে একটা বড় জয়ঢাক রাখা হয়েছিল। ঐ জয়ঢাকে আওয়াজ কর্লেই গ্রামের সমস্ত লোক বুঝতে পার্বে যে, জমিদার-বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। তা'রা তখন লাঠি-সড়কি নিয়ে ছুটে আস্বে। কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে বংশী ও বংশীর দলের সবাই হতবুদ্ধি হ'য়ে সে-কথা ভুলে গেল।

বংশী আর বংশীর দল প্রাণপণে যুঝতে লাগ্‌ল। তাদের সাহস ও লাঠি-খেলার কৌশলে ডাকাতেরা স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। হঠাৎ বংশীর মনে হ'ল, যদি কোনক্রমে তা'রা পরাজিত হয়, তবে আর রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট একটি কৌশল অবলম্বন করা যাক্‌। বংশীরা হঠাৎ স'রে পড়্‌ল—তার কিছুক্ষণ পরেই সদর-দরজা গেল খুলে।

বাড়ীর একটা বিশেষত্ব এই যে, সদর-দরজার পরে পাঁচ হাত প্রশস্ত একটা গলির ভিতর দিয়ে গেলে, আর একটি সুদৃঢ় দরজা পার হ'য়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা যায়। ঐ দরজাটা অপ্রশস্ত। সাধারণভাবে একজন মানুষের বেশী ঢুক্‌তে পারে না। সেকালের অনেক পুরাণো বাড়ী ডাকাতের ভয়ে এইরূপ কৌশল ক'রে করা হ'ত। বংশী এক প্রকাণ্ড খাঁড়া হাতে ক'রে সেই দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। তার পাশেও তিন-চারজন ঐ রকম খাঁড়া হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে।

ডাকাতেরা মনে কর্‌ল যে, মাত্র কয়েকজন লোক আর আমাদের কত বাধা দেবে, তাই তা'রা পালিয়ে সদর-দরজাটা ভেঙ্গে ফেলার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে খুলে দিল। ওরা সব বাড়ীতে ঢুকে পড়্‌ল। গলি পার হ'য়ে ছোট দরজা দিয়ে যেই একটি ক'রে লোক বাড়ীতে ঢুক্‌তে যাচ্ছে, অমনি বংশীর খাঁড়া তার দেহ থেকে মুণ্ডটা পৃথক্‌ ক'রে দিচ্ছে! একে একে দশজন ডাকাত প্রাণ হারাল—রক্তে ঢেউ খেলে গেল!

দশজন পরপর খুন হ'ল দেখে ডাকাতেরা ভড়কে গেল। অথচ একজনের বেশী দরজা দিয়ে ঢুক্‌বার উপায় নেই! এর মধ্যে বংশীর ইঙ্গিতে একজন তেতালার জয়ঢাক বাজাতে সুরু কর্‌ল। গ্রামের লোকেরাও লাঠি-সড়কি নিয়ে ছুটে আস্‌তে লাগ্‌ল। অসুবিধা বুঝে ডাকাতেরা পালাতে সুরু কর্‌ল।

ডাকাতেরা পালিয়েছে জেনে বংশী মনে কর্‌ল, তাদের একজনকেও আটক করা না গেলে, তা'রা যে পরাজিত হ'য়ে পালিয়েছে, তার কোন প্রমাণ থাকে না এবং বংশীরও কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পায় না। সে ডাকাতের সর্দ্দারকে ধর্‌বার জন্য মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌ল। ঢাল, সড়কি, লাঠি প্রভৃতি নিয়ে সে ডাকাতদের পেছনে ছুট্‌ল। তার বন্ধুরা তা'কে বার বার নিষেধ ক'রে বল্‌ল—"একা বা সামান্য কয়েকজন যাওয়া বিপজ্জনক, আর এর বিশেষ প্রয়োজনই বা কি।" কিন্তু কোন কথাই সে শুন্‌ল না—পাগলের মত ছুট্‌ল ডাকাতদের পেছনে। কে তার সঙ্গে গেল, কে গেল না তার কোন খোঁজ সে রাখ্‌ল না। তার একমাত্র ইচ্ছা ও কাজ ডাকাতের সর্দ্দারকে বন্দী করা।

গ্রামের শেষে মাঠের ধারে একটা প্রকাণ্ড দীঘি ছিল। জমিদার কালীকান্ত রায়ের বাবা, আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের প্রজাদের জলপানের জন্য সেই বড় দীঘিটি কাটিয়েছিলেন। ডাকাতেরা সেই দীঘির পাড়ে অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে বিশ্রামের জন্য ব'সে ছিল। বংশী টের পেয়ে তাদের আক্রমণ কর্‌ল। ডাকাতের দল পালাল। বংশী পিছনের এক ডাকাতকে আটক কর্‌ল। সে-ই ডাকাতদের সর্দ্দার। সর্দ্দার খুব লড়তে লাগ্‌ল; কিন্তু বংশীর সাথে পেরে উঠ্‌ছিল না। অন্যান্য ডাকাতেরা তাদের সর্দ্দার ধরা পড়েছে দেখে, ফিরে এসে বংশীকে আক্রমণ কর্‌ল। বংশী একা, আর ওদিকে প্রায় পঞ্চাশজন। তুমুল লড়াই চল্‌তে লাগ্‌ল। বংশীর দলের অন্যান্য লেঠেলরা ও গ্রামবাসীরা বংশীকে না দেখে চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌ল। ডাকাতেরা যে পথে গিয়েছে, তা'রা সেই পথ ধ'রে দীঘির পাড়ে উপস্থিত হ'ল। তাদের দেখেই ডাকাতেরা সব পালাল। সকলে এসে দেখ্‌ল—পাড়ের ওপর বংশীর ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত দেহ প'ড়ে আছে, কিন্তু দেহে প্রাণ নেই। আর তারই পাশে একজন ম'রে প'ড়ে আছে, তা'কে ডাকাতদের সর্দ্দার ব'লে মনে হ'ল।

ঘটনাক্রমে কালীকান্তবাবু তার পরদিন সকালে বাড়ী ফির্‌লেন। মাতাপিতৃহীন পরম বিশ্বাসী ভৃত্যের অপূর্ব্ব প্রাণ-বিসর্জ্জনে বৃদ্ধ অভিভূত হ'য়ে পড়্‌লেন। মহাসমারোহে সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে সেই দীঘির পাড়ে বংশীর দেহ ভস্মীভূত করা হ'ল। সেই থেকে ওই দীঘির নাম হ'ল—বংশী-দীঘি। দীঘি ভরাট হ'য়ে শুকিয়ে গেলেও নীচু জায়গাটার নাম এখনও বংশী-দীঘি ব'লে পরিচিত আছে।

পালোয়ানের খেল্

ষষ্ঠীচরণ দস্তিদার সরকারী ছোট্ট-ঠাকুরদা,
পালোয়ান সে হ'তে গেলো মামার বাড়ী মাকড়্দা।
ফির্‌লো যখন বড়াই করে সবাইর কাছে দিনরাত—
'কব্জীতে যা জোর হয়েছে, ছাখ্ না দিয়ে হাতে হাত!'
দুষ্টু ছেলে বঙ্কু বলে—'ছোট্ট-ঠাকুদ্দা কি যে কন!
পালোয়ানের কদর বোঝে পাড়ায় আছে কেউ এমন?
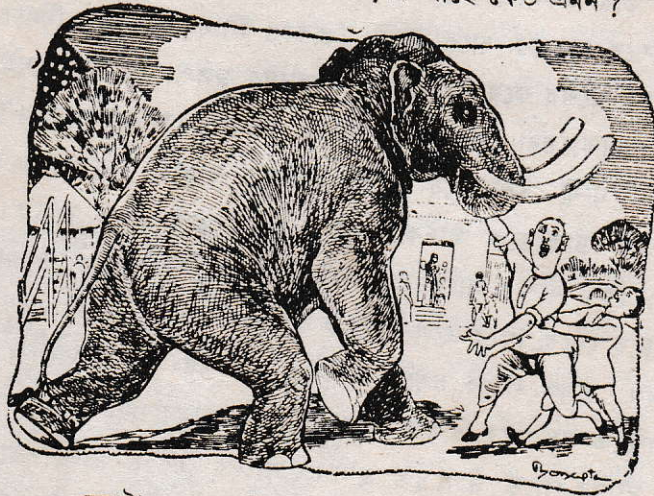
বঙ্কু টানে পেছন দিকে, সাম্‌নে লাগে হাতীর টান

খেল্ দেখিয়ে সুখটী হবে যান চ'লে যান আলিপুর,
উটের পেটে চালান ঘুষি, ঘুরান ধ'রে হাঁতীর শুঁড়!'
ষষ্ঠী বলে—'ঠিক বলেছিস্। চল্, বাবা, তুই চল্ সাথে।
নিজের চোখে দেখ্‌তে পাবি ক্যায়সা খেলি এই হাতে!'
দাঁতাল হাঁতী একটা ছিল চিড়িয়াখানার একদিকে,
আলিপুরে ষষ্ঠী গিয়ে দেখ্‌লো আগে সেইটীকে।
দূর থেকে এক ঘুষি তুলে কয় সে—'ব্যাটা, শুঁড় বাড়া।
চর্‌কী-ঘোরার একটী পাকে ভেঙ্গে দি তোর শিরদাঁড়া!'

বঙ্কু বলে—'বলেন কি ও? তার চেয়ে এক কাজ করুন—
গোটা দুয়েক আনুন কলা, হাতীর কাছে তাই নাড়ুন।'
ষষ্ঠী নিয়ে মুঠোয় কলা হাতীর কাছে নাড়ায় হাত।
হ্যা—র্—রো ক'রে শুঁড়টী তুলে দাঁতাল হাতী দেখায় দাঁত।
হ্যাচ্কা টানে কলার সাথে হাতটী নিয়ে দেয় মুখে।
চোখদুটো হয় ছানাবড়া, ষষ্ঠী বলে বঙ্কুকে—
'ধর্, বাবা, ধর্, গেলুম গেলুম, হাত যে আমার গেলো রে!
কলার সাথে হাতীর পো মোর হাতখানিও খেলো রে!'
বঙ্কু টানে পেছন দিকে, সাম্‌নে লাগে হাতীর টান।
কলার সাথে হাতীর গলায় হাত ঢুকে যে বেরোয় প্রাণ!
হাতের কলা ছেড়ে তখন ষষ্ঠীচরণ পেলো ছাড়।
বঙ্কু কোথা?—পায় কে ডেকে, একছুটে সে পগার পার!

১৩৪৭

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

হৈমন্তী

কে নামে ওই ছড়িয়ে সোনা ধানের বনেতে,
ফুলেল্ হাওয়ায় মাত্‌লা নাচে আপন মনেতে?
মটর মেয়ের ঘুম ভাঙিয়ে,
কে এলো ঐ ফুল রাঙিয়ে—
বাজায় নূপুর ঝুমুর ঝুমুর গাঁয়ের কোণেতে?

সোনার ঝাঁপি মাথায় নিয়ে কে আজ এলো ওই,—
রঙ লেপেছে ধানের বনে—কোন্ মালিকার সই?
সোনার বরণ কে ওই মেয়ে
নাম্‌লো গাঁয়ের পথটি বেয়ে?
গুঞ্জরিছে মৌপিয়া সব কাহার সনেতে?

১৩৪১

শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু

বাঙ্গালার দাতাকর্ণ

শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী

কবির উক্তি ঃ—

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।

নরকুলে ধন্য, লোকের স্মরণীয়, সর্ব্বজনের মনের মন্দিরে নিত্য সেব্য, কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ছয় বৎসর পূর্ব্বে—১৩৩৬ সনের কার্ত্তিক মাসের ২৫শে তারিখ—ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে—বাঙ্গালা ১২৬৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার পুণ্য পর্ব্বাহে—কলিকাতার শ্যামবাজারের রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটের বাড়ীতে মণীন্দ্রচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি মাতা গোবিন্দ সুন্দরীর অষ্টম গর্ভের সন্তান।

মণীন্দ্রচন্দ্রের বয়স যখন দুই বছরও পূর্ণ হয় নাই—তখনই তাঁহার স্নেহময়ী জননী সংসারের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন। তারপর দশ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই মণীন্দ্রচন্দ্র দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর ও স্নেহময় পিতাকে হারাইলেন। শিশুকে সেনাপতির দায়িত্ব লইয়া সংসার-সমরাঙ্গনে দাঁড়াইতে হইল। তদবধি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে সহস্র কঠোরতার ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছিল—কিন্তু তিনি কখনও ভয়ে ভীত হন নাই।

মাতামহের উত্তরাধিকার-সূত্রে মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজারের অধিপতি হন। মাতুলানী স্বর্ণময়ীর পর যখন তিনি কাশিমবাজারের রাজ্যাদি লাভ করিলেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। সংসারের জ্ঞান লাভের আরম্ভ হইতেই মণীন্দ্রচন্দ্রকে বহু অভাবের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছিল ; কাজেই অর্থের অভাব যে কিরূপ কষ্টকর তাহা তিনি ক্ষণকালের জন্যও ভুলিতে পারিতেন না। তাই কেহ কোন অভাবের কথা লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া গেলে, তিনি সাধ্যমত তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেন।

দানই মণীন্দ্রচন্দ্রকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। আমরা তাঁহার সেই দানের কথাই প্রধানতঃ উল্লেখ করিব। তৎপূর্ব্বে তাঁহার সম্পত্তিলাভের বিষয়ে একটু কথা বলা আবশ্যক।

মণীন্দ্রচন্দ্রের মাতুল রাজা কৃষ্ণনাথ অপুত্রক মারা যান, কাজেই তাঁহার স্ত্রী মহারাণী স্বর্ণময়ী কাশিমবাজারের রাজ্য লাভ করেন। স্বর্ণময়ীর যখন মৃত্যু হয়, রাজা কৃষ্ণনাথের

মাতা রাণী হরসুন্দরী তখনও বাঁচিয়া ছিলেন। কাজেই কাশিমবাজারের সম্পত্তির মালিক হইলেন রাণী হরসুন্দরী, তিনি তখন অতিশয় বৃদ্ধা। হরসুন্দরীর মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র মণীন্দ্রচন্দ্রই তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী।

মাতুলানীর মরণের পর, মণীন্দ্রচন্দ্র মাতামহীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি মণীন্দ্রচন্দ্রকে এই চুক্তিতে সম্পত্তি ছাড়িয়া দেন যে, তাঁহাকে নগদ ৯০০,০০০ নয়লক্ষ টাকা ও ১০,০০০ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিতে হইবে। ঐ চুক্তিতেই মণীন্দ্রচন্দ্র কাশিমবাজারের অধিকার গ্রহণ করিলেন। মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের ব্যাপার প্রধানতঃ সেই থেকেই আরম্ভ হইল।

কাশিমবাজারের সম্পত্তি পাইয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে মাতুলানীর শ্রাদ্ধ পরম সমারোহে শেষ করিলেন। তদুপলক্ষে ২০ হাজার কাঙ্গালী বিদায় হইয়াছিল; তাহারা প্রত্যেকে নগদ ১৲ টাকা, একখানা কাপড় ও প্রচুর লুচিমণ্ডা পাইয়া দুই হাত তুলিয়া দাতার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিয়া গেল। সেই শ্রাদ্ধে কাঙ্গালী-বিদায়ই বৃহৎ অংশ হইয়াছিল। উহাতে ব্যয় হইয়াছিল একলক্ষ টাকা!

মহারাণী স্বর্ণময়ীর শ্রাদ্ধের পর এক মাসের মধ্যেই মাতামহী রাণী হরসুন্দরীকে প্রতিশ্রুত নয় লক্ষ টাকা দিলেন। উহার বেশীর ভাগই ঋণ করিতে হইল—কারণ রাজবাটীর তহবিল হইতে অতি অল্প টাকাই পাওয়া গিয়াছিল। আরম্ভেই এই যে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় ইহাও মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের তালিকায়ই ধরা চলে।

মণীন্দ্রচন্দ্র চির-উৎসাহী—নিরুৎসাহ তাঁহার কাছেও আসিতে পাইত না। কাজেই তহবিলে টাকার টানাটানি থাকিলেও তিনি ঐ বছরই ছোট ছোট দান ও ছোটলাট বাহাদুরের কাশিমবাজার গমন উপলক্ষে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় করিলেন। এই বছরই তিনি **মহারাজ** উপাধিতে ভূষিত হন।

বছর ঘূরিতে না ঘূরিতেই তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হইল। তাঁহার শ্রাদ্ধও হইল বেশ জাঁকজমকের সহিত; ব্যয় হইল দশ হাজার টাকা। তাহার মধ্যে কাঙ্গালী-বিদায়ের ব্যাপারে ৮০০৲ আট শত টাকার সিকি ও ৭০০৲ সাত শত টাকার পয়সাই বিতরণ হইয়াছিল।

শৈশব হইতে নানা অভাবের কষ্ট সহিয়া সহিয়া মণীন্দ্রচন্দ্র বেশ কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছিলেন। তিনি স্কুলে সামান্যই লেখাপড়া শিখিতে পারিয়াছিলেন—অথচ শিক্ষার প্রতি তাঁহার অসাধারণ আকর্ষণ ছিল। স্কুলের শিক্ষা না পাইলেও তিনি নিজের চেষ্টায় উত্তমরূপে শিক্ষা লাভ করেন। অশিক্ষা যে সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল, তাহা

তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল; উত্তরজীবনে তাই তিনি দেশের লোকের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে দানও করিয়াছিলেন প্রচুর।

মহারাজের মোটা মোটা দানের কতকগুলি সংবাদ জানা যায়। প্রকাশ্য দানের ন্যায় তাঁহার অপ্রকাশ্য দানও ছিল প্রচুর, কিন্তু তাহার বিশেষ হিসাব পাওয়া যায় না; যেগুলি পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়ঃ—

বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ—	২৫ লক্ষ
কো-অপারেটিভ হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক—	৭ „
বেঙ্গলী পত্রিকায়—	৩ „
বসু-বিজ্ঞানমন্দির—	২ „
কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়—	২ „
কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলগৃহ—	১½ „
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল—	১ „
বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস্—	১ লক্ষ
বহরমপুর জলের কল (প্রায়)	১ „
„ ট্যানারী—	৯৫ হাজার
„ মেডিক্যাল স্কুল—	৪০ „
„ উইভিং ওয়ার্কস্	২৫ „
আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল—	১৫ „
	ইত্যাদি।

এসকল ছাড়া—বহরমপুর কমার্সিয়্যাল কলেজ, কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্, পলিটেক্‌নিক্যাল স্কুল, গোবিন্দসুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজ, মূক-বধির বিদ্যালয়, কমার্সিয়্যাল ইনষ্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ, যাদবপুর বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট, এথোরা মাইনিং স্কুল, রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, পুরী বেদবিদ্যালয়, নবদ্বীপ বৈষ্ণব-দর্শন বিদ্যালয় প্রভৃতি ব্যতীত অন্যূন ১৪টি উচ্চ ইংরেজী ও পঞ্চাশটিরও অধিক মধ্য ও নিম্ন বিদ্যালয় মণীন্দ্রচন্দ্রের দানে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

শিক্ষা ছাড়াও তিনি প্রভূত দান করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্যাঙ্ক, পটারি, ট্যানারী প্রভৃতির কথা কহিয়াছি—তাহা ছাড়াও তিনি গ্লাস ফ্যাক্টরি, চীনামাটি, বালি, পাথর প্রভৃতির কারখানা—এনামেলিং, ছাপাখানা, টিনছাপা, কৃষি প্রভৃতি ব্যাপারে প্রচুর টাকা দান করিয়াছেন।

সেই সকল দানের বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দেশ ও জাতিকে শিক্ষিত এবং সমৃদ্ধ করাই তাঁহার দানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

মণীন্দ্রচন্দ্রের দানের পরিমাণ—অন্যূন তিন কোটি টাকা, উহার মধ্যে এক কোটি টাকারও অধিক অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেক দানই শিক্ষা বিস্তারের জন্য। বাঙ্গালা দেশ তো দূরের কথা, ভারতবর্ষের খুব কম ভূম্যধিকারীই দানের ব্যাপারে মণীন্দ্রচন্দ্রকে অতিক্রম করিয়াছেন

ঠাকরুণ

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন

গল্পটা অনেক আগেই শোনা ছিল, একবার নয়—অনেক বার। তা'ছাড়া এটা গল্প নয়, সত্য ঘটনা। সেদিন খোদ কর্ত্রীর—ইংরাজীতে যাকে হিরোইন বলা চলিত, মুখে শুনিবার সুযোগ পাইয়া খুশিই হইলাম।

এক নৌকায় কাছের এক গ্রামে যাইতেছিলাম। চড়নদার তার ছিল, আমি উপরি। ঠাকরুণের মেজাজও ছিল সেদিন ভাল। ছেলেবেলায় বাপ-মার দেওয়া নাম তাঁহার একটা অবশ্যই ছিল। আর বিধবা হইবার পর যখন নাবালক ছেলের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ উপলক্ষ্যে দু'দশ নম্বর মামলা করিয়াছেন, তখন সেই নামটা সরকারী আদালতের অজানাও ছিল না। কিন্তু আমরা যাহারা তাঁহার নাতির বয়সী কখনও সে নামটি শুনি নাই। বড়রা তাঁহাকে "ঠাকরুণ" বলিত, আমরাও প্রয়োজন হইলে নামের পরিবর্ত্তে সর্ব্বসাধারণ-প্রদত্ত সেই উপাধিটিরই ব্যবহার করিতাম।

ঠাকরুণ ছিলেন ভয়ানক রাশভারী লোক। সদর রাস্তার পাশে অমন যে ভা[illegible] কুলের গাছটা—তাঁহার ভয়ে একদিনও আমাদের তার ফল চাখিয়া দেখিবার সাহস হয় নাই। তাঁহার নাতি ত আমাদেরই পাঠশালার পড়ুয়া। সে-ই কি কোন্ দিন ঐ গাছের একটা কুল আমাদের আনিয়া দিতে পারিয়াছে? একহারা চেহারা, খাটো করিয়া কাটা কাঁচা-পাকা চুল, থান কাপড় পরা সে মূর্ত্তি পুকুরঘাটে দেখিলেই বুকের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া উঠিত, আর ডাকাবুকো ডানপিটে ছেলেরাও ডান-বাঁয়ে না চাহিয়া অন্য রাস্তা ধরিত। ভাল করিয়া সে মুখের দিকে চাহিবার হিম্মত আমাদের ছিল না, থাকিলেও সেখানে স্নেহ-মমতার সন্ধান পাওয়া যাইত কিনা জানি না।

ব্যাপারটা ডাকাতি সংক্রান্ত। ঠাকরুণ বিধবা হইয়াছিলেন অল্প বয়সে। [illegible] একমাত্র পুত্র তখন আট-নয় বছরের বালক। গ্রামে জায়গা-জমি কিছু ছিল, কিন্তু [illegible] কেবল নামের জন্য। খানাবাড়ীতে কয়েক ঘর নাপিত, ভুঁইমালী ও শূদ্র প্রজা না থাকিলে তালুকদারের সম্ভ্রম থাকে না। কিন্তু তাহাদের কাছে সেবা ও সেলাম ছাড়া আর কিছুর প্রত্যাশা ছিল না। আসল তালুকদারী পটুয়াখালিরও দক্ষিণে, তাহারই আয়ে সংসার চলিত। শালগ্রামের নিত্যসেবা, দোল-দুর্গোৎসব, দশকর্ম্ম হইত। এখন জল-পুলিশের দৌলতে পথের ভয় অনেক কমিয়াছে, কিন্তু তখন অত্যন্ত দুঃসাহসী পুরুষও রাত্রিকালে বরিশালের নদীতে নৌকা ভাসাইবার কথা মনে আনিত না। একবার নাকি ডাকাতেরা এক ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাঁধ হইতেই মাথাটা সরাইয়া দিয়াছিল! কিন্তু ডাকাতের ভয়ে তালুকদারী ত্যাগ করিবার মেয়ে ঠাকরুণ ছিলেন না। তবু একজন পুরুষ চড়নদার ছাড়া দু'তিন দিনের পথ নৌকায় যাতায়াত করা যায় না। কেবল চড়নদার পাইবার জন্যই তিনি নয় বছরের ছেলের বিয়ে দিলেন। তারপর ছেলে আর বেয়াই মশায়কে লইয়া ভাটির পথে নৌকা ভাসাইলেন। বরিশাল অঞ্চলে ভাটার সময়ে যেদিকে নদীর জল গড়ায় তাহাকে বলে ভাটি। ভাটি মানেই দক্ষিণ দেশ। ঠাকরুণের সঙ্গে ছিল আতপ চাল, খেসারির ডাল, সৈন্ধব লবণ প্রভৃতি বিধবার আহার্য্যের উপকরণ। ওগুলি আবার ভাটির মুসলমানপাড়ায় পাওয়া যায় না। কাজেই একটি টিনের বাক্সে দিন পনরর রসদ লইয়া যাইতে হইল।

দক্ষিণের মুসলমান চাষীরা প্রজা ও খাতক হিসাবে একেবারে আদর্শস্থানীয়। পয়সার সংস্থান থাকিলে তাহারা মনিবের ও মহাজনের পাওনা মিটাইতে মোটেই আপত্তি

করে না। জমি চাষ করা, ধান বোনা, নিড়ান প্রভৃতি কাজে তাহাদের আদৌ আলস্য নাই,—রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া ক্ষেতের কাজ করিয়া যায়; কিন্তু ধান পাকিলেই তাহারা বাড়ীতে গদিয়ান হইয়া বসে। পাকা ধান কাটিয়া বাড়ীতে আনা, আনিয়া ঘরে তোলা নাকি ভয়ানক ছোট কাজ। দক্ষিণের মিয়ারা তাই পাকা ধানে কাস্তে লাগায় না, তাহাদের চৌদ্দপুরুষে এমন অপকর্ম্ম কেহ করে নাই। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটতরাজ, ডাকাতি, রাহাজানি, মাথা দেওয়া এবং মাথা নেওয়া—এই ত মরদের কাজ! আবশ্যক হইলে এসব কাজে তাহারা পেছ-পা হয় না, কিন্তু ধান কাটা—ছি! ধান পাকিলেই উত্তর হইতে "দাওয়াল" আসে, ধান কাটিয়া, মলিয়া, ঝাড়িয়া ঘরে তুলিয়া দিয়া তাহারা দেশে চলিয়া যায়। খালি হাতে যায় না। মজুরী বাবদ শস্যের এক-চতুর্থাংশ নৌকায় বোঝাই করিয়া লইয়া যায়। তারপর বিবিরা ধান ভানিয়া দিলে মিয়াসাহেব হাট-বাজার করেন। চাউল বেচার মরসুম পড়িলেই মাছ-তরকারীর দর চারগুণ বাড়িয়া যায়; মনোহারী দোকানের বেলোয়ারী জিনিস দুই দিনে নিঃশেষ হইয়া যায়; বাড়ীতে বাড়ীতে রঙ্গিন গামছা, লুঙ্গি ও সাড়ী আমদানী হয়। তারপর তিন-চার মাসের মধ্যেই চাউল বেচা টাকার আর খোঁজ মেলে না। মাছ-তরকারীর দর আবার নামিয়া যায়। মিয়াসাহেবেরা যান মনিব ও মহাজনের কাছে টাকা কর্জ্জ করিতে। চলে মাঠের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, আবার আরম্ভ হয় অভাবের তাড়না, কিন্তু হাতে টাকা আসিলে প্রথমেই মনিবের ও মহাজনের পাওনা মিটাইয়া দেয়। যাহার মাটি পুড়াইয়া খায় তাহার রাজস্ব না দিলে খোদা নারাজ হইবেন, অমন কাজ করিতে নাই। কাজেই ভাটিতে খাজানা আদায় করা মোটেই কঠিন কাজ নয়—দিন আট-দশেকের মামলা! মুস্কিল হইল খাজানার টাকা লইয়া নিরাপদে বাড়ীতে ফেরা। তা কোন রকমে বরিশাল সহর পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিলে আর ভয় নাই। তারপর পথ ভাল। দিনেও নদীর পথ নিরাপদ। সন্ধ্যাকালে কোন হাটে বা গঞ্জে পৌছিতে পারিলেই হইল। আর ভাগ্য-গতিকে যদি কোন ডাকাতের গ্রামে স্থান পাওয়া যায়, তবে ত কথাই নাই। বলিয়া রাখিলেই হইল 'মিয়াসাহেব, তোমার ঘাটে নৌকা বাঁধিলাম,' তারপর তোমার টিকি স্পর্শ করে কার সাধ্য!

ঠাকরুণ মোটা টাকা লইয়া ঘরে ফিরিতেছিলেন। তখন পাড়াগাঁয়ে নোটের রেওয়াজ হয় নাই। রূপার টাকার ওজন বেশি। কিন্তু উপায় কি? টাকাগুলি গেঁজেয়

ভরিয়া ভাল করিয়া কোমরে বাঁধিয়া লইয়াছেন। সঙ্গে আছে ছেলে, বেয়াই আর বিধবার রসদে ভরা সেই টিনের বাক্স। ভয়ের জায়গাগুলি নিরাপদেই পার হইয়া আসিয়াছেন, এখন বরিশাল পৌছিলেই হয়। দণ্ডখানেক রাত্রি হইয়াছে, কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারও আছে, কিন্তু জোয়ারের নৌকা বরিশাল পৌছিতে কতক্ষণই বা লাগিবে। সহরের আলো ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কতটুকুই বা পথ।

ঠাকরুণ ভাবিতেছেন—এ যাত্রা ভালয় ভালয়ই কাটিল। এমন সময় অন্ধকারের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল—"ও মাঝি! নৌকায় আগুন আছে?"

আগুন! আগুনের কথা শুনিয়া বেয়াই মশাই ত ভিরমি গিয়াছেন। মাঝির

হাতের বৈঠা অচল হইয়াছে, ঠাকরুণও একটা কাঁথা গায়ে জড়াইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন! স্থির আছে কেবল নাবালক ছেলেটি। সে জানে না, নদীপথে রাত্রিবেলা যাহারা মাঝির কাছে আগুন চায় তাহারা তামাক খাইতে আসে না, আসে ডাকাতি করিতে। ভয়

পাইলেও ঠাকরুণ কিন্তু বুদ্ধি হারান নাই। চক্ষের নিমেষে একখানা ছিপ নিঃশব্দে ডিঙ্গির পাশে আসিয়া থামিল। ছিপে সাত-আট জন লোক, সকলেরই হাতে ধারাল অস্ত্র।

"এই যে—নৌকায় যা আছে ভালয় ভালয় দিবি না মাথাটা দু'ফাঁক ক'রে দেব?"

বেয়াই মশায় অজ্ঞান, তাঁহার মুখ হইতে বাক্য বাহির হইল না। কথা কহিলেন ঠাকরুণ,—"বাবারা, তোমরা আমার ধর্ম্মবাপ। ঐ সামনেই বাক্স রয়েছে, যা আছে ওরই ভিতরে। আমার কেউ নেই, এই একটি নাবালক ছেলে, ওর গায়ে হাত দিও না। যা আছে সব নিয়ে যাও…এই মাঝি! বাক্স বের ক'রে দে!"

ডাকাতেরা দেখিল বাক্সটি বেশ ভারী! সহরের কাছে রাত্রেও নৌকার চলাচল বেশি। তখন রাত্রিও বেশি হয় নাই, সাঁঝের বেলা বলিলেই চলে। বেশি দেরী করা বুদ্ধিমানের কার্য নয়। যাহা পাওয়া গিয়াছে—মোটা রকমই হইবে। লইয়া সরিয়া পড়াই ভাল। এই ভাবিয়া ডাকাতেরা সরিয়া পড়িল। বাক্স খুলিয়া দেখিবার অবসর তখন নাই। ঠাকরুণের মাঝিরা প্রাণপণ শক্তিতে বৈঠা মারিয়া সহরের ঘাটে পৌঁছিল।

ঠাকরুণের সাহস ও বুদ্ধির কাহিনী প্রচার হইতে বেশি বিলম্ব হয় নাই, বেহুঁশ বেয়াই বোধ হয় কিছুই বলেন নাই। কিন্তু মাঝির পোর হুঁশ ছিল। ছেলেবেলায় ঠাকরুণের কথা উঠিলেই বড়রা বলিতেন—ওরে বাবা, ওর সঙ্গে লেগো না। ভাটির ডাকাতদের বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এল!

এতদিন তোমাদের বলিয়াছি রাজা, বাদশাহ, উজির, সেনাপতিদের ইতিহাস, এবার বলিলাম বাঙ্গালার এক অখ্যাত পল্লীর অজ্ঞাতনাম্নী নারীর ইতিহাস। একদিন বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে এই প্রকারের বীর নারীদের সাক্ষাৎ মিলিত। সাহসে, বুদ্ধিতে, বিবেচনায় তাঁহারা পৃথিবীর অন্য কোন দেশের নারীর চেয়ে ছোট ছিলেন না। তাঁহাদের কথা আমাদের শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

১৩৫৩

গুপ্তধন

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

[ক]

ঐ যে লোকটি লাঠি ঠক্-ঠক্ করতে করতে এগিয়ে আসছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ওকে তোমরা কেউ চেনো কি ?

গায়ের রং ভুসোকালির মত ; বয়স ষাটের কাছাকাছি এবং দেহ অস্থিচর্ম্মসার হলেও তেলপাকা বাঁশের লাঠির মত শক্ত ও সোজা ; চোখদুটো একে কুৎকুতে, তায় ট্যারা এবং ডান পা-খানা বাঁকা ও খোঁড়া। লোকটি নাপিতকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার জন্যে মাথায় রাখে লম্বা চুল এবং মুখে রাখে গোঁফ-দাড়ি। কাপড়ের বাজার আক্রা ব'লে পরে কালো রঙের লুঙ্গী। সর্ব্বদাই গলায় চিটচিটে ময়লা পৈতে ঝুলিয়ে আদুড় গায়ে থাকে এবং বাইরে যেতে বাধ্য হলে অঙ্গে ধারণ করে বড় জোর একটা গেঞ্জী।

চেহারাখানি পছন্দ হচ্ছে না ? ওর নামটিও বোধহয় তোমাদের মনে ধরবে না—শ্রীবটুক-ভৈরব ভট্টাচার্য্য।

মহাকবি সেক্সপিয়রের স্বষ্ট কুশীদজীবী মহাজন সাইলকের নাম আজ সারা পৃথিবীতে কুবিখ্যাত হয়ে আছে।

বরানগরে সেক্সপিয়রের সমকক্ষ কবির জন্ম হয় নি, তাই বটুকভৈরব ভট্টাচার্য্যের নাম দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। কিন্তু স্থানীয় লোকজনদের কাছে সে ছিল বিভীষিকার কুখ্যাত অগ্রদূতের মত।

বটুক দিন গুজরান করত সুদে টাকা খাটিয়ে। মা বাপ ভাই বোন বউ ছেলেমেয়ে বলতে বটুকের কেউ ছিল না, কিন্তু তার মুখ দেখলে বা কথা শুনলে মনে হয় না যে, এজন্যে সে কিছুমাত্র অভাববোধ করে! নিজের বাড়ীতে একাই একশো হয়ে থাকতে চায়, বামুন চাকর ঝী পর্য্যন্ত রাখতে নারাজ—বলে, চুরি করবে, গলায় ছুরি দেবে, সর্ব্বস্ব লুটে নেবে। লোকে বলে, তার

লোহার সিন্দুক হাতড়ালে পাওয়া যাবে নগদে আর সোনাদানায় লক্ষটাকার ঐশ্বর্য্য। অথচ একখানা পুরাতন নড়বড়ে ছোট বাড়ীর তিনখানা খুবরী খুবরী ঘর নিয়ে সে থাকে এবং সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম চালনা করে স্বহস্তে।

বুঝতেই পারছ, যাকে বলে হাড়কিপটে, বটুক হচ্ছে সেই দলের লোক। সে ফোঁটা-তিলক কেটে নিজেকে পরম বৈষ্ণব ব'লে প্রচার করে, কাজেই সেই অজুহাতে মাছ-মাংস ছোঁয় না। মাসে দুই-একদিনের বেশী বাজারে যায় না, কারণ নিজের বাড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন একখণ্ড জমিতে ফলিয়েছিল লাউ, কুমড়ো, বেগুন ও ঝিঙে-ধুঁদুল প্রভৃতি তরিতকারি, দুটি ভাতের সঙ্গে তাই দিয়েই সে নিবারণ করত ক্ষুধার তাড়না।

আমরা বলাবলি করতুম, বটুকের টাকায় হাত দেবার জনপ্রাণী নেই, তবে কার জন্যে সে এত কষ্ট স্বীকার করছে? এই টাকার কুমীর কি মরবার পরেও যক হয়ে নিজের সিন্দুক আগলে ব'সে থাকবে?

সে কথা কয় এমন ট্যাকখোরের মত যে শুনলেই খারাপ হয়ে যায় মেজাজ। তার মনের মিল নেই কারুর সঙ্গেই এবং সাধ্যমত কেউ তার ছায়া মাড়াতে চাইত না। কিন্তু তবু অভাবী ও অভাগা লোকেরা তার দরজায় ধন্না দিতে বাধ্য হ'ত কেবল টাকা ধার করবার জন্যেই।

[খ]

উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ অর্থাৎ টাকা যারা ধার দেয় আর যারা ধার নেয় তাদের মধ্যে মিষ্ট সম্পর্ক থাকে না কোন কালেই।

আবার এমন সব মহাজনও আছে, ঋণীদের কাছে যারা দুর্জ্জন নয়। গোড়াতেই ব'লে রেখেছি এ শ্রেণীর মহাজন ছিল না বটুকভৈরব। নিতান্ত দুর্ভাগ্য না হলে কেউ তার দ্বারস্থ হতে চাইত না। সুদ তার যেমন চড়া, মেজাজ তার তেমনি কড়া।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নিতাইচাঁদের কথাই ধর না! বছর দুই আগে কলেরায় একসঙ্গে মারা পড়ল তার বউ, এক ছেলে ও এক মেয়ে। তার সংসারে আপন বলতে রইলেন কেবল মা, গত বৎসর থেকে তিনিও পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী এবং এ বৎসর তাঁর শয্যা পরিণত হয়েছে মৃত্যুশয্যায়। এখনো বেঁচে আছেন বটে, কিন্তু ডাক্তারে জবাব দিয়ে গেছে।

নিতাই একে গরিব, তার উপরে ঐ সব আধিব্যাধির দায়ে তাকে বাধ্য হয়ে বারে বারে বটুকের কাছ থেকে বাড়ী ও জমি বাঁধা রেখে টাকা ধার করতে হয়েছিল। আসল ধার পাঁচশো টাকার বেশী নয়, কিন্তু নিতাইকে এ পর্য্যন্ত সুদ গুণতে হয়েছে যত টাকা, তার পরিমাণ ছাড়িয়ে উঠেছিল আসলকেও।

নিতাইয়ের মায়ের অবস্থা সেদিন অতিশয় খারাপ, সে দিনটা কাটে কিনা সন্দেহ।

এমন দুর্দ্দিনেই নিতাইদের সদরে লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বটুকের আত্মপ্রকাশ। এসেই খ্যাকৃখেঁকিয়ে সে ব'লে উঠল, "অহে নিতাই, বলি তোমার মৎলোবখানা কি? গেল মাসের সুদ বাকি পড়েছে, এ মাসে আমি আর কোন কথাই শুনব না!"

নিতাই হাতজোড় করে বললে, "আজ্ঞে ভটচায-মশাই, বাড়ীর পাশেই থাকেন, কিছুই তো আপনার অগোচরে নেই! আমার মা যে এখন যান তখন যান হয়ে আছেন।"

বটুক তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠে বললে, "তোমার মা মরবে তো আমার কি? নিয়ে এস আমার টাকা, নইলে আমি নালিশ করব।"

নিতাই বললে, "মা মারা গেলে আমি এই বাড়ী আর জমি বেচে সুদে-আসলে আপনার টাকা শোধ করব। অন্তত: এ মাসটাও আমাকে রেহাই দিন্।"

কিন্তু বটুক নাছোড়-বান্দা। নিতাইয়ের কাকুতিমিনতি, চোখের জল, পায়ে ধরা সবই ব্যর্থ। অবশেষে পাড়ার এর-ওর-তার কাছে হাত পেতে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কোনরকমে তাকে দুই মাসের সুদের দাবি মেটাতে হ'ল।

[গ]

তারপর কাটল তিন সপ্তাহ।

ইতিমধ্যে নিতাইয়ের মায়ের মৃত্যু ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে এবং শ্রাদ্ধের ভোজ-সভায় বটুকও যোগ দিতে লজ্জিত হয় নি।

সেইদিনই নিতাই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিল, "ভটচায-মশাই, আপনার পাঁচশো টাকার জন্যে ভাববেন না, বাড়ী আর জমি বিক্রী করবার জন্যে এর মধ্যেই আমি দালালদের খবর দিয়েছি।"

চ'লে আসতে আসতে নীরস কণ্ঠে বটুক বলেছিল, "দেখা যাবে।"

বটুকের ঘুম বড় সজাগ, চোরের ভয়ে কোথাও খুট্ ক'রে শব্দ হলেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। এক রাত্রে কি এক সন্দেহজনক আওয়াজে চট্ ক'রে তার ঘুম ভেঙে গেল। স্তব্ধ গভীর রাত্রে কোথায় যেন কোদাল দিয়ে মাটি কোপানো হচ্ছে। বটুক বিছানা ছেড়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলে এক অদ্ভুত দৃশ্য।

নিতাইদের বাড়ীর পিছনদিকটা জুড়ে ছিল খানিকটা জঙ্গলভরা পোড়ো জমি, কেউ সেদিকে যেত না। একটা ঝোপের পাশে জ্বলছে হারিকেন লণ্ঠন। একজন লোক কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে এবং আর একজন লোক মস্ত পোঁটলা থেকে কি সব বার ক'রে পাশের একটা বড় ট্রাঙ্কের ভিতরে রেখে দিচ্ছে!

কি ওগুলো? রাশি রাশি টাকার মত চকচকে চাকতি! হ্যাঁ, ওগুলো টাকা না হয়ে যায় না! হে ভগবান, এ যে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা!

ওরে বাস্ রে, ও-সব আবার কি? তাড়া তাড়া কাগজ যে! কি কাগজ? মিটমিটে আলোয় দূর থেকে স্পষ্ট না দেখা গেলেও কাগজের আকার দেখে এটুকু বুঝতে দেরি লাগে না যে, ওগুলো হচ্ছে নোটের তাড়া! বটুক একে একে গুণে দেখলে, পঞ্চাশটা মোটা মোটা তাড়া! ওরে বাবা!

গর্ত্ত খোঁড়বার পর লোকদুটো ট্রাঙ্কটা তার মধ্যে পুরে আবার মাটি চাপা দিলে। তারপর সেখানে গাদা গাদা ডাল-পাতা ও রাবিস বিছিয়ে উঠে দাঁড়াল। একবার চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে আলো নিবিয়ে ফেললে। তারপর আবছা-আবছা দেখা গেল, তারা চোরের মত চুপি চুপি পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কোথায়!

বিষম লোভে বটুকের চোখ জ্বলতে ও দারুণ উত্তেজনায় তার বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল। এ যে গুপ্তধনের ব্যাপার, তাতে আর সন্দেহ নেই। বেটারা নিশ্চই চোর কি ডাকাত, কোথায় চুরি বা লুটতরাজ ক'রে পুলিসের ভয়ে আপাততঃ কিছুদিনের জন্যে এখানে বামাল লুকিয়ে রেখে গেল! সবাই জানে এই পোড়ো জমিতে কেউ পা বাড়ায় না।

বটুক আন্দাজ করতে লাগল, কত টাকা ওখানে থাকতে পারে? অন্ততঃ পঁচিশ-ত্রিশ হাজারের কম নয়—চাই কি পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর বা তারও চেয়ে বেশী হতে পারে। নোটগুলো যদি একশো টাকার হয়, তা'হলে তো কথাই নেই! উঃ!

লাফ মেরে পাঁচিল ডিঙিয়ে তখনি চোরের উপরে বাটপাড়ি করবার জন্যে বটুকের হাত-পা নিস্‌পিস্ করতে লাগল। কিন্তু তার পা খোঁড়া এবং পাঁচিল যা উঁচু! তারও উপরে নিতাইদের আছে দুটো বড় বড় খেঁকী নেড়ী কুকুর, মাঝে মাঝে তারা তাকেও দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া ক'রে আসে। কুকুরের কামড় খেয়ে জলাতঙ্ক রোগে মরবার সাধ তার নেই।

কিন্তু কুকুরেরা এই অজানা লোকছুটোর সাড়া পেলে না কেন? তারা কি বাইরে টহল দিতে গিয়েছে?

[ঘ]

পরের দিন ভোরবেলাতেই বটুক হন্তদন্ত হয়ে নিতাইয়ের বাড়ীতে ছুটল।

নিতাই সুধোলে, "কি ভটচায-মশাই, এত সকালে যে?"

বটুক বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার লোক নয়। বললে, "বাবা নিতাই, তুমি সেদিন বলছিলে না, তোমার বাড়ী আর জমি বেচতে চাও?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। দালালের মুখে একজন খদ্দের দর দিয়েছেন সাড়ে সাত হাজার টাকা।"

—"সাড়ে সাত হা-জা-র! ওরে বাবা, ঐ পচা বাড়ী আর পোড়ো জমির দাম সাড়ে সাত হাজার টাকা! কারুর কি মাথা খারাপ হয়েছে হে?"

নিতাই বললে, "এক বুড়ো জমিদারের সখ হয়েছে শেষ-জীবনটা গঙ্গার ধারে কাটিয়ে দেবেন। আমার বাড়ী থেকে গঙ্গা দেখা যায়। ছুই-একদিনের মধ্যেই বায়না হবার কথা।"

নগদ সাড়ে সাত হাজার টাকা যে বুকের রক্তের অনেকখানি! অতগুলো টাকা কি ফস্ ক'রে হাতছাড়া করা যায়? ছুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বটুক গুটি-গুটি বাড়ী ফিরে এল। সারা রাত ছুর্ভাবনায় তার ঘুম হ'ল না। বলে কি না ছুই-একদিনের মধ্যেই বায়না হয়ে যাবে! তবেই তো!

কিন্তু যে পড়ো-পড়ো বাড়ীর বাজার-দর দেড় হাজার টাকাও উঠবে না, তার জন্যে কি—

বটুক আর ভাবতে পারলে না, পরদিনেই আবার গিয়ে হাজির হ'ল নিতাইয়ের দরজায়।

—"কি ভটচায-মশাই!"

—"নিতাই, তোমার বাড়ী আমিই কিনব। কিন্তু এক সর্ত্তে।"

—"সর্ত্তটা কি?"

—"তোমাকে তিন দিনের মধ্যে বাড়ী ছাড়তে হবে।"

—"এত তাড়াতাড়ি কিসের?"

—"ভালো ভাড়াটে পেয়েছি। এক বছরের ভাড়া আগাম দেবে। এখনি আসতে চায়।"

—"বেশ, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু চাই নগদ সাড়ে সাতহাজার টাকা।"

ফোঁশ্ ক'রে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বটুক তিক্তকণ্ঠে বললে, "বেশ, বেশ, তাই হবে!"

[ঙ]

তাই হ'ল। লেখাপড়া হয়ে গেল চটপট। ধার শোধের জন্যে মহাজনকে পাঁচ শত টাকা দিয়ে, পূরো সাতহাজার টাকা নিয়ে নিতাই তিন দিনের মাথায় ছাড়লে তার বাস্তুভিটা।

বটুকের আর তর সইল না, তৎক্ষণাৎ নিতাইয়ের বাড়ী দখল ক'রে বসল। তার মন বুকের ভিতরে ধেই-ধেই ক'রে নাচতে নাচতে ক্রমাগত বলতে লাগল—কেল্লা মার দিয়া, কেল্লা মার দিয়া বাবা, কেল্লা মার দিয়া!

তারপর সেই রাত্রেই।

ঝিমন্ত রাতে ঘুমন্ত বাতাস। গঙ্গার বুকেও ঝিম্‌ঝিম্ ভাব, স্রোত বইছে ঝির-ঝির—শোনা যায় কি না যায়। খালি ঝিঁঝিপোকাগুলো ঝর্ঝরে গলায় একটানা ডেকে চলেছে ঝিঁঝি ঝিঁঝি—

এমন সময়ে পোড়ো জমির উপরে এক হাতে লণ্ঠন ও আর এক হাতে কোদাল নিয়ে বটুকের আবির্ভাব।

এই সেই জায়গাটা।

তাড়াতাড়ি ডালপালা ও রাবিস সরিয়ে মাটি কোপাতে কোপাতে বেরিয়ে পড়ল একটা মরচে-ধরা, তোব্‌ড়ানো ও পুরাতন টিনের ট্রাঙ্ক।

থর-থর কম্পিত বুকে বটুক ট্রাঙ্কের ভিতরে হাত চালিয়ে আঁজলা ক'রে বার করতে লাগল রাশি রাশি চক্‌চকে টিনের চাকতি! আর বেরুতে লাগল নোটের মাপে কাটা তাড়া তাড়া চোতা কাগজ!

ট্রাঙ্কের ভিতরে আর কিছুই নেই—খালি রাশি রাশি টিনের চাকতি আর তাড়া তাড়া চোতা কাগজ—টিনের চাকতি আর চোতা কাগজ!

বিকট স্বরে আর্ত্ত চীৎকার ক'রে বটুক অজ্ঞান হয়ে ঘুরে প'ড়ে গেল সেইখানেই!

* * * *

তখন কলকাতায় চৌরঙ্গীর এক রেস্তোরাঁয় ব'সে চপ, কাটলেট আর ফাউল কারির 'অর্ডার' দিয়ে নিতাই তার আরো দুই বন্ধুর সঙ্গে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল।

তাদের ফন্দী যে এত সহজে এমন লাগসই হবে এটা কেউই আন্দাজ করতে পারে নি।

রুদ্র গোপাল

শ্রীকালিদাস রায়

একটি মাত্র ক্ষুদ্র নবাব
জেদী ঝুঁকি রুদ্র-স্বভাব,
তারি দাপে ভবন কাঁপে
করছে টলমল।

ভাঙছে এটা ছিঁড়ছে ওটা
রাখছে না সে কিছুই গোটা
ছড়িয়ে খাবার কাকা বাবার
হাসছে খল-খল'।

মা এসে তায় বকলে পরে
ছুটে পালায় দাত্থর ঘরে।
দাত্থ বলে, বকছ কেন
কী ক্ষতি বা করছে।

ওর চেয়ে যে অনেক ক্ষতি
তোমরা কর গুণবতি!
প্রতি মাসেই মেরামতি
অনেক খরচ পড়ছে।

ছিঁড়ছে সে গোঁপ দাত্থর বুকে
নস্যি গুঁজে দিচ্ছে মুখে,
উল্টে দোয়াত কালি ঢেলে
দিচ্ছে লেখায় তাঁর।

দাত্থ বলে, ঢালছ ঢালো
লেখা হবে এবার ভালো,
নতুন করে লিখতে গেলেই
হয় তা চমৎকার।

লুপ্ত পশুপাখী

শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

অতীতে, লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে, পৃথিবীতে যে সব অদ্ভুত পশুপাখী ছিল—যা' লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে লোপ পেয়েও গেছে, তার কথা তোমরা কিছু কিছু হয়তো জান। সেকালে 'ডাইনোসর' নামে বিরাট জানোয়ার ছিল—না সাপ, না গিরগিটি ; আকারে হাতীর চেয়েও অনেক বড়। তাদের কেউ ছিল নিরামিষ-ভোজী, কেউ ছিল আমিষ-ভোজী ; কা'রও গায়ে আবার কাঁটার মত অস্ত্রও ছিল। তাদের অস্থি আজও পাথরের অবস্থায় মাটির মধ্যে পাওয়া যায়। এই সব ডাইনোসর লোপ পেয়ে গেলে, অন্যান্য জানোয়ার এল—দাঁতওয়ালা বিরাট পাখী, বিরাট গণ্ডার, বিরাট হিপ্পো, অতিকায় ভাল্লুক, হাতীর মত দন্তী বাঘ, অতিকায় হরিণ, অতিকায় হাতী। একালের পাখী, গণ্ডার, হিপ্পো, বাঘ, ভাল্লুক, হরিণ, হাতীর সঙ্গে ওদের চেহারার কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তফাৎ যথেষ্ট ছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আদিম মানুষ তা'দের অনেককেই চোখে দেখে থাক্‌বে।

এ তো গেল বহু সহস্র বৎসর আগেকার কথা। সেকালের বিরাট জন্তুরা তো কবে লোপ পেয়ে গেছে। তখন মানুষ অসভ্য অবস্থায় ছিল—লিখ্‌তে পড়্‌তে জান্‌ত না,—এমন কি, ভাষারও সৃষ্টি হয় নি তখনও। মানুষের চোখের সাম্‌নে কয়েক শ' বৎসরের মধ্যে যে কত পশুপাখী লোপ পেয়ে গেছে এবং যাচ্ছে, তার খবর রাখ কি ?

এই তো, আমাদের দেশেই কয়েক শ' বৎসর আগে যত সিংহ ছিল তা'র শত-ভাগের এক ভাগও এখন নেই। কাথিওয়াড়ের মরুভূমির পাশে দু'চারটা সিংহ আজও পাওয়া যায়। এদের যত্ন ক'রে না বাঁচালে হয়তো এরা শীঘ্রই লোপ পেয়ে যাবে। হিমালয় পাহাড়ে 'বিরাট পাণ্ডা' নামে এক রকম ভাল্লুক জাতীয় জন্তু বাস করে ; তাদের সংখ্যা এতই কম যে, নির্জ্জন পাহাড়ে—গহন বনের ধারে, মাসের পর মাস সন্তর্পণে ঘুরে বেড়ালে, আর, অবিরাম দৃষ্টি রাখ্‌লে, তবে যদি তার দেখা পাওয়া যায়। আফ্রিকার ওকাপিরও দেখা পাওয়া ভার। ভীষণ গহন বনে, স্যাঁৎসেতে জায়গায়, লোকালয় হ'তে শত শত মাইল দূরে, গাছের আড়ালে অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে দু'চারটা ওকাপি ঘুরে

বেড়ায়। সেখানে যাওয়াই বিপজ্জনক, বেশী দিন থাকা তো দূরের কথা। অথচ সহজে ওকাপির দেখা পাওয়াও দায়। কাজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছ ওকাপির দেখা পাওয়া কত কঠিন, তা'কে ধরা আরও কত কঠিন। এ জন্তুও হয়তো কোন দিন লোপ পেয়ে যাবে। গরিলা সম্বন্ধেও আশঙ্কা হয় যে, এরাও হয়তো কোন দিন লোপ পেয়ে যাবে। এরাও সংখ্যায় কম, তবে, সুখের বিষয়, মানুষ এখন আর গরিলার চাল-চলন সম্বন্ধে অজ্ঞ নয়, গরিলার বাচ্চা ধ'রেও বাঁচাতে পারে।

মানুষের চোখের সাম্‌নে, গত দুই শতাব্দীর মধ্যে কয়েক রকম পশুপাখী লোপ পেয়ে গেছে তা' জান কি? আজ তা'দের কথাই তোমাদের বল্‌ব।

এই যে জীবটির ছবি দেখ্‌ছ, একে "মেছো-শীল" বলা যেতে পারে। চেহারাটা অনেকটা শীলের (Seal) মত, কিন্তু গায়ে লম্বা লম্বা খাঁজ আছে, আর মাছের মত লেজ

মেছো-শীল

আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই জন্তু লোপ পেয়েছে। বেরিং দ্বীপ এবং প্রণালীর কাছে এই জন্তু দেখা যেত; কয়েকটির অস্থিও আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন যাদুঘরে রাখা আছে। এই ছবিটি একটি প্রাচীন ছবি।

পরপৃষ্ঠায় দু'টি ছবি র'য়েছে; তার মধ্যে বাঁ-দিকে যে পাখীটির ছবি দেখ্‌ছ, তা'র নাম 'ডোডো' পাখী। সে-ও পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। বেচারার উড়্‌বার শক্তি ছিল না, তাড়াতাড়ি চল্‌তেও পার্‌ত না;—তা'র উপর শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে তেল থাকায় এবং মাংস খুবই নরম থাকায় মানুষের নজরে প'ড়েছিল। বোর্ব্বন বা রিউনিয়ন দ্বীপে এর বাস ছিল। মানুষের হাতে প'ড়ে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই পাখী লোপ পেয়ে গেছে।

ডোডো পাখীর পাশে যে পাখীটির ছবি দেখ্‌ছ, সে ছিল পেঙ্গুইনের জাত-ভাই; নাম ছিল 'অক্' বা 'বৃহৎ অক্'। ওই পাখীরও উড়্‌বার ক্ষমতা ছিল না। উত্তর মেরুর

কাছাকাছি, আমেরিকার এক অংশে ওর বাস ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে এই 'অক্' পাখীকে জীবন্ত অবস্থায় শেষ দেখা যায়। ঐ অঞ্চলে অগ্ন্যুৎপাত হ'য়ে ওরা সবংশে বিনাশ পায়। তা'র পর, বহু চেষ্টায় ওদের একটিকেও দেখা যায় নি।
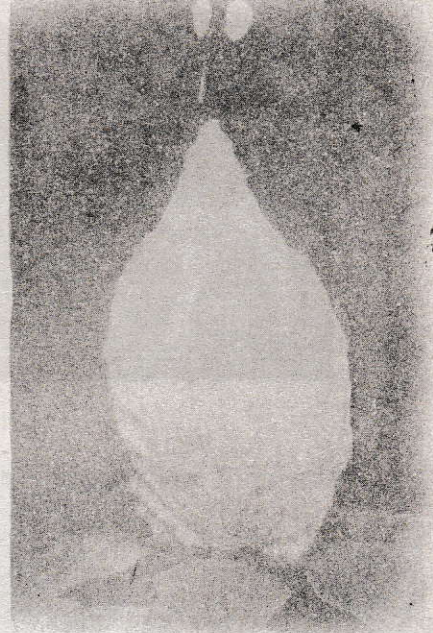
ডোডো পাখী অক্ পাখী

পরপৃষ্ঠার প্রথমে যে পশুর ছবি র'য়েছে, তা'র মাথাটা অনেকটা জেব্রার মত—শুধু, দেহের উপর সাদা ডোরা (জেব্রার থাকে সাদার উপর কালো ডোরা)। মাথার তুলনায় শরীর কিছু ছোট ; পাগুলি সরু। এরা থাক্‌ত দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব আফ্রিকার বড় বড় খোলা ময়দানে ; ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দেও জীবন্ত অবস্থায় এদের দেখা গিয়েছিল, তা'র পর আর দেখা যায় নি। এদের নাম "কোয়াগা"।

কোয়াগার পরের ছবিতে যে জীবটি র'য়েছে, তা'র নাম হ'লো "আলমিকি"। তা'র অর্দ্ধেক ইঁদুর, অর্দ্ধেক ছুঁচো। নাক কিন্তু ছুঁচোর চেয়েও অনেক লম্বা ;

গায়ে লম্বা লোম, পায়ের নখ খুব লম্বা, ছোট লোমহীন লেজ; আকারে বেজির সমান বড়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কিউবা দ্বীপে এই জীবকে শেষ দেখা যায়।
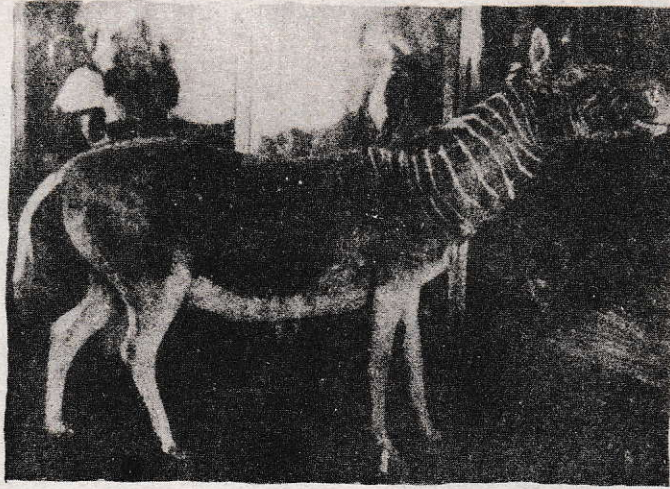
কোয়াগা

'অক্', 'কোয়াগা' আর 'আলমিকি'র যে ছবি দেওয়া হ'লো, এগুলো বার্লিনের যাদুঘরে তোলা। সেখানে এই সব জীবের এক একটি নমুনা রাখা আছে। 'ডোডো' আর 'মেছো-শীল' বহুকাল আগে লোপ পেয়েছে; কাজেই, তা'দের হাড় ছাড়া আর কিছুই এখন নেই। তাদের হাতে-আঁকা ছবি দেওয়া হ'লো।

আলমিকি

পৃথিবী থেকে বহু প্রাণী লুপ্ত হ'য়ে গেছে; কোন কোন জাতের প্রাণী হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যে লোপ পাবে। কিন্তু, আজও মানুষ সব জাতের প্রাণীর দেখা পায় নি। কত পোকা, কত পাখী, কত পশু যে আজও মানুষের চোখের অন্তরালে লুকিয়ে আছে তা' কে বল্‌তে পারে? এই তো সে'দিন বোর্ণিওর কাছে কমোডো দ্বীপে
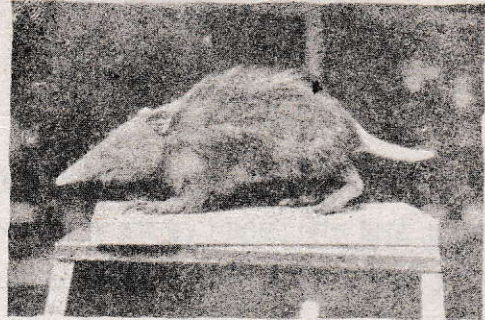
অতিকায় গোসাপ আবিষ্কৃত হ'লো। কত শত জাতের পোকা যে প্রতি বৎসর আবিষ্কৃত হচ্ছে তা'র খবর রাখ কি? সে'দিন চীনদেশের গভীর জঙ্গলে ছু-লেজা বানর ধরবার জন্য এক দল বৈজ্ঞানিক গিয়েছেন। প্যাটাগনিয়া ও ব্রেজিলের জঙ্গলে আজও নানা জাতের পশুপাখীর খোঁজে বৈজ্ঞানিকেরা চ'লেছেন। হিমালয়ের নানা অঞ্চলে নূতন
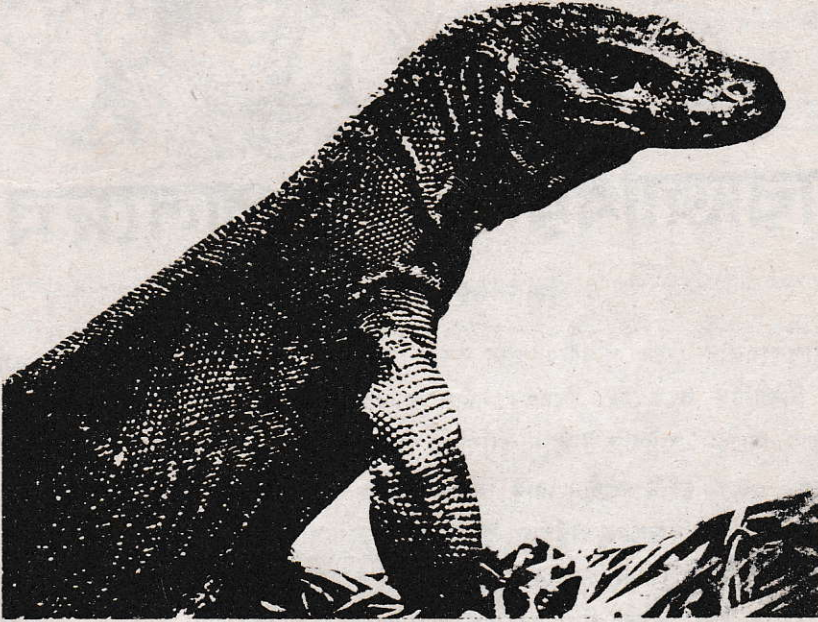
অতিকায় গোসাপ

জাতের পশুপাখীর খোঁজ আজও চলেছে। বর্ম্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে আজও নানা রকমের জীব (বিশেষতঃ পোকা-মাকড়) আছে যা'দের সভ্য মানুষ চোখেই দেখে নি।

একদিকে যেমন কোন কোন জাতের পশুপাখী লোপ পাচ্ছে, তেমনি আবার অন্য দিকে নূতন জাতের পশুপাখীর দেখা পাওয়া যাচ্ছে। মোটের উপর, বৈজ্ঞানিকের খাতায় খরচের চেয়ে জমার দিকটাই বেশী আছে এখনও।
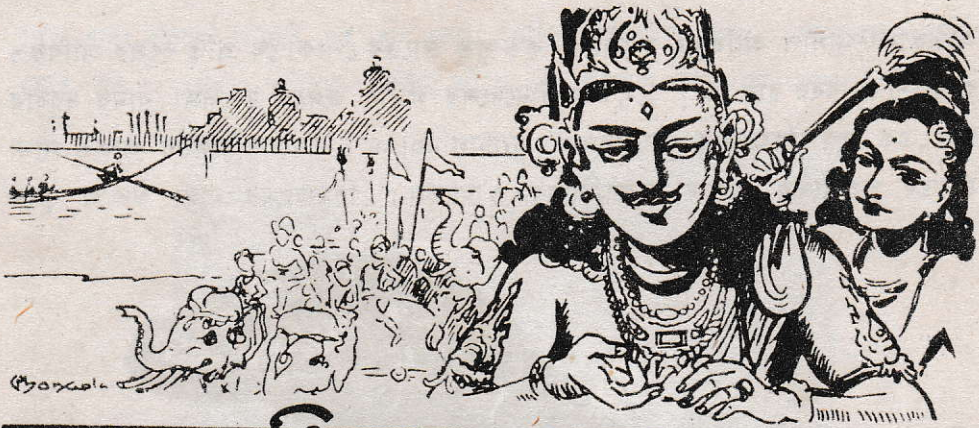
মহারাজাধিরাজ গোপালদেব

শ্রীবিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

আজকালকার দিনে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রাজ্যশাসনের জন্য প্রজারা একজনকে রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচিত করে নেয়। দেশ শাসন-পালনের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা তাঁরই হাতে থাকে। যেমন আমেরিকায় আছেন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান, রাশিয়ায় আছেন স্ট্যালিন। আমাদের দেশ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট থেকে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র অর্থাৎ ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হয়েছে, তা তোমরা জান। ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপাল শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজগোপালাচারী ও জনাব খ্বাজা নাজিমুদ্দীনকে প্রজাদের প্রতিনিধিরাই নির্ব্বাচিত করেছেন। তবে ভারত ও পাকিস্তান এখনও বৃটিশ রাষ্ট্র-সংঘের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে, এঁদের নির্ব্বাচন এখনও ইংলণ্ডের রাজা অনুমোদন করেন। এ ছাড়া যে-সব দেশে এখনও বংশানুক্রমে রাজা হন, সেখানেও তাঁর ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ থাকে, প্রজার নির্ব্বাচিত প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভাই প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত শাসন-ক্ষমতা পরিচালন করেন। যেমন ধর—ইংলণ্ড, সেখানে ষষ্ঠ জর্জ্জ রাজা আছেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন প্রজাদের নির্ব্বাচিত প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি ও তাঁর মন্ত্রিসভা। ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপালেরা প্রজাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হলেও, তাঁদের শাসন-ক্ষমতাও খুবই সীমাবদ্ধ, প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা রয়েছে প্রধান মন্ত্রী ও তাঁদের মন্ত্রিসভার হাতে।

আজ থেকে বারো শ' বছর আগে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বংশানুক্রমে রাজা হতেন। সেদিনে রাজারা মনে করতেন, তাঁরা ঈশ্বরের দেওয়া অধিকারের বলে রাজা হয়ে জন্মেছেন।

প্রজারাও রাজাকে ঈশ্বরের অংশ বলেই মনে করত। প্রজাদের দিয়েই যে রাজার রাজ্য ও রাজত্ব, এ ধারণা সেদিনে রাজা-প্রজা কারোই ছিল না। প্রজারা তাদের মনোমত কোন লোককে রাজা নির্ব্বাচিত করে নেবে, এ রকম কল্পনাও তখনকার দিনের অধিকাংশ লোকই মনে স্থান দিতে পারত না।

বাঙালিরা কিন্তু সেই সুদূর অতীতে একবার তাদের রাজা নির্ব্বাচন করে প্রজাশক্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাংলার সে এক গৌরবের দিন। প্রজার বিধিদত্ত অধিকার-বলে বাঙালি সেই অতীত যুগে নিজেদের রাজা নিজেরাই নির্ব্বাচিত করে নিয়েছিল। প্রাচীনকালে নিপীড়িত প্রজাশক্তির এরূপ পূর্ণ বিকাশ—বাঙালির এই গৌরব-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে।

বারো শ' বছরেরও অধিককাল আগে একবার আমাদের এ বাংলাদেশের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়েছিল। সমস্ত দেশ জুড়ে ছিল কতকগুলি আত্মসর্ব্বস্ব জমিদার-শ্রেণীর রাজা। রাজ্য ছিল তাঁদের আজকালকার বড় বড় জমিদারের জমিদারির চেয়েও ছোট। ক্ষমতা ছিল না কারোই কিছু, অথচ সবাই ভাবতেন তাঁদের মত অত বড় জাঁদরেল রাজা ভূভারতে নেই। তাঁদের কাজ ছিল শুধু চাটুকার সভাসদদের মুখে নিজের গৌরব-গাথা শুনে গর্ব্বে ফুলে ওঠা এবং আশপাশের রাজাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ মারামারি করা। তাঁরা প্রজাদের শোষণ করে—তাদের নির্য্যাতন করে যে অর্থ পেতেন, তা নিজেদের ভিতর যুদ্ধ-বিগ্রহে ক্ষয় করতেন; প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে দৃক্‌পাতও করতেন না। বিদেশী শত্রু এলে যে দু'চারজন একত্র মিলে তাকে বাধা দিবেন, দেশকে আক্রমণকারীর কবল থেকে রক্ষা করবেন,—এমন বুদ্ধি কারো ছিল না।

দেশের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ পেয়ে কনৌজের রাজা যশোবর্ম্মা, গুর্জ্জরদের রাজা বৎসরাজ, কামরূপ বা আসামের রাজা হর্ষদেব প্রভৃতি শক্তিশালী বিদেশী রাজারা বারবার বাংলাদেশ আক্রমণ করে ছারখার করে দিয়েছিলেন। হর্ষদেব আসামী সৈন্যদল নিয়ে বাংলাদেশের পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিলেন। যশোবর্ম্মা অগণিত বাঙালিকে হত্যা করে বাংলার সম্পদ্ লুঠে নিয়েছিলেন কনৌজে। বৎসরাজ গুর্জ্জর সৈন্য নিয়ে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত গ্রাম ও নগর ধ্বংস করে বাংলার রাজচ্ছত্র লুঠে নিয়েছিলেন। রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা ধ্রুবধারাবর্ষও বাংলাদেশ আক্রমণ করে ছারখার করেছিলেন; কিন্তু শেষটায় বৎসরাজের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধে যায় এবং তিনি বৎসরাজকে ঠেঙিয়ে রাজপুতনার মরুভূমিতে তাড়িয়ে দেন। তাই সেবার এই দুই রাজার বিরোধে বাংলাদেশ বেঁচে যায়, নইলে তাঁদের তাণ্ডবে বাংলাদেশ জনশূন্য হয়ে যেত।

দেশের যখন এই রকম অবস্থা, তখনও বাংলার ভূস্বামীরা বিদেশীদের হাতে মার খেয়ে যাই একটু নিশ্বাস ফেলবার সুযোগ পেতেন, অমনি সুরু করে দিতেন ছোটদের উপর অত্যাচার আর নির্য্যাতন। যারা একটু শক্তিমান তারাই দুর্ব্বলদের মান ও প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলত। এর ফলে সারা দেশ জুড়ে

দস্যু-তস্করদের মরসুম সুরু হয়ে গেল। তারা রাস্তায়-ঘাটে গ্রামে-নগরে লোকদের মেরে ধরে সর্ব্বস্ব লুঠে নিয়ে বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেশকে শ্মশান করে ফেলল। দেশ যখন অরাজক হয়, তখন সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেই প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করে থাকে। তাই সেদিনের একজন কবি সন্ধ্যাকর নন্দী বাংলা-দেশের তখনকার অবস্থাকে 'মাৎস্য-ন্যায়' বলে বর্ণনা করেছেন। তোমরা কেউ কেউ হয়তো দেখেছ, বড় বড় রাঘব-বোয়াল গোছের মাছ কাটলে অনেক সময় সেগুলির পেট থেকে ছোট ছোট মাছ বেরোয়। বড় মাছ ছোট মাছদের পেলেই ধরে ধরে খায়। একেই বলে 'মাৎস্য-ন্যায়'। যে রাজ্যেই অরাজকতা উপস্থিত হয়, সেখানেই ধাড়ি মাছদের মত সবল লোকেরা দুর্ব্বলদের গ্রাস করে। তাই অরাজকতাকে বলে 'মাৎস্য-ন্যায়'। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে বাংলাদেশেও মর্ম্মান্তিক ভাবে 'মাৎস্য-ন্যায়' উপস্থিত হয়েছিল।

এই সময়ে উত্তর বঙ্গে দয়িতবিষ্ণু নামে একজন পরম পণ্ডিত বাস করতেন। তিনি সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বাংলার পণ্ডিত-সমাজে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

দয়িতবিষ্ণুর পুত্র বপ্যট কিন্তু মসী ছেড়ে অসি ধরেছিলেন। দেশ ছিল অরাজক, চোর-দস্যুর উপদ্রবে ধন-মান-প্রাণ কারো নিরাপদ ছিল না। তাই বপ্যট আত্মরক্ষা ও স্বজন-রক্ষার জন্য শাস্ত্রচর্চ্চা ছেড়ে অস্ত্রবিদ্যা শিখলেন এবং নিজের বীরত্বে সে অঞ্চলে খুবই প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। মাতৃভূমির শত্রুদের দমন করে তিনি নানা স্থানে জয়স্তম্ভ ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেছিলেন। এই ভাবে বপ্যট সে অঞ্চলে একজন শক্তিশালী ভূস্বামী হয়ে উঠেছিলেন।

বপ্যটের পুত্র গোপালদেব। ধীর স্থির বুদ্ধিমান ও অপরিমিত ক্ষমতাশালী ছিলেন এই গোপাল-দেব। বাংলার সেই ঘোর অরাজকতার দিনে তিনি বহু দস্যু-তস্করকে দমন করে তাঁর স্বদেশবাসীর ভীতি দূর করেছিলেন। যেখানেই তিনি প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলকে নিপীড়িত হতে দেখতেন, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং সবলকে দমন করে দুর্ব্বলকে রক্ষা করতেন। তাঁর বাহুবলে ও বুদ্ধি-কৌশলে সে অঞ্চলের দস্যু-তস্করেরা তাঁকে যমের মত ভয় করত; নিকটবর্ত্তী ভূস্বামীরা তাঁকে ঘাটিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনতে চাইতেন না। তিনি তাঁর অধিকৃত অঞ্চলে সম্পূর্ণরূপে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন। এজন্য সে অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে দেবতার মত দেখত।

বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস লেখক তিব্বতের লামা তারনাথ এই সময়কার বাংলার ইতিহাসের এক কাহিনী লিখেছেন। দেশের লোকেরা অরাজকতায় অস্থির হয়ে উঠেছে। বাঙালির সমস্ত শক্তি গেছে পঙ্গু হয়ে। অসহায়ের মত তারা চারদিকে খুঁজে ফিরছে এমন একজন লোককে যিনি তাদের এ দুর্দ্দিনে রক্ষা করতে পারেন। তখনকার দিনে যিনি ছিলেন সারা বাংলার রাজা, তিনি মারা গেছেন। তারনাথ সে রাজার নাম উল্লেখ করেন নি, কিন্তু তাঁর বিধবা রাণীর হিংস্রতার কথা লিখে গেছেন। সেই রাণী আর তাঁর মন্ত্রীরা নিজেদের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি নষ্ট হবে আশঙ্কা করে কোন রাজাকেই স্থায়িভাবে সিংহাসনে বসাতে চান নি। যিনিই রাজপদ দাবী করে রাজা হতেন, মন্ত্রীরা তাঁকেই রাজা

বলে গ্রহণ করতেন ; কিন্তু রাত্রিবেলা রাণী তাঁকে হত্যা করে ফেলতেন। এই ভাবে অনেকেই রাজা হলেন, অনেকেই প্রাণ হারালেন। শেষে বাংলার রাজা হওয়া একটা বিভীষিকার ব্যাপার হয়ে উঠল। কেউ আর বাংলার সিংহাসনে বসতে চাইত না। একমাত্র স্বাদ নামে একজন নায়ক রাণীকে বশ করে কয়েকদিনের জন্য রাজা থাকতে পেরেছিলেন বলে কথিত আছে।

এই বিভীষিকার রাজত্বে বাংলার অত্যাচার-জর্জ্জরিত অধিবাসীদের দৃষ্টি স্বভাবতঃই পড়ল গোপালদেবের উপর। তারা একবাক্যে গোপালদেবকে বাংলার রাজপদে নির্ব্বাচিত করল। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী নিরীহ পণ্ডিতের পৌত্র হলেন বাংলার রাজা। তিনি ঐ হিংস্র রাণী আর তাঁর ষড়যন্ত্রপরায়ণ মন্ত্রীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে আমরণ বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন।

বাঙালিরা যে উপযুক্ত ব্যক্তিকেই রাজপদে বরণ করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল অল্পদিনের মধ্যেই। গোপালদেব দৃঢ়হস্তে দেশের অরাজকতা দূর করলেন। তাঁর দৃঢ় শাসনে দস্যু-তস্করের উপদ্রব দূর হয়ে গেল। বাংলার অগণিত দুর্ব্বল ও কলহ-পরায়ণ ভূস্বামীরা এক রকম বিনা বাধায় গোপালদেবের অধীনতা স্বীকার করে অরাজকতা দমনে তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে দেশে শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপিত হ'ল,—দেশ আবার ফুলে-ফলে ধনে-ধান্যে হেসে উঠল। বাঙালিরা বহুকাল পরে আবার নিশ্চিন্ত চিত্তে বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হতে পারল।

যখন সমস্ত দেশের অরাজকতা দূর হয়ে গেল, দেশে পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হ'ল, তখন গোপালদেব তাঁর সমস্ত রণহস্তীকে জঙ্গলে ছেড়ে দিলেন। সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বঙ্গরাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি। তিনি তখন সমাজ-সংস্কার ও জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন, এবং বিখ্যাত ওদন্তপুর বিহার স্থাপন করেন।

গোপালদেব মহাবীর ও যুদ্ধ-কৌশলী ছিলেন, কিন্তু পররাজ্য জয়ের ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাঁর উপযুক্ত পুত্র ধর্ম্মপালদেব কিন্তু দিগ্বিজয় করে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন।

দয়িতবিষ্ণু বা বপ্যটের স্ত্রীদের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় না। গোপালদেবের মহিষীর নাম ছিল দেদ্দদেবী। বাংলার রাজা হওয়ার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ তাঁর বিবাহ হয়েছিল এবং হয়তো দেদ্দদেবী কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়ে ছিলেন। তাঁরই গর্ভে ধর্ম্মপালদেবের জন্ম হয়।

শোনা যায়, উত্তর বঙ্গের এক নগণ্য গ্রামে গোপালদেবের সমাধি এখনও বর্ত্তমান আছে। এখনও নাকি দরিদ্র কৃষক রমণীরা সেই সমাধিতে সন্ধ্যাকালে প্রদীপ দেখায়।

১৩৫৬

সঙ্গীতের জন্মকথা

এস. ওয়াজেদ আলি

প্রাচীন কালে গ্রীকেরা দেব-দেবীতে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে দেব-দেবীদের অনেক সুন্দর গল্প প্রচলিত ছিল। সেই সব গল্পের একটি আজ তোমাদের শোনাচ্ছি।

সঙ্গীত যে মানুষকে কত আনন্দ দেয় তোমরা তা জান। সঙ্গীত ছাড়া জীবন চলে না। সঙ্গীত এখন একটি প্রধান কারু-শিল্পে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক যুগে কিন্তু সঙ্গীতের এমন উন্নত অবস্থা ছিল না। গ্রীকরা সঙ্গীতের জন্য দুইটি প্রধান যন্ত্র ব্যবহার করতেন; একটি হচ্ছে ফ্লুট বা বাঁশী, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে হারপ বা তার-যন্ত্র।

তার-যন্ত্র আবিষ্কার করেন মারকারী নামক এক দেবতা। এই মারকারী ছিলেন দেবতাদের দূত—সব বিষয়ে একান্ত চতুর এবং দক্ষ। শিশুবয়সে একদিন তিনি সমুদ্রতীরে খেলা করছিলেন। এমন সময় দেখলেন একটা মরা কচ্ছপের গায়ের খোল বালির মধ্যে পড়ে আছে। তাঁর কাছে জন্তুর নাড়ির তৈরী কিছু তার ছিল। খেলাচ্ছলে সেই তার দিয়ে তিনি খোলটিকে মজবুত করে বাঁধলেন। তারপর তারের উপর তাঁর ছোট ছোট অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে লাগলেন। সেই তার থেকে মধুর মনোমুগ্ধকর শব্দ বের হতে লাগলো। মারকারীর আর আনন্দ দেখে কে! আপন মনে তিনি ছোট ছোট সঙ্গীত রচনা করতে লাগলেন আর যন্ত্রের সাহায্যে সে সব গাইতে লাগলেন। এই ভাবেই সঙ্গীত জন্ম লাভ করলো।

এপোলো ছিলেন এক উচ্চপদের দেবতা। দেবতাদের মধ্যেও তাঁর সৌন্দর্য্যের তুলনা

ছিল না। তিনি মারকারীর সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হলেন, এবং তাঁর হার্প যন্ত্রটিকে যথোচিত মূল্য দিয়ে তাঁর কাছ থেকে ক্রয় করলেন। সেটি তিনি নিজেই বাজাতে লাগলেন আর তার জন্য সুন্দর সুন্দর নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করতে লাগলেন। এপোলোর খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়লো। সঙ্গীতের দেবতারূপে সকলে তাঁর পূজা সুরু করে দিলে।

থেস দেশে এক যুবক ছিলেন তাঁর নাম অরফিয়াস। তিনি এপোলোর সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হলেন এবং এপোলোর তারের যন্ত্রের মত একটি যন্ত্র বানিয়ে গাইতে সুরু করলেন। অরফিয়াসের সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করতে লাগলো। গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত সকলেই সেই সঙ্গীতের তানে নাচতে লাগলো। পৃথিবীতে বসন্ত এসে দেখা দিল। সঙ্গীত-সুরে বাতাস পর্য্যন্ত কাঁপতে লাগলো।

ইউরিডিসি লুটিয়ে পড়লেন মৃত্যুর চিরনিদ্রায়

ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতিও অরফিয়াসের সঙ্গীত শুনে তাদের হিংসাবৃত্তি ভুলে গেল। অরফিয়াসের নিকটে বসে তারা তাঁর পদ লেহন করতো। সাপ কামড়াতে ভুলে যেতো, বিছা দংশন করতে ভুলে যেতো। সকলেই প্রেমে, আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠতো।

ইউরিডিসি ছিলেন অরফিয়াসের স্ত্রী। তাঁর মত সুন্দরী সে যুগে কেউ ছিল না, আর অরফিয়াস তাঁকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসতেন।

একদিন কর্ম্মোপলক্ষে অরফিয়াস স্ত্রীকে ছেড়ে অন্যত্র গেলেন। স্ত্রীর কোন বিপদ ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। আর যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ি ফিরে এলেন। এসে যা দেখলেন তাতে তাঁর সমস্ত অন্তর কেঁদে উঠলো। তাঁর অনুপস্থিতিতে ইউরিডিসি বাগানে ফুল সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন, তাঁর জন্য ফুলের একটি হার গাঁথবার উদ্দেশ্যে। বিষধর একটি সাপ ঘাসের মধ্যে লুকিয়েছিল। ইউরিডিসি কাছে আসতেই সে তাঁকে দংশন করলে। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে তিনি সেখানেই লুটিয়ে পড়লেন, মৃত্যুর চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়ে।

সমস্ত ব্যাপারটি যখন অরফিয়াস স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেন তাঁর শোকের তখন অবধি রইল না। তাঁর ক্রন্দনে আকাশ বাতাস মুখরিত হতে লাগলো। আর সেই ক্রন্দন অপূর্ব্ব সঙ্গীতের আকার ধারণ করলে। সে সঙ্গীত শুনে নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ সকলেই অরফিয়াসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ইউরিডিসিকে ফিরে পাবার জন্য অরফিয়াস হেডিস বা পাতাল রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্লুটো পাতাল রাজ্যের রাজা আর প্রসারপিনা তাঁর রাণী। জীবন্ত মানুষ তাঁদের দেখতে পায় না, তাঁদের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। সে দেশ কেবল প্রেতাত্মাদের জন্য।

অরফিয়াস মধুর করুণ সুরে গাইতে গাইতে আর হার্প বাজাতে বাজাতে পাতালের সীমানায় উপস্থিত হলেন।

সেই সীমানায় 'টারটেরাস' নদী প্রবাহিত। নদীর তীরের খেয়া-মাঝি মৃত লোকদের আত্মাকে তার নৌকায় করে পাতালে নিয়ে যায়। জীবন্ত মানুষ অরফিয়াসকে সে অপর পারে নিয়ে যেতে অস্বীকার করলে। মধুর, করুণ সঙ্গীতের সাহায্যে অরফিয়াস তাকে তার প্রাণের আবেদন জানালেন। খেয়া-মাঝির অন্তর গলে গেল। সে আবেদন সে আর অগ্রাহ্য করতে পারলে না—অরফিয়াসকে নদীর অপর পারে পৌঁছে দিলে।

অন্ধকার পাতাল রাজ্য অরফিয়াসের মধুর সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠলো। রাজা প্লুটো এবং রাণী প্রসারপিনা সে গানের সুরে অধীর হয়ে উঠলেন। অবিলম্বে অরফিয়াস তাঁদের সকাশে উপস্থিত হলেন আর করুণ গানের সুরে তাঁর প্রাণের সহধর্ম্মিণীকে ফিরে পাবার জন্য আবেদন করলেন।

রাজা বললেন, "এরূপ অদ্ভুত আবেদন পূর্ব্বে কেউ করে নি, আর করলেও তা গ্রাহ্য হতো না। তবে তোমার সঙ্গীত শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, আর তাই তোমার কাম্য বস্তু তোমাকে দান করছি। ইউরিডিসিকে তুমি তোমাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তবে সাবধান, টারটেরাস নদী অতিক্রম করবার পূর্ব্বে তার দিকে তুমি ফিরে চেয়ো না। তা যদি কর, তা হলে তাকে আবার হারাবে, তাকে তখন ফিরে পাবার উপায় আর তোমার থাকবে না।"

মহা আনন্দে অরফিয়াস ইউরিডিসিকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। অরফিরাস আগে আগে চলেছেন আর ইউরিডিসি তাঁর অনুসরণ করছেন। অবিলম্বে তাঁরা টারটেরাস

নদীর উপকূলে এসে উপস্থিত হলেন। অরফিয়াস খেয়া নৌকায় পা দিলেন। হৃদয় তাঁর আনন্দে অধীর। রাজা প্লুটোর নিষেধাজ্ঞার কথা তিনি ভুলে গেলেন। তাঁর হৃদয়ের ধনকে দেখবার জন্য, একটি বার দেখবার জন্য, পিছন ফিরে তিনি চাইলেন। ইউরিডিসির ছায়ামূর্তিটা মাত্র তিনি

দেখতে পেলেন। তাঁর পেছনের দিকে চাওয়া মাত্র ইউরিডিসি আবার প্রেতলোকের ছায়ায় পরিণত হয়েছিলেন। করুণ সুরে অরফিয়াস কেঁদে উঠলেন, আর তাঁকেও প্রেতলোকে পাঠিয়ে দেবার জন্য খেয়া-মাঝিকে অনুনয়-বিনয় করলেন। খেয়া-মাঝি বললে, "আর তুমি ইউরিডিসিকে ফিরে পাবে না। এখন পৃথিবীতে ফিরে চল।"

"ইউরিডিসি কোথায় গেলে? ইউরিডিসি কোথায় গেলে?" রবে করুণ সুরে অরফিয়াস কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সে ক্রন্দন আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে লাগলো। সমুদ্রে সমুদ্রে সে ক্রন্দন শোনা যেতে লাগলো, নদীর ঢেউ সেই সুরেই ধ্বনিত হতে লাগলো। সে সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পাখীরা গাইতে লাগলো। পৃথিবীময় একই করুণ বিলাপ শোনা যেতে লাগলো—"ইউরিডিসি কোথায় গেলে? ইউরিডিসি কোথায় গেলে?"

১৩৫৩

ভাই আর বোন

শ্রীরাধারাণী দেবী

বুবুন! বুবুন! ছোট্ট মেয়ে!
দৌড়ে এলুম গন্ধ পেয়ে।
কিসের গন্ধ? কোথায় দৌড়?
দুধের গন্ধ। ছুটছি গৌড়।
গৌড় কোথায়? সেথায় কী?
সেথায় আছে মাখন ঘী।

বুবুন্! বুবুন্! ছোট্টো মেয়ে!
দৌড়ে এলুম শব্দ পেয়ে।
কিসের শব্দ? কোথায় গোল?
মোহনবাগান দিচ্ছে গোল্।
দিচ্ছে গোল্? কোথায় বল্?
ছুটছে বল্ দেখবি চল্।

ছোট্টো অভীক ঘোষ
বেজায় তাহার রোষ
রাগলে পরে রক্ষে নেইকো আর!
বয়স তো তুই মোটে,
তার দাপটের চোটে
'মদেব' চাকর চম্‌কায় বারবার।

অশোক তাহার দাদা
নাকটি ঈষৎ খাঁদা
বেজায় ভীতু একান্ত 'গুড্ বয়্'
যখন তখন তাকে
অভীক জব্দ রাখে
'এইয়ো' বলে ধমকে কথা কয়।

অস্তপারের দেশে

অস্তপারের দেশে মাগো,—অস্তপারের দেশে,
সূর্য্য সেথা ডুব দেয় গো, ভুবন-ভ্রমণ শেষে ;
ছেড়ে দে মা সেথায় আমি যা'ব,
সেথা গেলে অনেক সাথী পাব ;
তোমার কোলে ফির্‌ব খেলা-শেষে,
তা'দের দেশে উঠ্‌লে তারা হেসে।
বড়ই মজা হবে, মাগো,—বড়ই মজা হ'বে ;
ঘুমা'তে মোর একটু খানি সময় নাহি র'বে।
হেথা যখন সন্ধ্যাদীপ জ্বালো,
তা'রা উঠে দেখে ভোরের আলো।
সে দেশেতে সন্ধ্যা যখন হ'বে,
এখানেতে সকাল তখন সবে !
এম্‌নি ক'রে খেলার মাঝে হারিয়ে আমি যা'ব ;
তোমার সাথে কইতে কথা অবসর না পা'ব।
কেন তুমি হাস্‌ছ এত, মা,
আমি বুঝি ছোট্ট খোকা, না ?
সত্যি দেখো আজ্‌কে রাতের শেষে,
ফুট্‌ব আমি অস্তপারের দেশে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রাপুর ঘুঘ্নিদানা

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

নামটি পুরোনো হলেও খাবারটি একদম নতুন। আর খেলে কি হয় তাও বলি শোন।

রোজ বিকেল হলে পাড়ার গলির মোড় থেকে হাঁক শোনা যায়, "চাই ঘুঘ্নি—ই—ই। আলু-নারকোলের গরম ঘুঘ্নি—ই—ই—"

তাই শুনে পাড়ার ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে।

অমনি দেখা যায়, কাঁধে ময়লা কাপড়ের ঝোলা, গায়ে হাতকাটা ময়লা শার্ট, খালি পা একটি লোক একপাশে একটু হেলে, একটু খুঁড়িয়ে গলি দিয়ে আসছে। লোকটির বাড়ি কোথায় তা তারা জানে না, কিন্তু দেখে সে রোজ এমনি সময় আসে। সে তাদের প্রায় সবারই নাম জানে। তাদের দেখে হাসে।

তার ঝোলায় থাকে একটা বড় অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে ঘুঘ্নি—গরম, ঝাল ঝাল। সে একখানি টিনের বড় চামচে করে তাই তুলে ছোট ছোট শালপাতায়

করে সবাইকে দেয়। অবশ্য পয়সা নিয়ে, বিনা পয়সায় নয়, তা সে যতই হাসুক আর আদর করে, "কি খুকী ?" বলুক।

সেদিনও দূর থেকে তার হাঁক শুনে মিনু, কৃষ্ণা, নান্টু, রবি, মঞ্জু ছুটে এসে তাকে ঘিরে ধরলে। রানু আর তার ছোটভাই কানুও এল ছুটে।

সবাই কিনছে। সবাই বলছে, "আমায় আগে দাও।"

রানু বললে, "দাঁড়া কানু, আমি পয়সা নিয়ে আসছি" বলে সে বাড়ির দিকে ছুটলো।

ছুটতে ছুটতে তার মনে পড়লো দাদার সেদিনকার ধমক্ "খবরদার, বাজারের ঘুঘ্নি খেও না। যত সব পচা জিনিস দিয়ে নোংরা বাসন-পত্তরে তৈরী। ও আবার লোকে খায়! আবার যদি কখন দেখি—"

তবে দাদা এখন নেই।

কিন্তু মায়ের কাছে পয়সা পাবার সামান্য একটু গোল ছিল। দুপুরের ছোট একটু ঘটনা, তেমন কিছু নয়, সে তো ভুলেই গিয়েছিল। তেমন ব্যাপার কারো মনেই থাকে না।

দুপুরে মা যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তারা দু ভাইবোনে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে আচারের জার থেকে একটুখানি খু—ব একটু—জলপাইয়ের আচার নিয়ে খেয়েছিল। কানুই খেয়েছিল প্রায় সবটা, সে কেবল আঙুলে যেটুকু লেগেছিল সেটুকু চেটেছিল। কানু বড্ড কাঁদছিল, কিছুতেই থামছিল না। তাই তাকে ভোলাবার জন্যে সে আচারটুকু নিয়েছিল। তাছাড়া মা তো তাদের দুজনকে একদিন একটু দেবেন বলেছিলেন। একে চুরিও বলে না, খাওয়া তো নয়ই। তবুও মা তার কথা শুনতে চান না, বলেন, "কেন তুই আচারে হাত দিয়েছিলি ?"

কি মুস্কিল!

তাই মা হাঁকিয়ে দিলেন। সে ছুটলো কাকীমার কাছে।

কিন্তু সেখানেও একটু বাধা ছিল।

কাকীমা সেদিন তাঁর খুকুকে নাইয়ে, কাজল পরিয়ে, পাউডার মাখিয়ে ঘুম পাড়াতে যখন ঘরে ঢুকেছিলেন, তখন তাঁর ফুলকাটা পাউডারের কৌটোটা বারান্দাতেই পড়েছিল। পাউডারটার কি সুন্দর গন্ধ! যেন গোলাপ ফুল।

রানুও তার বড় ডলিপুতুলটাকে এনে পা ছড়িয়ে বসে কৌটো থেকে একটু-খানি—মোটে এক চিম্‌টি—পাউডার নিয়ে মাখিয়েছিল। চোখ দুটো খারাপ হয়ে যাবে বলে চোখে কাজল পরায় নি। তবুও কাকীমা বলেন, "রানু কৌটোটা একেবারে খালি করে ফেলেছে।"

কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। কেউ তার কথা বোঝে না। কি যে করবে সে!

তাই কাকীমাও দিলেন ধমক।

সে যখন খালি হাতে ফিরে গেল, তখন দেখলে ঘুগ্‌নিওলা চলে যাচ্ছে। আর

মিনু, কৃষ্ণা, রবি, মঞ্জু, নান্‌টু শালপাতা থেকে জিভ দিয়ে ঘুগ্‌নি তুলে খাচ্ছে আর হাসছে। কি হাসি! দেখে গা জ্বলে যায়।

আহা! আবার দেখিয়ে দেখিয়ে খাওয়া হচ্ছে।

সে বললে, "যত সব পচা জিনিস দিয়ে তৈরী!"

মঞ্জু জিভ দিয়ে একটু ঘুঘ্‌নি মুখে তুলে চিবতে চিবতে বললে, "আঙুর ফল বড় টক। একদা এক শৃগাল"—

গল্পটি রান্নুও জানে।

সে আর দাঁড়ালো না; কানুর হাত ধরে টানতে টানতে বললে, "চল্‌ কানু, আমরা ঘুঘ্‌নি তৈরি করি গে। ভারী তো শক্ত!"

যারা ঘুঘ্‌নি খায়, তারাই জানে জিনিসটি কি দিয়ে তৈরী হয়। তবে রান্নুর ঘুঘ্‌নিদানা একেবারে আলাদা জিনিস।

সন্ধ্যাবেলা—

দু' ভাই-বোনে বমি করতে লাগলো। সেই সঙ্গে পেটের ব্যথা। দুটোই থামে না।

মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন; বললেন, "কেন এমন হ'ল? কি খেয়েছিস্‌ তোরা?"

কানু বললে, "ঘুঘ্‌নি।"

দাদা হাঁক দিয়ে উঠলো, "আবার ঘুঘ্‌নি— ?"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "পয়সা কোথায় পেলি ?"

কানু বললে, "দিদি তৈরি করেছিল।"

মা বললেন, "তৈরি করেছিল ?"

কাকীমা বললেন, "ওমা! আমরা দেখতে পেলাম না তো! কোথায় তৈরি করলে ?"

কানু বললে, "ছাদে।"

মা জিজ্ঞেস করলেন, "কি দিয়ে তৈরি করেছিলি ?"

রানু বললে, "ধোঁকার জন্যে ডাল ভিজিয়েছিল তাই দিয়ে—মুলো আর কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে—নারকোল তেল আর নুণ মেখে—"

শুনে মা ও কাকীমা হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝতেই পারলেন না। দাদা কিন্তু হো-হো করে হেসে উঠলো।

একটু পরেই এলেন ডাক্তার। রোগী দুটিকে দিলেন ওষুধ আর দিলেন উপদেশ। "নিজের তৈরী ঘুঘ্‌নিও আর কখন খেও না।" বলে মুচকি হেসে যন্ত্রের ব্যাগটা হাতে তুলে, স্টেথস্‌কোপটা গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

দু'ভাই-বোনের ভাগ্যে সে রাতে জুটলো উপোস আর জল।

তবুও দাদার হাসি আর থামে না।

ছাদ থেকে ভাঁড়টা নিয়ে এসে দু ভাইবোনের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে সেটা দেখে আর হাসে। ভাঁড়টি দইয়ের। তার মধ্যে রানুর ঘুঘ্‌নি তখনও একটু ছিল।

রানু বালিশে মুখ লুকিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রইলো। হাসি যে তারও পাচ্ছিল না, তা নয়।

পরদিনও ব্যাপারটা মিটলো না। বন্ধুরাও যে শোনে সেই হাসে। তারা আবার তাকে দেখেই বলতে লাগলো, "ঘুঘ্‌নিওয়ালী!"

রানু তাই সারাদিনের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরুলোই না। পুতুল আর খেলনা নিয়ে ঘরের কোণটিতে কাটিয়ে দিলে।

বাবুরামের বরুয়া

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবুরাম জমাদার।

বাবুরাম জমাদারকে যদি কেউ চোখে দেখতে চাও তবে হাওড়াতে ট্রেনে চড়ে চলে যাও, বেশী দূর না, শান্তিনিকেতন পার হয়েই যে জংসনটা পাবে, সেই জংসনে নেমে ব্রাঞ্চ লাইনে চাপতে হবে—ব্রাঞ্চ লাইনে বারো-তেরো মাইল। ছোট গাড়ী। বারো মাইলেই চারটে ষ্টেশন পার হতে হয়। পঞ্চম ষ্টেশনে নেমো। তবে যদি জংসন ষ্টেশনটাতেই কি অন্য যে কোন ষ্টেশনে কলিকালের ভীম বা মহাদেব কি এমনি ধরণের চেহারার কোন মানুষকে দেখতে পাও, এই বুকের ছাতি—মাথায় বাবরী চুল—টিকলো নাক, ইয়া টাঙ্গির মত গোঁফ—বড় বড় চোখ, তেমনি দুখানা শক্ত সবল হাত,তবে তার কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করো। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। হয় তো বা মানুষটার চেহারা চোখে পড়বার আগেই তার গলার আওয়াজই তোমাকে চমকে দেবে। অথবা তার হা-হা-হা-হা হাসি।

আমি তার গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠে চারিদিক চেয়ে দেখতে চেয়েছিলাম—এমন গলার আওয়াজ যার, সে মানুষটা কে? কেমন? চোখ ফিরিয়ে খুঁজতে হ'ল না—প্লাটফর্মের অনেক লোকের আওয়াজ ছাপিয়ে যেমন তার গলাটাই কানে এসে পৌচেছিল বিশেষভাবে ঠিক তেমনি ভাবেই অনেক লোকের ভিতরেও তার চেহারাটাই আগে চোখে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল আজকালকার

ক্যানেডিয়ান ইঞ্জিন প্রথম দেখার কথা। দেখেছিলাম আসানসোলে প্রথম। ওভারব্রিজের উপর দাঁড়িয়েছিলাম, ট্রেনের দেরী ছিল, নিচে নামিনি প্লাটফর্মে যাত্রীর ভিড় আর ফেরিওয়ালাদের ঠেলা-গাড়ীর ধাক্কার ভয়ে। হঠাৎ কোথেকে সাত সুরে মেশানো ভরাট ভোঁ-ওঁ-ওঁ আওয়াজ। জাহাজের ভোঁএর সঙ্গে মিল আছে—তবু অন্য রকম। যেমন জোরালো ভরাট তেমনি সুরেলা। বাঁয়া তবলার আসরে হঠাৎ যেন পাখোয়াজে কোন জবরদস্ত ওস্তাদ আওয়াজ তুলে দিলে। ইয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে হ'ল না—চোখে পড়ল মাথা থ্যাবলা বিরাট লম্বা ইঞ্জিনখানা। মনে হ'ল কলেজী কুস্তীর আসরে গামা কি গোলাম কি কিঙ্কর সিং এসে দাঁড়িয়েছে। বাবুরাম কুস্তী করে পালোয়ান হবার চেষ্টা করলে গামা গোলাম না হোক—কাছাকাছি কিছু হ'ত। তাই বলছি, বাবুরামকে খুঁজে বের করতে হয় না—বাবুরাম আপনি চোখে পড়ে। অন্তত আমার চোখে আপনিই পড়েছিল এবং আমার বিশ্বাস সকলেরই চোখে পড়বে। যাকে বলে শালপ্রাংশু মহাভুজ এবং বিশাল বক্ষ। কাঁধে একখানা পাট করা রঙীন গামছা। কোলে একটি বছর খানেকের দামাল ছেলে। তার গায়ে দামী রঙীন সিল্কের ফ্রক—পায়ে বাটার সাদা হাফ মোজা—লাল টুকটুকে জুতো। মুখে পাউডার, চোখে কাজল, কপালে টিপ। ছেলেটিকে দু হাতে উপরে আকাশের দিকে তুলে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে হা-হা-হা-হা শব্দে অট্টহাসি হাসছে।

ছেলেটা দু' হাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

—লে-লে পেড়ে লে। লে পেড়ে। ডাক-ডাক।

ছেলেটা ছোট্ট হাত দুটির ইসারা দিয়ে আধ-আধ ভাষায় বলে উঠল—আ-আ-আ।

এবার বুঝলাম। বেলা তখন অপরাহ্ন। তিথিতে শুক্লপক্ষ। পূর্ণিমার কাছাকাছি। পূর্বদিকে আকাশে চাঁদ তখন দেখা দিয়েছে। ছেলেটা সেই চাঁদকে ডাকছে। বাবুরাম তার সাধ্যমত উঁচুতে মাথার উপর তুলে তাকে চাঁদ ধরতে বলছে। —লে পেড়ে। লে।

ষ্টেশনটা আমাদের গ্রামের ষ্টেশন। ট্রেন আসছে, প্লাটফর্মে যাত্রীরা এখানে ওখানে ছড়িয়ে বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিশালদেহ বাবুরাম ওই ছেলেটিকে নিয়ে নিবিড় আনন্দে মগ্ন হয়ে রয়েছে, কারুর বা কোন দিকে দৃকপাত নেই তার। ছোট ষ্টেশন, ছোট লাইন—যাত্রীর সংখ্যাও কম, তিরিশ-চল্লিশ জনের মত। কিন্তু তিরিশ-চল্লিশ জনের মধ্যেই সে স্বতন্ত্র—সে বিশিষ্ট—সে অদ্ভুত। আমি অবাক হয়েই তার দিকে তাকিয়েছিলাম। ভাবছিলাম—এ কে?

লোকটি বিদেশী তাতে সন্দেহ রইল না। আমার দেশের লোকদের আমি চিনি। তাদের কথা বুঝি, তাদের কথার সুর আমার জানা। লোকটির উচ্চারণে কথার সুরে বিদেশী টান। মনে হ'ল কারুর বাড়ীর চাকর হবে। তাদের ছেলেকে কোলে নিয়ে বেড়াতে এসেছে। ছেলেটির পোষাকে প্রসাধনের পারিপাট্যে সিল্ক পাউডার মোজা জুতো দেখেই মনে হ'ল কথাটা।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। ছেলেটি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। লোকটা ছেলেটাকে হঠাৎ সজোরে ছুড়ে দিলে শূন্যে—লেঃ—যা পেড়ে লিয়ে আ—য়। তারপরই হাতে তালি দিয়ে অট্টহাসি হেসে উঠল হা-হা-হা-হা, এবং মুহূর্তে দুই হাত প্রসারিত করে পতনশীল ছেলেটিকে লুফে নিলে। ছেলেটি ডুকরে কেঁদে উঠল।

ছেলেটির পিঠে গোটা দুই আদরের চড় মেরে চুমু খেয়ে বুকে চেপে ধ'রে বললে—দূর—দূর—দূর—ডর-পোক্‌না! দূর ভীতু কোথাকার। দূর—দূর দূর!

ঠিক এই মুহূর্তেই ষ্টেশনের বাইরে থেকে প্রায় ছুটে এসে ঢুকল একটি মেয়ে। পরনে একখানা লাল সিল্কের শাড়ী; পাতলা লম্বা ধরণের কালো একটি মেয়ে; কপালে হাল ফ্যাসানের বড় একটা প্ল্যাষ্টিকের টিপ—মুখে একমুখ পান—একদিকের গালে পোরা রয়েছে, হাতে হাতভর্তি কাচের চুড়ি; চুল বাঁধার ঢং দেখে মেয়েটিকে সৌখীন বলে মনে হয়, কাঁধে একখানা ধবধবে দামী টার্কিশ তোয়ালে, হাতে একটা কাচের ফিডিং বটল। সে এসেই ওই বিশালদেহ লোকটির সামনে থমকে দাঁড়াল। আমি তার পিছন দিকটা দেখতে পাচ্ছিলাম; চোখের দৃষ্টি দেখিনি; কিন্তু বিশালদেহ মানুষটিকে এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যেতে এবং তার মুখ শুকিয়ে যেতে দেখে সন্দেহ রইল না যে, মেয়েটির চোখে কঠোর দৃষ্টি ফুটে উঠেছে এবং সে এমনই কঠোরতা যে এত বড় মানুষটা তার সামনে এক মুহূর্তে এতটুকু হয়ে গেছে!

মেয়েটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল—ফের! ফের কাঁদাচ্ছিস! দেখবি!

লোকটি হাসবার চেষ্টা করলে—হে—হে—হে—হে!

হা—হা—হা—হা নয়।

প্রাণহীন হাসি—অপ্রতিভ হয়েছে—ভয় পেয়ে ছ লোকটা।

মেয়েটি এবার চিলের মত ছোঁ দিয়ে ছেলেটিকে ছিনিয়ে নিলে।—দে, দে, আমার ছেলে দে! দে!

সযত্নে ওই ধবধবে তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে ছেলেটিকে বুকে তুলে নিলে সে এবং চলে গেল বেরিয়ে। লোকটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে।

ষ্টেশনের জমাদার ঢন ন নো ন নো শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল এই মুহূর্তে। ট্রেন আসছে।

মেয়েটি চলে গিয়েছিল—সে সিগারেট টানতে টানতে আবার ফিরে এল।

আধখাওয়া সিগারেটটা লোকটির হাতে দিয়ে বললে—লে খা।

সিগারেটটি নিয়ে তাতে একটা টান দিয়ে তোষামোদ ক'রে হেসে লোকটি বললে—দে, ওকে দে! পায়ে পড়ি তোর। আর এমন করব না। তুর কিরা!

—তু কোন্‌ দিন মেরে ফেলাবি ওকে! এমন ক'রে ছুড়ে দেয়? যদি পড়ে যায় আছাড় খেয়ে। হাত যদি ফস্কে যায়?

এবার—হা—হা—হা—হা শব্দে অট্টহাসি হেসে উঠল লোকটা।

—তাই যায়! আমার হাত ফস্কে?—হা—হা—হা—হা!

ট্রেন এল। তারা ট্রেনে চেপে চলে গেল।

* * *

সেদিন নাম জানা হয়নি।

পরদিন জানলাম—ওর নাম বাবুরাম।

পরদিন ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। বাড়ী ফিরে বাইরের বাড়ীতে দেখলাম ওই মেয়েটি বসে রয়েছে বাগানে একটা গাছতলায়। কোলে ওই ছেলেটি। আজ গায়ে আর একটা জামা। বুঝতে পারলাম রঙ দেখে। কাল জামাটা ছিল রঙীন, আজ জামাটা সাদা; ধোয়া ইস্ত্রী করা জামা, ধবধব করছে, চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। ছেলেটিকে নিজের দুই হাতের দুই আঙুল ধরিয়ে হাঁটাচ্ছে—হাঁটি হাঁটি পা—পা!

আমি বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে কৌতূহলের শেষ ছিল না। কিন্তু কি ভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করব ঠাওর করতে পারছিলাম না। কারা এরা? এখানে কোথায় এসেছে?

এই মুহূর্তেই সেই ভারী গলার আওয়াজ পেলাম।

—জলদি জলদি তুর কাম তু সেরে লে! আমার কাম হয়ে গেল!

এ গলার আওয়াজ ভুল হবার নয়। ওই মেয়েটি এখানে না থাকলেও আমার ভুল হ'ত না। হয় তো একটু বিলম্ব হ'ত। মেয়েটিকে এখানে দেখে তাও হ'ল না।

কথা বলতে বলতেই সে আমাদের বাড়ীর পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এল। মাথায় বিষ্ঠার পাত্র নিয়ে সে এসে দাঁড়াল। লোকটি মেথর!

বুকে হাত দিয়েই সে বললে—আমার নাম বাবুরাম জমাদার। ছোট লাইনের জমাদার মেথর আমি বাবু! তোমরা তো শুধু বাবু গো, আমি বাবু—রা—ম। কি বলগো সুখীয়া! বলেই সে অট্টহাসি হেসে উঠল।

সুখীয়া অর্থাৎ সে মেয়েটি বলে উঠল—মর মুখপোড়া—বাবু—রা—ম! বাবুরাম মেথর। না—বাবু রা—ম। কার কাছে কি বলে তার ঠিক নাই।

সে কথা গ্রাহ্যই করল না বাবুরাম। বললে—উঠো আমার জমাদারনী—সুখীয়া। পরম সুখীয়া বাবু! আমার জিন্দগীর ওহি তো একঠো সুখ আছে! হাঁ। তবে আমাকে বড় বকে বাবু; মারে ভি!

—মারবে না? বকবে না? আমি তুকে না মারলে—না বকলে তু কোন্ রোজ দারু পিয়ে খুন হয়ে থাকতিস। পড়তিস কোথা থেকে—গর্দ্দানা ভাঙতিস। নয় তো কলিজা ফেটে হয়ে যেতিস খতম।

হা-হা শব্দে হেসে উঠল বাবুরাম।

—হাঁ-হাঁ, তা যেতাম। উ ঠিক বাত। তা আজ তো খুব করে মদ খাব। বাবুর কাছে বকশিশ লিব। হাঁ। আজ তু কিচ্ছু বলবি না। হাঁ। কত বড়ো বাবু। কত নাম।

বাবুরাম আমার নাম জানে, খ্যাতির কথা জানে। এই ছোট লাইনে কাজ করে এবং লাইনের ষ্টেশনের গ্রামগুলিতেও ভদ্রলোকের বাড়ীতে কাজ করে। সেই সূত্রেই আমাদের বাড়ীর কাজ নিয়েছে এবং আমার কথা জেনেছে।

বাবুরাম অভিযোগ করে বললে—নামই শুনি তোমার বাবু, চোখে দেখি না। তুমি শহরে থাক। দেশে এস না। কাল তোমার ভাইবাবু বললে—বাবুরাম, দাদা আসছে—সব সাফা ক'রে দে। তা দিলাম সাফা ক'রে। দাও বকশিশ। তিনটে টাকা তো দাও। দু টাকার একটা বোতল। আর এক টাকাতে ভাল গন্ধ কিনব বাবু! আতর। আতর।

বলে সে কোঁচড় থেকে একটা শিশি বের করে একটু আতর তার গোঁফে বুলিয়ে নিলে।

আমার ভারী বিচিত্র মনে হচ্ছিল লোকটিকে। এমন সরল সবল মানুষ সহজে চোখে পড়ে না। ওর আতর মাখা দেখে আমি আদৌ বিস্মিত হইনি। যাদের ছেলের পোষাক-প্রসাধন এমন সুন্দর, তারা আতর মাখবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে! কাল প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল ছেলেটি এদের নয়। মনে হয়েছিল—কোন বাড়ীর ঝি চাকর ওরা। আজ আর সন্দেহ নেই। আমি পাঁচটাকার একখানা নোট বের ক'রে দিয়ে বললাম—এ তোমাকে মদ খেতে দেব না। তোমাদের ছেলের জন্যে দিচ্ছি। ওকে কিছু কিনে দিয়ো।

হাতটা সঙ্গে সঙ্গে সে পিছিয়ে নিলে।—না—তা পারব না।

মেয়েটিও ঘাড় নাড়লে—না—না—না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

বললে—তাই পারি বাবু? বকশিশ তো একরকম ভিক্ষে গো। আমরা ছোট কাজ করি—বকশিশ নি। ও ছেলেটা তো ছোটলোকের ছেলে নয়। ছেলেটা যে আমাদের নয় গো!

বিস্ময়ের অবধি রইল না। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমাদের ছেলে নয়?

—না। আনন্দ-উজ্জ্বল মুখখানা এক মুহূর্ত্তে উদাস হয়ে গেল। যেন উদয়লগ্নের পূর্ব্বাকাশ এক মুহূর্ত্তে অস্তলগ্নের পশ্চিমাকাশের রক্তরাগে রূপান্তরিত হয়ে বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল।

—কার ছেলে? জিজ্ঞাসা করলাম।

—নতুন গাঁয়ের সদ্‌গোপেদের ছেলে গো! বাবা মা মরে গেল কলেরায়—ছ মাসের ছেলেটা
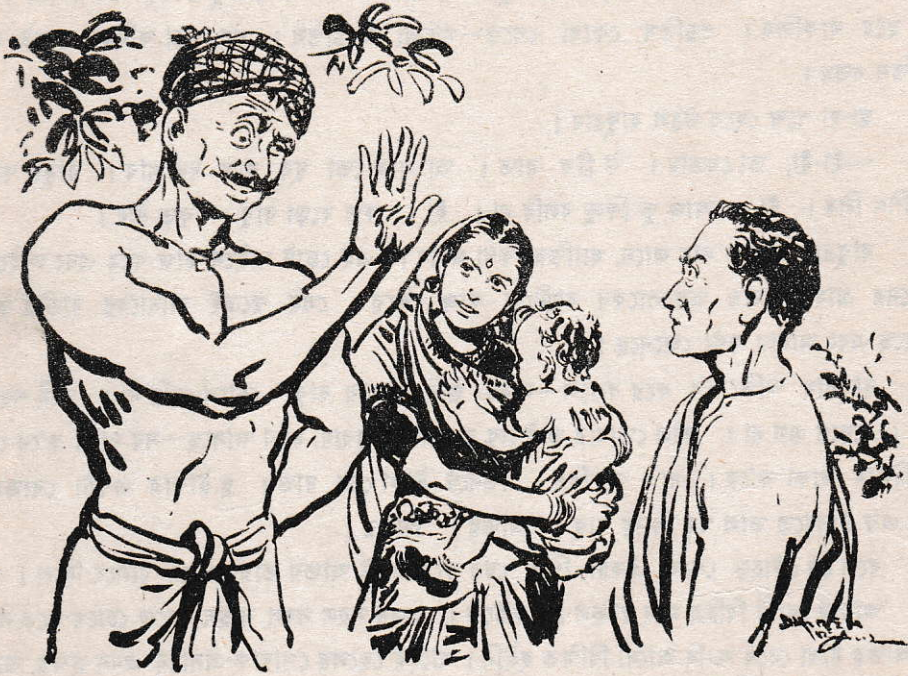
খুড়োখুড়ীর ঘাড়ে পড়েছিল। ট্যাঁ—ট্যাঁ করে কাঁদছিল। খবর পেলাম—পেয়ে গেলাম। নিয়ে এলাম চেয়ে। বললাম, মানুষ ক'রে দি। তাই মানুষ করছি। বড় হবে—তখুন দিয়ে দিব ফিরে। ওকে কি বকশিশ কি ভিক্ষের টাকায় খাওয়াতে পারি? না ঐ টাকায় জামাকাপড় দিতে পারি?

মেয়েটা ঘাড় নাড়লে—না—না—না!

বাবুরাম বললে—এটাকে নিয়ে পাঁচটা বাচ্চা মানুষ করলাম বাবু! হাঁ। পাঁচটা। একটা হাতের আঙ্গুলগুলি মেলে ধরলে।

মেয়েটা বললে মেহনতের পয়সা ছাড়া বাড়তি রোজগারের এক পয়সার কিছু কাউকে খাওয়াইনি পরাইনি বাবু !

বাবুরাম বললে—সব বাচ্চা কটাকে এই তাগড়া ক'রে মানুষ করেছি বাবু ! এইসা তাগড়া ! হাঁ। ভদ্দর আদমীদের বাচ্চার চেয়ে ভাল খাইয়েছি পরিয়েছি। সুখীয়া খুব ভাল কাম জানে বাবু ! হাসপাতালমে ছিল কিনা ! ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে এ কাম খুব ভাল করে শিখেছে।

প্রশ্ন করলাম—কিন্তু এতে তোমাদের কষ্ট হয় না ?

প্রশ্নটা ওরা বুঝতে পারলে না। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি সে ?

—এই ভাবে মানুষ ক'রে ফিরে দিতে ?

হা—হা ক'রে হেসে উঠল বাবুরাম।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মেয়েটা ঘাড় নাড়লে। কি বলতে চাইলে বুঝতে পারলাম না।

পাঁচটা টাকাই সেদিন আমি ওকে দিয়ে দিলাম, বললাম—বেশ, তোমাদেরই দিলাম—নাও।

* * *

সেদিন সন্ধ্যার সময় বসে বই পড়ছিলাম ! আমাদের গ্রামে গেলে আমি প্রায় একঘরে হয়ে থাকি। আত্মীয়স্বজন—ভদ্র বন্ধুজনে বড় একটা কাছ ঘেষে না। তারা যে সব গ্রাম্য-জীবনের ঝগড়াঝাঁটির কথা বলে—অন্যের সমালোচনা করে, তা আমিও পছন্দ করতে পারি না—আমার সাহিত্যের কথাও তেমনি তাদের খুব ভাল লাগে না। সেখানে একমাত্র সঙ্গী বই।

গ্রামের পথে সন্ধ্যার পর লোকের ভিড় কম। সন্ধ্যার মুখে শুধু কলরব ক'রে খেলা শেষ ক'রে ফেরে ছেলের দল। তারা পার হয়ে গেলেই সব স্তব্ধ ; পথখানা যেন ঘুমিয়ে পড়ে। কচিৎ এক-আধ জন লোক চলে, কখনও চলে কুকুর বা গরু, বড় বড় তালগাছের মাথা থেকে আকাশপথে উড়ে যায় পেঁচা, দু'-চারটে বাদুড়। আশপাশের বাড়ী থেকে ভেসে আসে কোন উৎসাহী পড়ুয়ার কণ্ঠস্বর অনেকটা দূরে বাউড়ী পাড়ায় ঢোলক-কাঁসী বাজিয়ে ভাসান গান বা ভাঁজোগান হয়—এই পর্য্যন্ত বাজার পাড়ায় অনেক গোলমাল অবশ্য। অনেক বাঁশী, অনেক কাঁসী, অনেক আয়োজন ; হারমোনিয়া মন্দিরা নিয়ে গানের আড্ডা, থিয়েটারের রিহারশ্যাল, দোকানের বেচাকেনা হিসেব-নিকেশ বৈষয়িক সমারোহ আছে। কিন্তু আমাদের পাড়াটি, বিশেষ করে আমি গেলে আমার বাড়ীটি একেবারে নিঃশব্দ হয়ে পড়ে আমার জন্য। আমি বইয়ের মধ্যে প্রায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ আমার বাড়ীর সামনে পথখানিকে সচকিত ক'রে ভরাট মোটা গলায় গান গেয়ে উঠল কেউ। কেউ কেন - অনেকটা দূরে গায়ক তখনও থাকলেও সে কেউ যে বাবুরাম তাতে সন্দেহ রইল না। কাছে এল কণ্ঠস্বর এবার বুঝলাম—কণ্ঠস্বরে জড়িমা রয়েছে ; মদ খেয়েছে বাবুরাম। ঘাড় ফিরিয়ে পথের দিকে চাইলাম। অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট দেখা না গেলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম—সে টলতে টলতে আসছে।

—বাবু মশায়! পেনাম! হাত জোড় করে দাঁড়াল বাবুরাম। তারপরই বললে—এত জোর আলোটা জেরাসে কমিয়ে দাও হুজুর!

বলেই সে পথ থেকে উঠে এসে বসল দাওয়ায়।

— দু' বোতল মদ কিনেছি—তোমার টাকায়। আমি একটা খেয়েছি। ইটার এই এতটা খেয়েছি। বাকীটা সুখী খাবে। নিয়ে যাচ্ছি। সেই ববুয়া—বাচ্চাটা গো, ঘুমায়ে যাবে—তবে সুখী খাবে। হাঁ। এই নটার ট্রেনে ফিরব বাড়ী সেই কিরিন্নার। কোম্পানীর কোয়াটার। হাঁ সেইখানে। সুখা ববুয়াকে নিয়ে চলে গেল—বিকেলের গাড়ীতে। আমি নটার গাড়ীতে যাব। আমি যাই বাবু! ট্রেন ফেল ক'রে পড়ে থাকলে সব্বনাশ। হাঁ!

ব'লে রাঙা চোখ মেলে তর্জ্জনীটি তুলে প্রায় মিনিট খানেক চুপ করে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—বুঝেছ?

ঘাড় নেড়ে হেসে জানালাম—হ্যাঁ বুঝেছি।

বার বার ঘাড় নেড়ে বাবুরাম বললে— উঁহু-উঁহু—কিছু বুঝ নাই। ছাই বুঝেছ। সুখী জেগে বসে থাকবে। ভাববে, কি করেছি—হয়ত বা মরেছি কি মরছি—সাপে কেটেছে, নয়তো পড়ে গিয়েছি, মাথা ফেটেছে। আর আমার সারারাত ঘুম হবে না। মানে কিনা - ববুয়াটা ঘুমাবে না। বলবে, বাবা কই এল? হাঁ।

সেই তর্জ্জনী তুলে রাঙা চোখ মেলে চেয়ে রইল আবার। আমি প্রত্যাশা করছিলাম— এইবার জিজ্ঞাসা করবে বুঝেছ? কিন্তু তা আর করলে না। হঠাৎ উঠল, বললে—চললাম। ট্রেন ফেল হয়ে যাবে।

চলে গেল টলতে টলতে আমি বইয়ে মন দিলাম। কিন্তু মন তখন বাবুরামের পিছনে ছুটেছে। ভাবছিলাম ওরই কথা। হঠাৎ চমকে উঠলাম একটা ভারী কিছুর পড়ে যাওয়ার শব্দে। বেশ ভারী একটা কিছু; বেশ জোর শব্দ উঠেছে। আলোটা তুলে নিয়ে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে পথের উপর আলো ফেলে দেখতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম বাবুরাম। বাবুরাম পড়ে গেছে। ধুলো ঝেড়ে উঠে সে বললে - ফিরে এলম।

জিজ্ঞাসা করলাম - কেন? আবার ফিরলে কেন?

— ফিরলম। যে কথাটা বলতে এলম—সেটা বলতে ভুলে গেলম।

— কি সে কথা?

—হাঁ সে কথা—। বলতে বলতে সে ধপ্ করে বসে পড়ল।

—তুমি তখুন শুধালে না—বাচ্চাগুলাকে মানুষ ক'রে ফিরে দিই, কষ্ট হয় না? শুধাও নাই?

মনে পড়ে গেল কথাটা। জিজ্ঞাসা করেছিলাম বটে। বাবুরাম হা—হা ক'রে হেসেছিল। কথা বলে নি। ওর বউ সুখী ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না—না—না।

—সেই কথাটা। হাঁ। সেই তর্জ্জনী তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম—হ্যাঁ। তখন তো তুমি হা—হা করে হেসে উঠলে।

—হাঁ। হেসে উঠলাম। এখন কথাটা হ'ল—। এই যে আমার বহুটা, ওই সুখীটা—বুঝলে? বললাম—হ্যাঁ। সুখী কি বল?

—সুখীটা হাজারিবাগে পাদরীদের হাসপাতালে কাম করত। পাদরীরা উকে কেরেস্তান: কেরেস্তান করবে ঠিক করেছিল। আমি ছিলম জমাদার। মেথর। কেরেস্তান হবার ভয়ে দু জনাতে পালায়ে এলম। সি অনেক দিন। দু জনাতে বেশ ছিলম বাবু! তবু বুঝেছ—মাঝে মাঝে আমার মনটি কেমন হয়ে যেত, আবার আমার মনটি ভাল থাকত—উ কেমন হয়ে যেত। বুঝেছ? বাবুরাম সেই রক্তরাঙা চোখে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল—ডান হাতের তর্জ্জনীটি আপনা আপনি উদ্যত হয়ে উঠল, কিন্তু এবার আর স্থির রইল না—একটু একটু যেন কাঁপতে লাগল।

আমি বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম বলেই হাসি পেল না এবার। আমারও দৃষ্টিতে মুখে কিসের যেন ছায়া নেমে এল।

বাবুরাম বললে—হাঁ, তুমি ঠিক বুঝেছ গো। তেমনই লাগছে! শুন। একদিন আমি শুধালাম, কি তোর হয় সুখী? সুখী হেসে বললে—কিছু না। তু খেপা খানিকটা! একদিন সুখী শুধালে, কি তোর হয় বল্ দেখি? এমন ক'রে কি ভাবিস? আমি হেসে বললাম—কিছু না। তোর মাথা খারাপ বটে সুখী! গা গতর কেমন লাগছে! বুঝেছ?

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই এবার সে বললে—একদিন—। বুঝেছ? একদিন হ'ল কি—একসঙ্গে উওর মনটি কেমন হয়ে গেল—আমার মনটিও কেমন হয়ে গেল। এক সঙ্গে! বুঝেছ? দু জনার মুখের দিকে দু জনা তাকালাম—আর দু জনাকে দু জনার যেন বিষ হয়ে গেল। খুব ঝগড়া করলাম দু জনায়। খুব মারলম আমি ওকে, উ আমাকে নখে করে ছিঁড়ে দিলে। কামড়ে দিলে। তা'পরে দু জনাতে খুব কাঁদলম। তার পরে উ বললে—আমার ছেলে নাই পুলে নাই, আমার মন খারাপ হয়, তা বলে তু আমাকে মারবি? আমি মনে মনে দুখ করতে পার না? বাবু, আমার মনটিও তাই বলে উঠল—ছেলেপুলে হল না, খাঁ খাঁ করে চারিদিক—মন আপনি উদাস হয়, তা' কি করব আমি? তাই বলে তু গাল দিবি—ঝগড়া করবি—ঝাঁটা নিয়ে মারবি? বুঝলে? হাঁ।

তা' পরেতে বাবু—একদিন শহরে—ছোট শহর বটে; বরাকর জান বাবু, বরাকর—শহর, কয়লার খাদ আছে, মন্দির আছে? জান? হু সেইখানে থাকি, খাদে চাকরী করি তখন। একদিন খাদের ডাক্তার ডেকে পাঠালে। কি? না—ধাওড়াতে একটা মেয়েছেলে মরেছে—আপন লোক পালায়েছে বাবু, কেন না—মেয়েটা মরেছে কাশ রোগে; কাশ রোগের মড়া ছুলে কাশ ব্যামো হয়, তাই মরদটো ভেগেছে, এখন সেই মড়াটা ফেলতে হবে। গেলম বাবু। আমাদের কাম বটে উটা। টাকাও মেলে মোটা। তবু অনেক মেথর ভয় করে। ববুরাম করে না বাবু। বাবুরামের জানের ডর

নাই। গেলম। তো দেখলম—মা-টা মরে পড়ে রয়েছে—আর পাশে একটো ছেলে এই শিকুটির মত চেহারা পড়ে পড়ে ধুঁকছে। আমি বললম—ডাক্তার বাবু, মাটোকে ফেলে আসছি—ছেলেটোকে কে লেবে? ডাক্তার ওই উদের স্বজাত আর সব মানুষকে ডেকে বললে—ছেলেটাকে তোমরা কেউ লাও। তা—তারা বললে, কে লিবে? তখন আমি বললম—তবে আমি লিব ডাক্তার বাবু? ডাক্তার বললে—লিবি? লিয়ে কি করবি? উটাও তো মরবে রে। উ তো বাঁচবে না। বুঝলে?

একটু থেমে অকস্মাৎ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে বাবুরাম। তারপর হাসলে। অট্টহাসি নয়—মৃদু নিঃশব্দ হাসি। তারপর বললে—তা মরল না ছেলেটা। বাঁচল। দেখেছ তো সুখীর যত্ন? হাঁ সাদা শুঁয়াওলা তোয়ালে ছাড়া ছেলে নেয় না, পাউডার মাখায়। বোতলে দুধ খাওয়ায়, বিশবার সাবুন দিয়ে গরম জল দিয়ে বোতলটা ধোয়। উ সব হাসপাতালে শিখেছিল কি না! হাঁ!

বাবুরামের মত্ত দৃষ্টিতে স্বপ্ন-সুষমা ফুটে উঠল। তেমনি হাসি দুটি ঠোঁটে। মনে হ'ল সে যেন একটা অতিকায় শিশু—দেয়ালা করছে, হাসছে।

বললে—ছ মাসে ছেলেটা যা হ'ল সে কি বলব তোমাকে। এই দুটি ফুলা ফুলা গাল—মাথায় টোপর টোপর চুল; ববুয়া বলে ডাকলেই—খিল-খিল হাসি! দুই আকাশে ছুড়ে দিতম—আর লুফে নিতম, খিল খিল করে হেসে ভেঙে পড়ত। হাঁ!

বাস্। বাবু, মন আমাদের ভাল হয়ে গেল। আর খারাপ হ'ত না মন। ঘরের চারিপাশে যেন ফুল ফুটে উঠল বারোমাস-বারোমাস বাবু সে ফুল ফুটে রইল। ঝরল না, শুকাল না। হাঁ!

—তারপরেতে বাবু! থেমে গেল বাবুরাম। একটু নড়ে চড়ে বোতলটা বের ক'রে খানিকটা মদ খেয়ে নিল। তারপর আবার সুরু করলে—হাঁ। তারপরেতে বাবু একদিন—ছেলেটা তখন তিন-চার বছরের হয়েছে; আমাকে বলছে বাবা, সুখীকে বলছে মা; ছেলেটার সেই আসল বাবাটা এসে হাজির হ'ল। বললে—আমার ছেলে! দাও আমার ছেলে! বাবুরাম বাবু—বাবুরাম—বাঘ বটে সে। সে উঠল হাঁকিড়ে! হাঁ! ছেলেটা আগুলে—আঙুল দেখায়ে বললাম—যাও!

বাবুরাম প্রচণ্ড চীৎকারেই বলে উঠল—যা-ও!

সে যেন সত্যসত্যই চোখের সামনে সেই দিনের ছবিটা দেখছে। তার পালিত ববুয়াকে দাবী করে—ববুয়ার জন্মদাতা যেন তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তার চীৎকারে অন্ধকার চমকে উঠল, গাছের মধ্যে ঘুমন্ত পাখীর ঘুম ভেঙে গেল—বারান্দার ধারেই বড় মুচকুন্দ চাপা গাছে কোন পাখী পাখা ঝটপট করে নড়ে চড়ে বসল। রাস্তার পাশের আগাছার মধ্যে সরীসৃপের সঞ্চরণ শব্দ শোনা গেল। পাশের বাড়ীর ভিতরে চকিত ছেলেমেয়েরা—কে? কে? বলে সাড়া দিয়ে উঠল।

বাবুরাম হা হা শব্দে অট্টহাসি হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বললে—ওই দেখ—কত জোরে চেঁচায়ে উঠলম দেখ! সুখী যে বলে—আমি খানিক পাগল—তা মিছে নয়!

আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললাম—নিজের অজ্ঞাতসারেই। তারপর প্রশ্ন করলাম—তারপর ?

—তারপরে ! হঁ ; তারপরে উ এল উদের জ্ঞাতদের নিয়ে। খাদের কুলী ! এই গাইতি-শাবল নিয়ে ! আমি বাবুরাম দাঁড়ালাম—ডাণ্ডা নিয়ে। মরি কি মারি। বাবুরামের ডর নাই। তখন এল বাবুরা ! আমাকে ডেকে বললে—কিছু টাকা দিয়ে দে ! ছেলেটার বাবা বললে—না—না—আমার ছেলেকে মেথর হতে দিব না আমি। মাথায় করে ময়লা ফেলবে উ ! না—না—না ! বাবু বুকের ভিতরটাতে কে যেন আমার কলিজাটাকে খামসে ধরে মুচড়ে দিলে ! আ—হা—হা বাবু ! আঃ— ! সামলে নিয়ে আমি বললাম—আমি উকে ময়লা বইতে দিব না। উকে লেখাপড়া শিখাব ! বাবু, ডাক্তারবাবু আমাকে বড় ভালবাসত—সে এসে আমাকে বললে—তার চেয়ে বাবুরাম —দিয়ে দে ছেলেটা। বললাম, দিয়ে দিব ? আমার বুকটা কি করছে তুমি বুঝছ ? ডাক্তারবাবু বললে—বুঝছি। কিন্তু উকে তু লিখাপাড়া শিখাবি, তারপরে ছেলেটা লিখাপড়া শিখে তুই মেথর বলে তোকে বাবা বলতে লজ্জা করবে, হয় তো বা পলায়ে যাবে রে ! তার চেয়ে উকে তু দিয়ে দে ! আমি হাঁ হয়ে গেলম বাবু ! হাঁ হয়ে গেলম। কিছু বলতে নারলম। সুখী আচমকা ছুটে এসে ছেলেটাকে তার বাবার ছামুতে নামায়ে দিয়ে আমার হাত ধরে টেনে ঘরে ঢুকায়ে—দরজাতে খিল লাগায়ে দিলে।
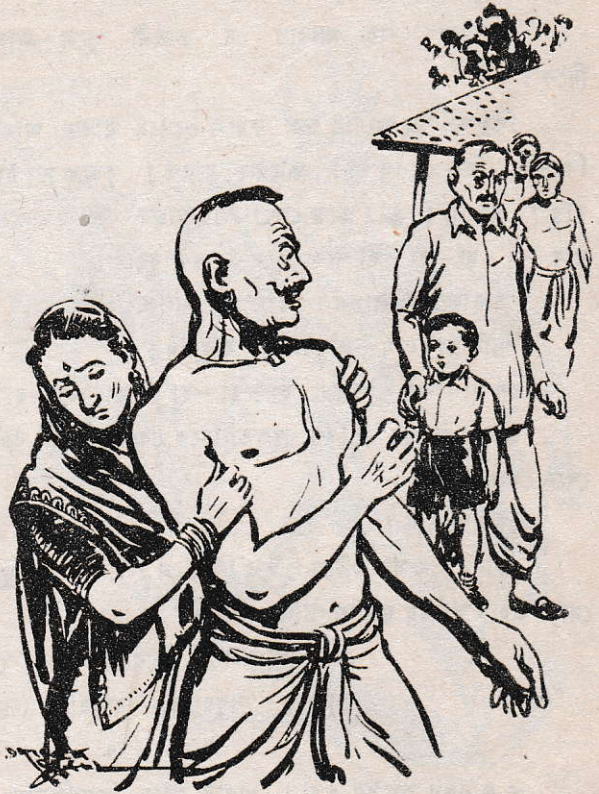
জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর ?

—সেই রাতে বরাকর থেকে পলায়ে এলম। একবারে বর্দ্ধমান। হাঁ ! সুখী বললে—ডাক্তোর ঠিক বলেছে। সুখীর গাঁয়ের একটা ছেলে পাদরীদের কাছে কেরেস্তান হয়ে লেখাপড়া শিখে

বাবাকে বাবা বলত না। কিন্তু আমি যেন ক্ষেপে গেলম। সুখীকে বেদম মারতম। বাবু, সুখী কম লয়। উ আমাকে মারত। হাঁ! শেষ কোথা থেকে একদিন আনলে একটা ছেলে; সেটা ডাগরডোগর ছেলে; তা আট বছরের বটে। রোগ হয়ে পড়েছিল গাছতলাতে, নিয়ে এল। বাবু তাকে সারালম—ডাক্তার ডাকলম, ওষুদ দিলম, ডাঁটো করলম; তখন হারামজাদা একদিন আমাদের টাকাকড়ি চুরি করে পলায়ে গেল। দু বছর পরে বাবু! হাঁ। আমি আবার ক্ষেপলম। ইবার ক্ষেপেছিলম—একেবারে খুনখারাপী ক্ষেপা। হাঁ!

অনেকক্ষণ পর আবার সে তর্জ্জনী তুলে—লাল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

কিছুক্ষণ পর আবার সুরু করলে—বেঁধে রাখত আমাকে। আর মারত। আমি খেতম না কি না। কিছু খেতম না। তাতেই মারত! বুঝলে? হাঁ! তা—মারলে কি ক্ষেপা ভাল হয় বাবু? হয় না। যার জন্যে ক্ষেপে যায় মানুষ তা না পেলে ক্ষেপা সারে না। বাবুরামের ক্যাপামী বাবু—। হা—হা—হা শব্দে হেসে উঠল বাবুরাম।

সে হাসতেই লাগল। হাসতেই লাগল।

আমি ডাকলাম—বাবুরাম! বাবুরাম!

সে হাসতেই লাগল। হা—হা—হা! হা হা—হা!

হঠাৎ গ্রামের রাত্রির স্তব্ধতা চিরে বেজে উঠল বাঁশীর শব্দ! রেলের বাঁশী। চমকে উঠে থেমে গেল বাবুরাম।

ট্রেন আসছে!

কোনরকমে সব গুটিয়ে পুটিয়ে নিয়ে সে টলতে টলতে ছুটল। অন্ধকারের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর—মোটা ভরাট কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম শুধু।

মেরে গোপাল! মেরে গোপাল! মেরে গোপাল!
ববুয়ারে ববুয়ারে, বাবুয়ারে মেরে লাল!

* * *

এ দু বছর আগের কথা। এবার গ্রামে গিয়েছিলাম দীর্ঘদিন পর। বাবুরামের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বাজারে সেদিন দেখলাম হঠাৎ লোকজন সরে যাচ্ছে। ভয় পেয়েছে সকলে। কি হ'ল? বললে—বাবুরাম!

—বাবুরাম? তা কি হ'ল?

—বাবুরাম ক্ষেপে গেছে।

—ক্ষেপে গেছে?

—হ্যাঁ। ওই তো!

দেখলাম বিশলেদেহ বাবুরাম সর্ব্বাঙ্গে ময়লা মেখে হা—হা—হা—হা শব্দে হাসতে হাসতে চলে আসছে। দূরে পিছনে ছুটে আসছে সুখীয়া। হাতে একটা লাঠি তার।

সুখী বললে—ছেলেটাকে দিয়ে দিয়েছি বাবু! তাই ও ক্ষেপেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? দিয়ে দিলে কেন? তারা—?

—না। তারা চায় নি। আমরাই দিয়ে দিলাম। তিন বছর বয়স হয়ে গিয়েছিল—ভাত না খেয়ে থাকবে কেন?

—তা' ভাত দিলেই তো পারতে?

—না। তা দিই না। দুধ—শুধু দুধ মিষ্টি ছাড়া ভাত দিই না বাবু!

—কেন?

—না। ভাত দিলে ছেলে ফিরে দেবার ক্ষণ পাব না বাবু! ছেলে বড় হয়ে যাবে। কারুর জাত গিয়েও কাজ নেই, ছেলে বড় করেও কাজ নেই।

বুঝতে পারলাম না কি বলছে সুখীয়া।

সুখীয়াই বললে—ছেলে বড় হয়ে গেলে আর ছেলে কোথায় থাকল বাবু? গোপাল কানাই হয়ে গেলেই পালায়। মায়ের ধন থাকে না। বড় হয়ে বলবে, আমার জাত মারলি?

মাসখানেক পর আবার দেখা হ'ল ওদের সঙ্গে। ষ্টেশন প্লাটফর্মে।

সুখীয়ার কোলে সাদা টার্কিশ তোয়ালেতে একটি শিশু।

বাবুরাম পাশে বসে আছে। তার চোখের লাল এখনও কাটেনি। কিন্তু সে পাগল আর সে নয়। মধ্যে মধ্যে ছেলেটার গাল টিপে দিয়ে, অট্টহাস্য হেসে উঠছে—হা—হা—হা! হা—হা—হা!

স্বামী চপেটানন্দ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নেপালচন্দ্র—ওরফে জেনারেল ন্যাপ্‌লার সঙ্গে বোধ হয় তোমাদের পরিচয় আছে। একবার সে বুদ্ধি খাটিয়ে মিশন স্কুলের গুণ্ডা ছেলেদের কেমন জব্দ ক'রেছিল, সে গল্প হয়ত প'ড়ে থাক্‌বে।

নেপাল ছেলেটি দেখ্‌তে রোগা-পট্‌কা বটে, আর বয়সও খুব কম,—কিন্তু তার মাথায় এত রকম বুদ্ধি আসে যে, কেউ তাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। বাংলার মাষ্টার বলাইবাবু তার মাথায় গাঁট্টা মেরে ভারি বিপদে প'ড়েছিলেন, সেই থেকে কোনও মাষ্টার তার গায়ে হাত তুল্‌তেন না।

নেপাল পড়াশুনায় ভালই ছিল। কিন্তু তবু পরীক্ষার সময় কার না ভয় হয়? বিশেষতঃ বলাইবাবু ওৎ পেতে আছেন, একটু সুবিধা পেলেই তাকে ফেল ক'রে দেবেন।

বলাইবাবুর ভয়ে নেপাল ভীষণ মনোযোগ দিয়ে বাংলা পড়্‌ছে; কিন্তু তবু প্রাণে শান্তি নেই—কি জানি কি হয়!

সেদিন বাংলার পরীক্ষা। ভোরবেলা উঠেই নেপাল সজোরে পড়া মুখস্থ কর্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে, এমন সময় তার বন্ধু সুধা এসে হাজির। সুধা বল্‌লে,—"কিরে, আজও পড়া মুখস্থ কর্‌ছিস্?"

নেপাল বল্‌লে,—"হাঁ ভাই, আজ যে বাংলার পরীক্ষা।"

সুধা বল্‌লে,—"বাংলার পরীক্ষায় এত ভয় কিসের? তার চেয়ে চল্, কালীতলায় এক নূতন সাধু এসেছেন, তাঁকে দেখে আসি।"

সাধু দেখ্‌বার মত মনের অবস্থা নেপালের ছিল না; সে বল্‌লে,—"না ভাই, আজ বলাইবাবু এক্‌জামিনার, আজ যদি একটা ভুল করি, তা হ'লে আর রক্ষে থাক্‌বে না।"

সুধার নিজের সাধু দেখ্‌বার খুব ইচ্ছা, অথচ একলা যেতেও কেমন বাধ-বাধ ঠেকে। তাই সে সাধুর বর্ণনা আরম্ভ কর্‌লে; বল্‌লে,—"কিন্তু আশ্চর্য্য সাধু, ভাই! তাঁর নাম স্বামী চপেটানন্দ, ভক্তেরা তাঁকে 'চড়ু বাবাজী' ব'লে ডাকে। তিনি নাকি যাকে একটি চড় মারেন তার কার্য্যসিদ্ধি হবেই।"

নেপাল অবাক্ হ'য়ে বল্‌লে,—"আঃ !—তা কখনও হয় ?"

সুধা বল্‌লে,—"হ্যাঁরে, সব্বাই বলছে তাঁর চড়ের নাকি অদ্ভুত গুণ। সমরেশদা'র ছোট ভাই ক্যাব্‌লার ইয়া-বড় পিলে হ'য়েছিল ; চড়ু বাবাজী তাকে একটি চড় মার্‌লেন—ব্যাস্, পিলে অম্‌নি ভাল হ'য়ে গেছে।"

—"অ্যাঁ !—বলিস্ কি ?"

—"হ্যাঁ। ভয়ঙ্কর ভাল সাধু—যে যা মানস ক'রে যায়, তার তা সিদ্ধ হবেই হবে। স্বামিজীর চড়ের এমনি মহিমা।"

নেপালের মাথায় অমনি বুদ্ধি গজালো। সে ভাব্‌তে ভাব্‌তে বল্‌লে,—"আচ্ছা—মনে কর্, তিনি যদি আমাকে একটা চড় মারেন তা' হ'লে আমি পরীক্ষায় পাস্ কর্‌তে পার্‌ব ?"

সুধা ভারি উৎসাহের সঙ্গে বল্‌লে,—"নিশ্চয় পার্‌বি। বলাইবাবু তোকে কিছুতেই ফেল করাতে পার্‌বেন না। তাই চল্ নেপাল, চড়ু বাবাজীর কাছে একটা চড় খেয়ে আস্‌বি—ব্যাস্, কেল্লা ফতে! পড়্‌তেও হবে না কিচ্ছুই, ড্যাং ড্যাং ক'রে পাস্ হ'য়ে যাবি। আমিও চড় খা'ব, যা থাকে বরাতে। হিষ্ট্রিটা ভাল লিখ্‌তে পারি নি—তারিখগুলো আমার একদম মনে থাকে না। চল্, আর দেরি নয়।"

নেপাল আর লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লে না। দুই বন্ধু তখন বা'র হ'ল।

গঙ্গার ধারে কালীতলা। সেখানে প্রকাণ্ড অশত্থ্ গাছের নীচে বাঘের চামড়ার উপর চপেটানন্দ স্বামী ব'সে আছেন। তখনও ভক্তেরা কেউ এসে জোটে নি।

সুধা আর নেপাল ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম কর্‌লে। বাবাজীর চেহারাটি চিম্‌ড়ে, মুখে অনেক দাড়ি-গোঁফ আছে ; চোখ দুটি করম্‌চার মত লাল। তাঁকে দেখে ভারি তিরিক্ষি মেজাজের লোক ব'লে মনে হয়। তিনি আবার কথা কন না, সব সময় মৌনী হ'য়ে থাকেন। সুধা আর নেপালকে তিনি হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন।

চড়ু বাবাজীর রুক্ষ চেহারা দেখে নেপালের খুব ভরসা হ'ল ; সে ভাব্‌ল—নিশ্চয় ইনি খুব তেজী সন্ন্যাসী—এঁর চড় কখনও বিফল হবে না। হাত যোড় ক'রে সে বল্‌লে,—"চড়ু বাবা, আজ আমার বাংলার পরীক্ষা। প্রিপেরেশন ভালই ক'রেছি, তবু ভয় হচ্ছে বলাইবাবু আমাকে গোল্লা খাওয়াবেন। তাই আপনার কাছে এসেছি, আপনি যদি দয়া ক'রে আমাকে একটি চড় মারেন ত বড় ভাল হয়। বেশী জোরে মার্‌বেন না প্রভু, আস্তে মার্‌লেই কাজ হবে—"

কিন্তু চড়ু মহারাজ তা শুন্‌বেন কেন? তিনি নেপালের গালে একটি বিরাশি শিক্কা ওজনের চড় কশিয়ে দিলেন। নেপাল একে দুর্ব্বল, তার উপর হঠাৎ এত বড় চড় আশাই করে নি; সে একেবারে চিৎপটাং হ'য়ে প'ড়ে গেল। চপেটানন্দ স্বামী চড়টি মেরেই আবার গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলেন।
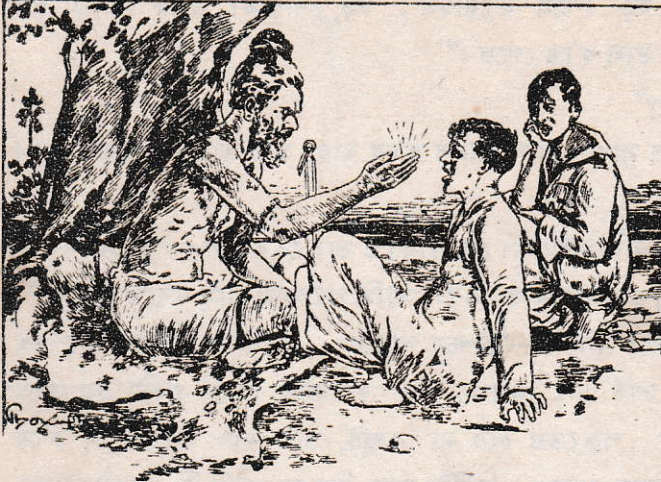
বিরাশি শিক্কা ওজনের চড় কশিয়ে দিলেন

গালে হাত বুলোতে বুলোতে নেপাল উঠে বস্‌ল। তার মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু কাউকে কিছু বল্‌বার নেই, সে নিজেই ত চড় খেতে চেয়েছে। সুধা তার হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লে,—"চ'লে আয়, চ'লে আয় নেপাল, তোর কাজ হ'য়ে গেছে। এবার নিশ্চয় পাস্ কর্‌বি।"

সুধা নিজে আর চড় খেলে না। বাবাজীর চড়ের বহর দেখেই তার পিলে চম্‌কে গিয়েছিল। সে মনে মনে ভাব্‌লে—'কী আর হবে চড় খেয়ে? হিষ্ট্রির পরীক্ষা ত হ'য়েই গেছে—এখন চড় খেলে হয়ত কোনও ফলই হবে না। তার চেয়ে নেপাল চড় খেয়েছে, এই ভাল হ'য়েছে।'

* * * *

ভাল কিন্তু মোটেই হয় নি। নেপাল সেদিন বাংলার পরীক্ষা দিলে; কিন্তু, চড় খেয়ে তার মাথা ঘুলিয়ে গিয়েছিল ব'লেই হোক, অথবা অন্য যে কারণেই হোক, বেচারা পাস্ কর্‌তে পার্‌লে না। বলাইবাবু তাকে অনেক গোল্লা দিলেন। ফলে, সে একশ'র মধ্যে মোটে বারো নম্বর পেলে।

এদিকে, কি ক'রে জানি না, স্বামী চপেটানন্দের কাছে চড় খাওয়ার খবরটা ক্রমে

স্কুলে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। সবাই নেপালকে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করলে। কেউ বল্‌লে—"কিরে, চড় খেলি তবু পাস্ করতে পার্‌লি না?"

কেউ বল্‌লে,—"আর একটা চড় খেয়ে আয়, তা হ'লে তোর মাথায় বুদ্ধি গজাবে।"

গিরীন বল্‌লে,—"ন্যাপ্‌লা, আমি একটা হনুমান পুষেছি, তুই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর্, তা হ'লে তোর বুদ্ধি বাড়্‌বে।"

এতদিন, বুদ্ধির জন্যে সবাই নেপালকে মনে মনে ভয় কর্‌ত; তাই এখন তাকে 'বোকা' বল্‌বার সুবিধা পেয়ে সকলেই মনের আনন্দে তাকে ক্ষেপাতে সুরু কর্‌লে।

নেপালের মনের অবস্থা সহজেই বোঝা যায়; সে ভারি মুষ্‌ড়ে পড়্‌ল। চড়ু বাবাজী যে একটা ভণ্ড সন্ন্যাসী তাতে আর সন্দেহ রইল না। যদি সত্যিকার সাধুই হবে, তবে সে ফেল কর্‌লে কেন?

কয়েকদিন কেটে গেল। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলা সুধার সঙ্গে খেলার মাঠে নেপালের দেখা হ'ল। নেপাল মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, সুধা অনেক খোষামোদ ক'রে তার সঙ্গে ভাব কর্‌লে। নেপাল বল্‌লে,—"তুই-ই যত নষ্টের গোড়া।"

অনুতপ্ত সুধা বল্‌লে,—"আমি ত ভাই জান্‌তুম না। তা—এখন আর রাগ ক'রে লাভ কি বল্? যা হবার তা ত হ'য়েই গেছে। তার চেয়ে আয় ঐ ভণ্ড বাবাজীটাকে জব্দ করি।"

চড়ু বাবাজীকে জব্দ কর্‌বার মৎলব নেপালের মাথায় ক'দিন থেকেই ঘুর্‌ছিল, কিন্তু সে কোনও উপায় ঠিক করতে পার্‌ছিল না। দুই বন্ধুতে তখন মাঠে ব'সে অনেক পরামর্শ কর্‌লে। কিন্তু একটিও মনের মতন ফন্দি মাথায় এলো না। নেপাল তখন বুকে ঘাড় গুঁজে ভাব্‌তে সুরু কর্‌লে।

আধ ঘণ্টা পরে সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বল্‌লে,—"হ'য়েছে। এবার বাবাজীকে চড় মারার মজা টের পাইয়ে দেবো।—হুঁ হুঁ—মহাবীর!"

সুধা আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে,—"মহাবীর কি?"

নেপাল বল্‌লে,—"গিরীনদা'র মহাবীর। এখন চল্, কাল সকালে সব ঠিক হবে। গিরীনদা'কেও দলে নিতে হবে।"

*　　*　　*　　*

পরদিন সকালবেলা স্বামী চপেটানন্দ তাঁর বাঘের চাম্‌ড়ার উপর শুয়ে ছিলেন, আর

হু'জন ভক্ত তাঁর পা টিপে দিচ্ছিল, এমন সময় গিরীন, সুধা আর নেপাল গুটি গুটি সেখানে গিয়ে উপস্থিত। গিরীনের কোলে একটি সাত-আট বছরের ছেলে কিংবা মেয়ে—আগাগোড়া র‍্যাপারে ঢাকা। দেখে মনে হয়, বুঝি তার ভারি অসুখ ক'রেছে, তাই তাকে চড়ু বাবাজীর চড় খাওয়াবার জন্যে আনা হ'য়েছে। এরকম রোগী বাবাজীর কাছে রোজই হু'চারজন আসে।

তিনজনে স্বামিজীকে দণ্ডবৎ করলে। একজন ভক্ত গিরীনের কোলের র‍্যাপার-ঢাকা মূর্ত্তিটি দেখিয়ে বল্‌লে,—"এর কি হ'য়েছে ?"

নেপাল বিনীত স্বরে বল্‌লে,—"ওর বড় অসুখ ; তাই বাবাজীর কাছে নিয়ে এসেছি, উনি যদি দয়া ক'রে ওকে ভাল ক'রে দেন।"

ভক্ত বল্‌লে,—"তা ভাল ক'রে দেবেন। ওর কি রোগ হ'য়েছে ?"

নেপাল বল্‌লে,—"তা ত জানি না ; কিন্তু ও কথা বল্‌তে পারে না। এখন বাবাজী যদি ওর মুখে কথা ফুটিয়ে দেন ত বড় ভাল হয়। আমরা পাঁচ টাকা মানত ক'রেছি, বাবাজীর পায়ে প্রণামী দেবো যদি ওকে ভাল ক'রে দিতে পারেন।"

প্রণামীর কথা শুনে চপেটানন্দ উঠে বস্‌লেন ! ভক্ত বল্‌লে,—"ঐ !—আর বেশী কথা কি ? প্রভু চড় মেরে অনেক বড় বড় রোগ ভাল ক'রেছেন।—ওকে কাছে নিয়ে এস।"

নেপাল বল্‌লে,—"কিন্তু ও বড় রাগী—আর, কিছুতেই মুখ খুল্‌তে চায় না।"

ভক্ত বল্‌লে,—"তাতে ক্ষতি নেই। বাবার চড় খেলেই সব রোগ সেরে যাবে।"

—"কথা কইতে পার্‌বে ত ?"

—"খুব পার্‌বে। হু'দিনের মধ্যেই মুখে খৈ ফুট্‌বে।"

গিরীন তখন কোলের রোগীটিকে নিয়ে এগিয়ে গেল। আর, চপেটানন্দ স্বামী মার্‌লেন তার গাল লক্ষ্য ক'রে এক প্রচণ্ড চড়।

অম্‌নি—হুলস্থূল কাণ্ড !

চড় খেয়ে র‍্যাপারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো—রোগী নয়—প্রকাণ্ড একটি গোদা হনুমান। সে হচ্ছে গিরীনের পোষা হনুমান, তার নাম মহাবীর। মহাবীর ভয়ঙ্কর রাগী, গিরীন ছাড়া আর কারুর শাসন মানে না। সে একেবারে চড়ু বাবাজীর ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়্‌ল। ভক্ত হু'জন 'বাবা গো' ব'লে টেনে দৌড় মার্‌লে।

চড়ু বাবাজীর সঙ্গে মহাবীরের রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হ'য়ে গেল। মহাবীরের গায়ে

ভীষণ জোর, সে বাবাজীর ঘাড়ে এক কামড় বসিয়ে দিলে। বাবাজীর আর মৌন-ব্রত রইল না, তিনি "খেল রে!—গেলুম রে!—বাবা রে!" ব'লে চীৎকার করতে লাগলেন।

মহাবীর কিন্তু ছাড়ে না। সে একে হনুমান, তার উপর চড় খেয়ে বেজায় চটে' গিয়েছিল। চিমড়ে চড়ু মহারাজ তাকে সামলাবেন কি ক'রে? সে আঁচড়ে কামড়ে দাড়ি-গোঁফ ছিঁড়ে—বাবাজীর অবস্থা শোচনীয় ক'রে তুললে।

বাবাজীর অবস্থা শোচনীয় ক'রে তুলল

নেপাল, গিরীন আর সুধা দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। আরও অনেক লোক জুটে গেল। নেপাল মাঝে মাঝে বলতে লাগল,—"প্রভু, মহাবীরের মুখে কথা ফোটাতে পারলেন না?"
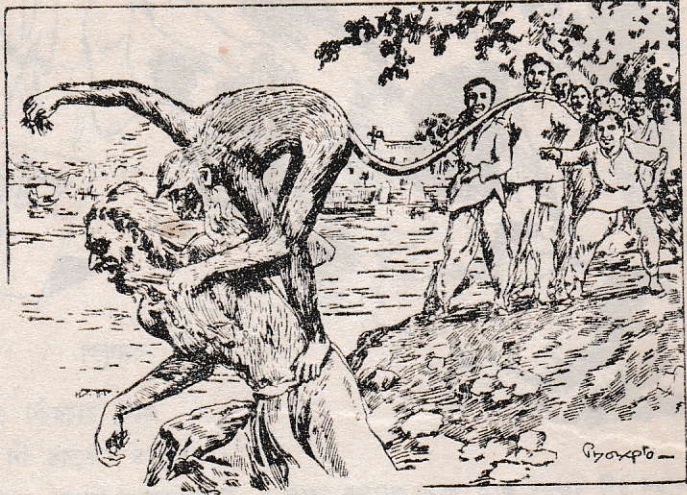
প্রভুর তখন প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়ে এসেছে। তিনি আর কি করেন, শেষে দৌড়ে গিয়ে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়লেন। মহাবীর তীরে দাঁড়িয়ে তাঁকে মুখ ভ্যাংচাতে লাগল।

* * * *

চপেটানন্দ স্বামী সেই যে সাঁতার কেটে গঙ্গা পার হ'য়ে পালালেন, আর ফিরে এলেন না। তিনি যে সত্যিকার সাধু নন, একজন ভণ্ড তপস্বী, তা সহরের লোকেও ক্রমে বুঝতে পারলে। কারণ, দেখা গেল তিনি যাদের চড় মেরেছিলেন তা'রা কেউ সিদ্ধিলাভ করতে পারে নি।

ফেল হওয়ার দুঃখ নেপালের একেবারে যায় নি বটে, কিন্তু সে যে প্রতিশোধ নিতে পেরেছে এই আনন্দেই বিভোর হ'য়ে আছে। স্কুলের ছেলেরা আর তাকে কেউ ঠাট্টা করে না।

ধন্য মহিষ

বনফুল

রাত বারোটা বেজে গেছে। নীলমণিবাবু তখনও ফেরেন নি। নীলমণি-পত্নী সুলোচনা লোচন দুটি রক্তবর্ণ করে' বসে আছেন রেগে। নীলমণিবাবুর বিধবা বোন মায়াও বসে আছেন একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে। বৌদি দাদার নামে যে সব কটূক্তি করছেন তার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু করবার সাহস নেই। বৌদির অনুগ্রহ না থাকলে এ বাড়িতে টেকা সম্ভব নয়।

…ঘড়িতে টং করে' যখন সাড়ে বারোটা বাজল তখন সুলোচনা পুনরায় তিক্তকণ্ঠে মায়াকে বললেন, "কাণ্ডখানা দেখেছ তোমার দাদার। তা-ও যদি বুঝতাম নিজের কাজের জন্যে এত খেটে মরছে তাহলেও বা মানে ছিল। কিন্তু কোথাকার কে হাড়হাবাতে মাছের ব্যবসা করবে তার জন্যে ওর ঘুম হচ্ছে না। সারাজীবনটা এই করছে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর সীমা আছে তো একটা—"

নীলুবাবু ফিরলেন রাত দেড়টার সময় কিছু টাটকা বাটা মাছ নিয়ে। নিদ্রিতা সুলোচনাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন, "ওগো, শুনছ, ফার্ষ্ট ক্লাস বাটা মাছ পেয়ে গেলাম মহলদারের কাছে। ভদ্রলোকের ভাগ্য ভালো, ঝাল করে' ফেল দিকি মাছগুলোর—।"

"এখন, এত রাত্রে? উনুনে আঁচ নেই—তোমার আক্কেলও কি নেই?"

"আঁচ দিয়ে দাও, কতক্ষণ লাগবে! আমি মাছগুলো বেছে দিচ্ছি। মাছ সঙ্গে করে' নিয়ে এলুম, ভদ্রলোককে নিরামিষ খেতে কি দেওয়া যায়!"

মায়া বলল—"আমি সব করে' দিচ্ছি।"

দুই ভাই বোনে মহা উৎসাহে লেগে পড়ল। সুলোচনাকেও লাগতে হ'ল, সে কিন্তু গজগজ করতে লাগল সমানে। যাই হোক, রাত্রি আড়াইটের সময় উক্ত আগন্তুক ভদ্রলোককে পরিতৃপ্তি সহকারে মাছ-ভাত খাইয়ে নীলুবাবু সত্যই পরিতৃপ্ত হলেন।

যে ঘটনাটা বললাম সেটা একটা উদাহরণ মাত্র। নীলমণিবাবু সারাজীবন ধরে' এই কাজ করে এসেছেন। তিনি সামান্য লোক, স্থানীয় জমিদারের স্টেটে সামান্য গোমস্তার কাজ করেন। কিন্তু তাঁর এমন দিল-দরিয়া স্বভাব যে বিশ্বের যাবতীয় লোককে দু'হাত বাড়িয়ে সাঁদরে অভ্যর্থনা করবার সাহস তাঁর আছে। ঘরের খেয়ে অনেক বুনো মোষ তাড়িয়েছেন তিনি জীবনে! আর সুলোচনাও এ নিয়ে অনেক বাক্যযন্ত্রণা দিয়েছে তাঁকে। কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করেন নি।

—দুই—

একবার অসুস্থ হয়ে কোলকাতা শহরে গিয়ে পড়তে হ'ল নীলুবাবুকে। গ্রামের ডাক্তার তাঁর অসুখ সারাতে পারলেন না। কোলকাতা শহরে নীলুবাবু বড়ই বেকায়দায় পড়ে' গেলেন। এখানে কেউ তাঁকে চেনে না। প্রতি পদক্ষেপে পয়সা দরকার। দিলদরিয়া নীলুবাবু জীবনে বিশেষ কিছু জমাতে পারেন নি। জমিদারের কাছ থেকে শ'দুই টাকা ধার করে' নিয়ে এসেছিলেন তিনি। এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন একটি খোলার ঘরে। যে ডাক্তার বাবুটির চিকিৎসায় তিনি আত্মসমর্পণ করলেন তাঁর ফি আট টাকা। তাঁকে বার দুই ডেকেই নীলুবাবুর জিব বেরিয়ে পড়ল। অবশেষে ডাক্তার-বাবুকে নিজের অর্থ-কৃচ্ছ্রতার কথা নিবেদন করলেন। ডাক্তারবাবু বললেন, "আমার প্রত্যহ আসবার দরকার নেই। সাতদিন পরে পরে আমি আসব। আপনি সকাল বিকেল একটু একটু বেড়াবেন পার্কে গিয়ে। যে ওষুধ দিয়ে গেলাম ওইটেই এখন চলুক—"

নীলুবাবু সুলোচনাকে এবং নিজের একটি অবিবাহিতা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। মায়া গ্রামের বাড়িতে ছিল। সবাই চলে এলে ঘরদোর দেখবে কে? আর তাঁর একমাত্র পুত্র জগন্নাথ ছিল বোর্ডিংয়ে। গ্রামে হাইস্কুল ছিল না, তাই তাকে বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল। সে যেখানে ছিল সেটাও একটা গ্রাম। শহরে পাঠাবার সামর্থ্য নীলমণির ছিল না।

ডাক্তারের কথা শুনে নীলমণি বললেন—"জগুকে না হয় আসতে লিখি। একা একা বেড়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব এই কোলকাতা শহরে—"

সুলোচনা বললে—"জগুই বা কোলকাতা শহরের কি চেনে। সেও ত কখনও আসে নি—"

"তবু সঙ্গে একটা কেউ থাকলে ভরসা হয়। রাস্তাঘাট দু'দিনেই চিনে নেবে—"

"তাহলে জগুকে লিখে দাও সে যেন কাউকে সঙ্গে নিয়ে আসে। কখনও তো কোলকাতায় আসে নি। হাওড়া স্টেশনে নেমে এই গলির গলি তস্য গলির ঠিকানা সে কি বার করতে পারবে?"

"আমি হরেনকে লিখে দিচ্ছি। সেই ওকে পৌঁছে দিয়ে যাবে।"

নীলমণিবাবুর বন্ধু হরেন জগুকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এর পরই সমস্যাটা হঠাৎ খুব জটিল হ'য়ে উঠল। নীলমণিবাবু ঠিক করেছিলেন ট্রামে চড়ে' হেদো পর্য্যন্ত যাবেন, হেদোয় গিয়ে বেড়াবেন। জগুকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন তিনি। ট্রাম স্টপেজের কাছে গিয়ে জগুকে তিনি বললেন, "ট্রামটা এলেই টপ করে' উঠে পড়বি। ট্রাম বেশীক্ষণ থামবে না।" ট্রাম যখন এল তখন জগু ঠিক চড়ে' পড়ল, কিন্তু চড়তে পারলেন না নীলমণিবাবু। তিনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন, ভীড় ঠেলে ওঠা সম্ভবপর হ'ল না তাঁর পক্ষে। তিনি চেঁচিয়ে জগুকে বললেন, পরের স্টপেজে নেমে পড়িস। জগু সে কথা শুনতে পেলে না। ট্রাম যখন কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে গিয়ে থামল তখন নামল সে। কণ্ডাক্‌টার নামিয়ে দিলে। নেমেই দিশা-হারা হয়ে পড়ল বেচারী। কেবল আশা করতে লাগল বাবা হয়তো পরের ট্রামেই এসে পড়বেন। কিন্তু উপর্য্যুপরি তিন চারটে ট্রাম এল, বাবা এলেন না। নীলমণিবাবু আসতেন, কিন্তু তাঁর এমন মাথা ঘুরতে লাগল যে তিনি আর ট্রামে

উঠতে সাহসই করলেন না। আস্তে আস্তে বাড়িই ফিরে এলেন। ভাবলেন জগু ঠিক ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু সে এল না। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হ'ল, ক্রমশ রাত্রি আটটা

বাজল তবু জগুর দেখা নেই। কান্না জুড়ে দিলেন সুলোচনা। নীলমণিবাবুও খুব চিন্তিত হলেন। অসুস্থ শরীর নিয়েই বেরিয়ে পড়লেন আবার। প্রতিবেশী জীবনবাবুর কাছে গেলেন। জীবনবাবুর ফোন ছিল। তিনি ফোন করে' হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিলেন, দু'চারটে থানাতেও খবর দিলেন। তারপর বললেন, "আপনি বাড়ি যান। যদি কোনও খবর আসে আমি আপনাকে বলে' আসব। চোদ্দ পনর বছরের ছেলে যখন, তখন ভয় নেই। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, ঠিক ফিরে আসবে—হয়তো একটু দেরি হবে, আসবে ঠিক।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মশাই। খবর পেলে দয়া করে' জানাবেন আমাকে। আমরা জেগেই থাকব—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা আর বলতে—"

রাত দশটা পর্য্যন্ত জগু এল না। নীলমণিবাবু এবং সুলোচনার মনোভাব অবর্ণনীয়। দুজনেই কাতর ভাবে ভগবান্‌কে ডাকছিলেন। আর কিছু করবার ছিল না।

—তিন—

যা ঘটেছিল তা এই।

জগু প্রায় ঘণ্টাখানেক কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে বাবার জন্যে অপেক্ষা করল। যখন অন্ধকার হ'য়ে এল, তখন তার মনে হল এবার বাড়ি ফেরা উচিত। কিন্তু এখান থেকে হেঁটে সে কি বাড়ি ফিরতে পারবে? সরকার বাই লেন নামটা মনে আছে, কিন্তু সেটা ঠিক কোনখান থেকে বেরিয়েছে তা তো ঠিক মনে নেই। ট্রামে যাবার উপায়ও বন্ধ, সঙ্গে পয়সা নেই একটিও। টিকিট ছিল না বলেই ট্রাম কণ্ডাক্‌টার নামিয়ে দিয়েছিল তাকে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে চিন্তা করল সে খানিকক্ষণ। তারপর একটা বুদ্ধি মাথায় এল। একটা রিক্‌সায় চড়ে' গেলে কেমন হয়। ওরা অনেক লেনের খবর জানে। বাড়ি গিয়ে ওকে পয়সা দিলেই হবে। একটা রিক্‌সা-ওলাকে জিগ্যেস করলে—"সরকার বাই লেন চেন?"

"খুব চিনি আসুন—"

রিকসা যখন চলতে লাগল তখন জগুর মনে হল সে ঠিক উল্টো দিকে চলছে। বলল সে কথা। কিন্তু রিক্‌সাওলা ধমকে উঠল—"ঠিক নিয়ে যাচ্ছি বাবু, আপনি বৈসে থাকুন না—"

পাড়াগাঁয়ের ছেলে জগু, চুপ করে' রইল। তার মনে হল কোন 'শর্ট কাট্' দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হয়তো। খানিকক্ষণ পরে সে জগুকে নিয়ে যে লেনে ঢুকল তা যে সরকার বাই-লেন নয় তা বুঝতে জগুর দেরি হল না। চেহারাই সে রকম নয়।

"এ কোথায় নিয়ে এলে আমাকে—"

"এইতো শাঁখারিটোলা লেন—"

"আমি বললাম সরকার বাই লেনে যাব—"

"সরকার বাই লেন কোথা! তখন বললেন শাঁখারিটোলা, এখন অন্য বাত বলছেন!"

"সরকার বাই লেনে নিয়ে যেতে গোড়াতেই বলেছি।"

"সরকার বাই লেন কোথা আমি জানি না। আপনি আমার ভাড়া দিয়ে দিন, অন্য সোয়ারি করে' যান।"

"আমার কাছে পয়সা নেই যে। আমাকে বাড়ি নিয়ে চল তখন পয়সা দেব।"

"সরকার বাই লেন আমি চিনি না।"

বচসা শুরু হল। কোলকাতার রিকসাওলা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। জগুও নিরুপায়। কথা কাটাকাটি চলতে লাগল। গোলমাল শুনে একটা বাড়ির দরজা খুলে গেল।

"কি হয়েছে খোকা—"

জগুর তখন চোখে জল। সে সব কথা খুলে বলল ভদ্রলোককে।

"ও, তুমি এই প্রথম কোলকাতা এসেছ বুঝি। কোথায় বাড়ি তোমার?"

"মানসাই। পূর্ণিয়া জেলায়—"

"ও! তোমার বাবার নাম কি?"

"নীলমণি মুখোপাধ্যায়—"

"নীলমণিবাবুর ছেলে তুমি? এস এস।"

ভদ্রলোক রিকসাওলাকে বিদায় করলেন। তারপর বললেন, "সরকার বাই-লেন কোথায় তা আমিও চিনি না। তবে বার করতে পারব আশা করি। তুমি ততক্ষণ একটু কিছু খাও।" জগুর ক্ষিধে পেয়েছিল, সে আর আপত্তি করলে না। প্রচুর খাওয়ালেন ভদ্রলোক। তারপর একটা বই খুলে সরকার বাই-লেনের পাত্তা লাগালেন।

"এইবার চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—"

বিরাট মোটর বার করলেন একটা গ্যারেজ থেকে। দশ মিনিটের মধ্যে এসে হাজির হলেন তিনি নীলমণিবাবুর বাসায় রাত্রি সাড়ে দশটায়।

"চিনতে পারেন আমাকে— ?"

নীলমণিবাবু চিনতে পারলেন না।

"সেই যে মাছের ব্যবসা উপলক্ষে আপনার কাছে গিয়েছিলাম বছর কয়েক আগে ? সেই যে রাত্রে বাটা মাছের ঝোল দিয়ে গরম গরম ভাত খাইয়েছিলেন, মনে নেই ?"

নীলমণিবাবুর তখন সব মনে পড়ল।

"আপনার আশীর্ব্বাদে মাছের ব্যবসা করে' ভালই হয়েছে আমার। আপনার সাহায্যেই আমার প্রথম হাতে খড়ি। যোগাযোগ দেখুন, কতদিন পরে আবার দেখা। এখানে এসেছেন অসুখের চিকিৎসা করাতে ? কোন্ ডাক্তার দেখছে—"

"ডাক্তার এস. কে. মিত্র—"

"আমি কাল নীলরতন সরকারকে নিয়ে আসব। তিনি আমার বাড়ির ডাক্তার। এটি কে ? মেয়ে ? বা চমৎকার দেখতে তো। বিয়ে হয় নি দেখছি। সুপাত্র আছে হাতে। আমার ভাগ্নে। আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে এখন। আগে সেরে উঠুন—"

নীলমণিবাবু সেরে উঠলেন। তাঁর মেয়েরও বিয়ে হ'য়ে গেল ভদ্রলোকের ভাগ্নের সঙ্গে। নীলমণিবাবু খুব আনন্দিত হলেন অবশ্য, কিন্তু খুব বেশী বিস্মিত বা বিচলিত হলেন না। তাঁর মনে হ'ল যা ঘটা উচিত ছিল তাই ঘটল, এর মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর তিনি কিছু দেখ্‌তে পেলেন না। উক্ত মৎস্যব্যবসায়ী যদি এসব না করতেন, তাহলেই বরং তিনি আশ্চর্য্য হতেন। ভদ্রলোকমাত্রেই তো ভদ্রতা করবে, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে !

সুলোচনা কিন্তু ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন।

– চার—

কোলকাতা থেকে ফিরে আসবার প্রায় মাস ছয়েক পরে একদিন নীলমণিবাবু প্রতিবেশী মহাদেববাবুর গাভীটির সেবা করছিলেন, নিজের হাতেই ঘাস দিচ্ছিলেন তাকে। কারণ মহাদেববাবু আসন্নপ্রসবা গাভীটিকে তাঁর কাছে রেখে নিশ্চিন্তমনে তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এমন সময়ে জন দুই কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে থানার নূতন দারোগাটি এসে হাজির হলেন।

বললেন, "দিন সাতেক আগে দুটি ভদ্রলোক কি আপনার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ। কেন বলুন তো। খদ্দরধারী দুটি ছোকরা—"

"তারা পলিটিকাল আসামী। আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে—"

"চলুন—"

হাত ধুয়ে তিনি পুলিশদের অনুগমন করলেন। আর ফিরলেন না। বিচারে তাঁর জেল হ'ল এবং জেলে মৃত্যুও হল।

—পাঁচ—

পাঁচ বছর পরে বিধবা সুলোচনা এই নিয়ে দুঃখ করছিলেন তাঁর বোনের কাছে।

"চিরকালটা ভাই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে গেছেন। কত মানা করতাম, কিন্তু আমার কথা কানে তুলতেন না। কোথা থেকে যে অচেনা দুটো লোক এল! আর বাড়িতে কোন লোক এলে তো ওঁর জ্ঞান থাকত না, একেবারে অস্থির হয়ে উঠতেন। কত মানা করতাম আমি। এখন হাতে পয়সা নেই, জগুরও চাকরি হয় নি—"

হঠাৎ জগন্নাথ উত্তেজিত হ'য়ে এসে ঢুকল।

"মা আমার চাকরি হয়ে গেল। অনেক ভালো ভালো ক্যাণ্ডিডেট ছিল। কিন্তু আমারই হয়ে গেল। কি করে' হ'ল জান? সেই যে দুটি লোক একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল যার জন্যে বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, তাদেরই একজন মিনিষ্টার এখন। আমার পরিচয় শুনে বললেন—ও তুমি নীলমণিবাবুর ছেলে! তোমাকে নিশ্চয়ই নেব। তোমার বাবা সেদিন রাত্রে আশ্রয় না দিলে হয়তো ফাঁসিই হয়ে যেত আমার। বস, বস—। খুব আদর যত্ন করলেন। তারপর বললেন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি যাও, তোমার চাকরি হয়ে যাবে।

সুলোচনা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

[একক-নাট্য]

নাট্যকার মন্মথ রায়

[পারস্য দেশস্থ এক নগরপ্রান্তে সুগভীর বন। কাঠুরিয়া আলিবাবা তার তিনটি গাধা নিয়ে ভালো কাঠের খোঁজে এই ঘন বনে ঢুকে পড়েছে। আলিবাবা ভিন্ন নাটকে বর্ণিত অন্যসব জীবজন্তু ও বস্তু কল্পনা করে নিতে হবে।]

আলিবাবা ॥ আয়রে আয়, চলে আয় আমার তিন গাধা। তোরা ছাড়া এই আলিবাবার আর কে আছে! আছে—আছে—ঘরে বৌ আছে, ছেলেও আছে একটা, কিন্তু তারা শুধু আমার ঘ বসে খায়—কাজ পাই শুধু তোদের কাছে। আমার সহায় সম্পদ বলতে তোরা এই তি গাধা। ওঃ, এই ঘন বনে ঢুকতে গিয়ে উঃ, কী কষ্টই না তোদের হয়েছে—তা উপায় কি ঘন বনে না ঢুকলে ভালো কাঠ মেলে না। ভালো কাঠ না হলে ভালো দাম মেলে না পারস্য দেশে সবই সেরা হওয়া চাই। গাধা যে গাধা, তাকেও সেরা গাধা হতে হবে। আঃ, কোথায় এসে পড়েছি রে বাবা! ঐ পাহাড়টার গা ঘেসে কেমন সব সেরা গাছ দেখেছিস? তোরা আশেপাশে চরে খা—আমি কাঠ কাটতে লেগে যাই। চরতে চরতে আবার খুব দূরে যাস নি বাবা—সিংহের পেটে যাবার ভয় আছে। মনে রেখো বাপজানরা। কাছাকাছিই থেকে ডাকলেই চলে এসো। আঃ, কী সব ভালো ভালো গাছ রে—গাছ তো নয়, যেন এক এক দৈত্যি। একটা কাটলেই মাসের খোরাক। নাঃ, এই আলিবাবাকে খুব দয়া করেছ খোদা ওরে বাবা, ঝড় আসছে নাকি! ধূলোর ঝড়! না-না এতো মনে হচ্ছে একপাল ঘোড়া

পায়ের আওয়াজ! কারা আসছে রে বাবা! এই ঘন বনে পায়ে চলার পথে ঘোড়া ছুটিয়ে এত লোক কারা আসছে! সেপাই শান্ত্রী, না ডাকাতের দল! হ্যাঁ, এইদিকেই আসছে মনে হচ্ছে যে! ওরে বাবা! বাড়া ভাতে ছাই পড়ল দেখছি! আমার গাধা তিনটা কোথায় গেল। তা দূরে দূরে থাকে সেই ভালো। এখন আমারো কেটে পড়া উচিত। হ্যাঁ, কচুকাটা হবার ভয় আছে। পাহাড়ের গা ঘেঁসে ঐ যে জমকালো গাছটা—হ্যাঁ, ডালপালা আর বড় বড় পাতায় ভরা ঐ গাছটায় উঠে বসি, পাতার আড়ালে বসে দেখা যাক্ এরা কারা, ব্যাপার কি! …হ্যাঁ কারো নজরে পড়বার ভয় আর নেই, কিন্তু চোখ কান চালিয়ে দেখাশোনা সবই চলবে। ওরে বাবা! কী সব তেজী ঘোড়া! আর তেমনি সব সওয়ার! ওরে বাবা, আমার এই গাছের দিকেই সব আসছে যে! এদিকে কেন রে বাবা! এখানে তো উঁচু একটা পাহাড়! পাহাড় পেরিয়ে যাবে নাকি? এই যা! সব থামলো যে! পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল সব। ঘোড়া থেকে সব নামছে দেখছি! শুধু নিজেরা নামছে না— ঘোড়ার পিঠ থেকে কী বড় বড় সব থলি নামাচ্ছে! থলিগুলো খুব ভারী মনে হচ্ছে। এতগুলো লোক, তা জন চল্লিশ হবে—কিন্তু আশ্চর্য! কারো মুখে কোন কথা নেই! নিশ্চয়ই এরা ডাকাত। তাই সব চুপচাপ। আর ঐ থলিগুলোতে নিশ্চয়ই রয়েছে লুটের মাল। এখানে বসে সব ভাগ-বাটোয়ারা হবে হয়ত! তা আমার দেখাই সার হবে—আমার কপালে তো ছিটে-ফোঁটাও আসবে না! …একি! পাহাড়ের দিকে মুখ করে, থলি হাতে সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সবার আগে আছে যে, ঐ হবে এদের সরদার। তা সরদারের মতই চেহারা বটে। গোঁফ দেখলেই চেনা যায়।…কী! 'চিচিং ফাঁক'! সরদার হাক্‌লো চিচিং ফাঁক। একবার নয়, তিনবার! ওরে বাবা, একি দেখছি রে! সরদার তিনবার 'চিচিং ফাঁক' বলতেই পাহাড়ের গায়ে গুপ্ত দরজা খুলে গেল। তাজ্জব ব্যাপার! একি! সবাই একে একে পাহাড়ের পেটে ঢুকছে যে! ওটা তবে গুপ্ত গুহা! এই দেখ! একে একে চল্লিশটি লোক গুহায় ঢুকে পড়ল—কিন্তু আশ্চর্য! কারো মুখে আর কোন কথা নেই! শুধু শুনলাম, সরদারের বাজখাই গলায় তিনবার ঐ আশ্চর্য মন্ত্রটি। চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক! কী মন্ত্র রে বাবা! পাহাড় ফুঁড়ে দরজা বের হয়! মরা মানুষও বাঁচে নাকি এ মন্ত্রে! গুহার দরজাটা তো খোলাই রইল! ভেতরে চল্লিশটা ডাকাত করছে কি! খানাপিনা করছে না কী! না—না, এ যে আবার সব একে একে বের হচ্ছে! থলিগুলো সব খালি দেখছি। এক শুধু সরদারই দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার মুখে! একে একে সবাই আবার ঘোড়ায় চাপছে! এই যে, সরদার আবার মন্ত্র হাঁকছে! চিচিং বন্ধ! চিচিং বন্ধ! চিচিং বন্ধ! হ্যাঁ, এ মন্ত্রও তিনবার! কী আশ্চর্য! তিনবার 'চিচিং বন্ধ' বলতেই দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। দরজার আর কোন হদিসই দেখা যাচ্ছে না। এইবার সরদার গিয়ে তার ঘোড়াটায় চাপলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াগুলো ছুটলো। চলে গেল। উধাও হয়ে গেল সবাই। আমি স্বপ্ন দেখছি না তো। চুল টেনে দেখি তো! লাগছে তো! চিমটি কেটে দেখি তো! লাগছে তো! তবে তো স্বপ্ন নয়। গাছের এই উঁচু ডাল থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চল্লিশ চল্লিশটে লোক হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। যাক বাবা যাক। ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়লো। এবার তবে নেমে পড়ি। দোহাই আল্লা, মন্ত্র দু'টো যেন না ভুলি! 'চিচিং ফাঁক' বলতে হবে তিনবার —বললেই পাহাড়ী গুহার দরজা ফাঁক! চিচিং বন্ধ—বলতে হবে তিনবার। বললেই দরজা হবে বন্ধ। নাম আলিবাবা, নাম গাছ থেকে তরতর করে নেমে পড়! খোদার দয়ায় ঢুকে পড় দেখি ঐ ডাকাতের গুহায়! দেখ দেখি তোর বরাতে কি আছে। ···যাক নামা গেছে। ঘামছি যে! তা ঘামের আর দোষ কি। দোহাই খোদা, দেখো যেন ভিরমি খেয়ে না পড়ে যাই। পায়ে বল দাও, মনে সাহস দাও। হ্যাঁ, এইখানেই দাঁড়িয়েছিল সরদার। এখানে দাঁড়িয়েই হেঁকেছিল সেই মন্ত্র। আমিও হাঁকছি—চিচিং ফাঁক! চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক। শোভনাল্লা! দরজা খুলছে। দরজা খুলেছে, গুহার ভেতর এ কিসের আলো চকমক ঝকমক করছে—ওরে বাবা, এ যে সব সোনা, রাশি রাশি সোনা। মোহরের পাহাড় জমে উঠেছে। শুধুই কি মোহর। কত সব মণি-মাণিক্য! হীরে, মতি, চুনি, পান্না। এ যে এক রাজভাণ্ডার! ওরে আলি, আর ভাবছিস কি? খোদা যখন দেন, এমনি করেই দেন। কাঠ নেবার বস্তায় সোনা ভরে নে। না না, হীরে, মতি, চুনি, পান্নায় লোভ করিস নে, বাজারে বের করলেই ধরা পড়বি। বস্তাগুলোয় শুধু মোহর-ই ভরে নে। তিন গাধার পিঠে বস্তাগুলো চাপিয়ে কাঠ দিয়ে ঢেকে, চলে যা বাড়ি—তোর গিন্নীর চোখ কপালে উঠুক। ছোট ভাই কাসেম বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে বড়লোক হয়ে, বড় ভাই আমাকে ছোটলোক মনে করে। তার চোখও কপালে উঠবে, না না এসব চিন্তা এখন নয়। এখন শুধু বস্তা বোঝাই করা। তারপর গুহার দরজা বন্ধ করা। কী যেন বন্ধ করার মন্ত্রটা—ও হ্যাঁ, চিচিং বন্ধ। ভুলো না বাবা আলি! খোদাতাল্লার নাম নিয়ে লেগে যাও, দেরি করো না। কে জানে ডাকাতের দল আবার ফিরে আসছে কিনা। কাজ গুছিয়ে নাও—কাজ গুছিয়ে নাও—দেরি করলে ধরা পড়বার ভয় আছে। ···যাই, গাধাগুলো ধরে আনি। বস্তাগুলো নিয়ে গুহায় আবার ঢুকে পড়ি। 'চিচিং ফাঁক' আর 'চিচিং বন্ধ'—মনে মনে জপ করো, মুখস্থ কর, ভাগ্য ফেরাবার ঐ দু'টি মন্ত্র—ভুলো না মন, ভুলো না।

(আলিবাবার প্রস্থান)

[সময় বিরতি-জ্ঞাপক নিষ্প্রদীপের পর পুনরায় বনভূমি আলোকিত হইলে দেখা গেল, এবার ওখানে আসিতেছে আলিবাবার ছোট ভাই কাসিম। বলাবহুল্য একমাত্র কাসিম ভিন্ন অন্য সব কিছু কল্পনা করিয়া লইতে হইবে।]

কাসিম॥ আলিবাবা যে পাহাড়ের কথা বলেছিল এই তো দেখছি সেই পাহাড়। বলতে কি চায়! ভাগ্যিস, অত রাত্রে ওর বৌ আমার বিবির কাছে এসে বলেছিল, একটা দাড়িপাল্লা দাও, ধান মাপব। শোন কথা—অত রাত্রে ধান মাপবে! তাই না আমার চালাক বিবি দাড়িপাল্লার তলে আঠা লাগিয়ে দেখতে চেয়েছিল সত্যি সত্যি ব্যাপারটা কি! দাড়িপাল্লা যখন ফেরৎ দিয়ে চলে গেল, আমার বিবি অবাক হয়ে দেখে দাড়িপাল্লার তলায় আঠার লেগে রয়েছে মোহর! এত মোহর যে গুণলে চলে না, মাপতে হয়! সেই মোহর নিয়ে আলির কাছে ছুটে গিয়ে—যেই বলেছি, ডাকাতি করে মোহর এনেছ, যাচ্ছি কোতয়ালের কাছে,—ভয়ে তখনি সব কবুল করল—নিশানা দিল এই গুপ্ত গুহার! নিশানা যদি মিথ্যা হয়, আমি সোজা চলে যাব কোতয়ালের কাছে। দেব ধরিয়ে। আলি এনেছিল তিন গাধা, আমি এনেছি ত্রিশ। ওর চেয়ে আমাকে দশগুণ ধনী হতে হবে, নইলে আমার মান থাকবে কেন—আমার খানদানী বিবির ইজ্জতই বা থাকবে কেন!…না-না, আমি বড় বক্ বক্ করি! বক্ বক্ করতে করতে কাজের কথা ভুলে যাই। এ জন্য বিবির কাছে কত বকুনি খাই, তা কি করব! বক্ বক্ করা আমার স্বভাব! তাতে ক্ষতিটা কি? এই তো সেই পাহাড়ে এসে গেছি। আর ঐ সেই গাছ—যেটায় উঠে আলি লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখেছিল আর শুনেছিল। কি যেন সেই মন্তরটা? হাঃ হাঃ হাঃ, সে কি আর ভুলি! 'চিচিং ফাঁক্!' আর, 'চিচিং বন্ধ!' মানে লোকে খিদে পেলে চিচি করে তো! চিচি করতে করতে জীভ বেরিয়ে আসে! চি—চি—এই কথাটা মনে রাখতে পারলেই, হয়ে গেল, সব মনে পড়বে। তবে আর কেন, এইবার ফুস মন্তর—ফুস! 'চিচিং ফাঁক্'—'চিচিং ফাঁক্'—'চিচিং ফাঁক্।'‥ এই তো, গুহার দরজা খুলছে! দরজা খুলছে—দরজা খুলে গেল।…ঢুকে পড়ি।……ইয়া আল্লা! এ কোথায় এলাম রে বাবা! এ যে দেখছি সোণার খনি! হীরার খনি! যেদিকে তাকাই সোণা-দানা আর মণি-মাণিক্য! আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছে! স্বপ্ন দেখছি না তো! চুল টেনে দেখি, লাগছে তো! চিমটি কেটে দেখি—লাগছে তো! তবে তো স্বপ্ন নয়। তবে আর কথা নেই। এসব আমার! দাঁড়াও—দরজাটা আগে বন্ধ করে নি। 'চিচিং বন্ধ' ব্যস। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আর আমায় পায় কে! এ সবই আমার। আজ আমি দুনিয়ার বাদসা! না না, আর ঐ একটা বিবি নয়। দুনিয়ার বাদশা, লাখ খানেক বিবি না হ'লে আমার মানাবে না। আর আমি রুটি খাব না। খাব শুধু সোণার পিঠে। রাজ্য থেকে রূপার টাকা আমি তুলে দেব। হ্যাঁ, কচুশাক কিনতে চাও, তাও তোমাকে কিনতে হবে মোহর দিয়ে। আর কচু-ঘেঁচুই বা খাবে কেন? খাবে শুধু পোলাও, কোর্মা, কাবাব।—আমার রাজ্যে কাউকে কাজ কর্ম করতে হবে না। সবাই শুধু খাবেদাবে আর স্ফূর্তি করবে। জল খাওয়া আর চলবে না। এখন থেকে সবাইকে খেতে হবে জলের বদলে মদ। আজ আমি বাদশা—

বাদশা—দুনিয়ার বাদশা। কিন্তু এখন এ মাল ঘরে সরাতে হবে যে! একা আমি পারব! না বের হয়ে গিয়ে লোক-লস্কর নিয়ে আসব? হ্যাঁ, তাই ভালো। আমি দুনিয়ার বাদশা হতে চলেছি—আমি কেন এত ভার বইব! ফেলব মোহর, আনবো লোক। দরজা খোলো, দরজা খোলো। কই খুলছে না তো!·ও হ্যাঁ, সেই মন্তরটা—কি যেন সেই মন্তরটা? এই যাঃ, মনে পড়ছে না তো! লোকে খিদে পেলে কি করে যেন? রুটি খায়। রুটি ফাঁক—রুটি ফাঁক—রুটি ফাঁক! খুললো না তো! ধাক্কা মেরে খুলতে পারব না—হেঁই জোয়ান মারো ধাক্কা—মারো ধাক্কা—মারো ধাক্কা, ওরে বাবা, আমিই পড়ে গেলাম! না না, গায়ের জোরে পারা যাবে না। সেই মন্তরটা বলতে হবে—কী যেন—কী যেন—লোকে খিদে পেলে কী করে যেন—খাবার খায়—খাবার ফাঁক—খাবার ফাঁক—খাবার ফাঁক! হোল না! কিচ্ছু হোল না! হায় হায়, এখন কি হবে! আমার বিবি বলে দিয়েছিল অত বক্ বক্ করো না, অত বক্ বক্ করলে মন্তরটা ভুলে যাবে! হায় হায় তাই হ'ল দেখছি। আচ্ছা, লোকে খিদে পেলে হাঁই তোলে? হাঁই ফাঁক্—হাঁই ফাঁক্—হাঁই ফাঁক্! না, দরজা ফাঁক হলো না। লোকে খিদে পেলে কি খায়—রুটি ফাঁক—পোলাওফাঁক্, মাংস ফাঁক্, আলু ফাঁক, বেগুন ফাঁক্, মূলো ফাঁক্, কুমড়ো ফাঁক্, পটল ফাঁক্—কচু-কচু ফাঁক্—কচুই হ'ল!—ওরে বাবা, বাদশা হওয়া আমার হয়ে গেল! এই রে! বাইরে কি যেন একটা শব্দ! সেই চল্লিশ ডাকাত এল নাকি! তবেই হয়েছে! হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ তো কে যেন বাইরে বললে সেই মন্তরটা—'চিচিং ফাঁক্!' এই তো মনে পড়েছে, কিন্তু আগে পড়লো না! দরজা খুলে কারা ঢুকছে—বুঝেছি এই সেই ডাকাত দলপতি! শোন বাবা শোন—একি! ছোরা হাতে আগুনের ভাটার মতো চোখ রাঙিয়ে এগিয়ে আসছো যে—দয়া করো বাবা, দয়া করো—ঐ ছোরা আমার বুকে বিঁধিয়ে দিলে আমি বাঁচবো না—ও-হো-হো! আঃ!

[বক্ষে ছোরা আমূল বিদ্ধ হওয়ায় কাসিম আর্তনাদে ভূপতিত হইল।
চল্লিশ ডাকাতের অট্টহাস্য শোনা গেল।]

১৩৭৭

॥ যবনিকা ॥

আমার জীবনই আমার বাণী।

মো. ক. গান্ধী

নটবরের গল্প অনেকবার পড়েছি। আমাদের গাঁয়ের নামজাদা গুণীন। বুড়ো হয়ে গেছে এখন। নজর খাটো, মানুষ চিনতে পারে না। তা হলেও আকাশে অদৃশ্যভাবে যাদের চলাচল, তাদের নটবর স্পষ্ট দেখতে পায় চালচলন হাবভাব সমস্ত বোঝে।

শনিবার আর মঙ্গলবার কেশবপুরের হাট বসে। তল্লাটের মধ্যে খুব নাম-করা হাট। গাঙের ধারে অনেকটা জায়গা নিয়ে গো-হাটা—গরু, ছাগল উভয়ই আমদানী হয় সেখানে। দূর দূর গ্রাম থেকে লোকে কেনা-বেচা করতে আসে।

এক হাটে নটবরকে ঐখানে দেখলাম। টাক-মাথা, জঙ্গুলে-গোঁফ, হাত পাঁচেক লম্বা দেহ—হাজার মানুষের মাঝে থাকলেও নজর টেনে ধরবে। কাছে গিয়ে শুধাই : এখানে কি নটবরদা ?

বাহুল্য প্রশ্ন। নটবর পাঁঠা বিক্রি করতে এসেছে। কুচকুচে-কালো নধর পাঁঠা একটি। বাড়ির পাঁঠা নয়, নটবর ছাগল পোষে না। এই ব্যবসা ধরেছে বোধহয় সম্প্রতি—গাঁ-গ্রাম থেকে কিনে হাটে এনে বিক্রি করে। বেড়ে পাঁঠা, ভারি পছন্দসই।

দাম কত ?

নটবর কানেই নিল না। গা ধরে ঝাঁকি দিই : শুনতে পাচ্ছ না ? পাঁঠা কিনব, দাম জিজ্ঞাসা করছি।

নটবর ধমক দিয়ে উঠল : তোমার কাছে বেচবো না।

এমনি আমায় খুবই সে ভালবাসে। ধমক খেয়ে তাই রাগ হয়ে গেল। বললাম, হাটে এনেছ যখন আলবৎ বেচতে হবে। অন্যে যা বলবে, আমার দাম আট-আনা বেশি তার চেয়ে।

সমান তেজে নটবরও বলল, পাঁঠা তবে বেচবোই না মোটে, ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

দড়ি ধরে সত্যি সত্যি নিয়ে চলল। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, বাধা আছে—নয়তো আর বলছি কেন ? তোমার টাকা কি টাকা নয় ? কিন্তু গুরুতর বাধা। তুমি চলে যাও।

এমনি সময় শ্রীগঞ্জের মহাধনী হরেশ্বর সাহা এসে পড়ল। উল্লাসে ডগমগ হয়ে এক ছুটে এসে সে পাঁঠার দড়ি ধরল : বাঃ বাঃ, আবার এনেছ আজ! একদিন খাইয়ে লোভ ধরিয়ে দিয়েছ, নিত্যি হাটে তোমায় খুঁজে যাই। আস্বাদ কী চমৎকার—অমন মাংস জীবনে খাই নি। দরাদরি করব না তোমার সঙ্গে—ন্যায্য দাম যা মনে করো, বলে দাও। ফী হাটে এসো না কেন তুমি? পাঁঠা একটা কেন, বেশি করে তো আনলে পারো।

নটবর বলল, ঘরের পাঁঠা নয়—এদেশ-সেদেশ খুঁজে-পেতে জোগাড় করি। দৈবে-সৈবে জুটে যায়, জোটাতে পারলে নিয়ে আসি।

হরেশ্বর বলে, এর পরে যখন জুটবে—হাটে নয়, সোজা আমার বাড়ি চলে যাবে। মাল দিয়ে নগদ দাম নিয়ে আসবে। এই তোমায় বলা রইল।

প্রশ্ন—দুই দফা। নটবর ছাগল পোষে না—এমন উৎকৃষ্ট পাঁঠা পায় কোথা সে? এত ভালবাসা-বাসি, কিন্তু পাঁঠা আমায় কিছুতে দিল না কেন?

দৈবাৎ একদিন সমাধান পেয়ে গেলাম।

বাড়ির নিচে মস্তবড় বিল। চৈত্রমাসের ঠিক-দুপুরে শুকনো বিল খাঁ-খাঁ করছে, জনমানব কোন দিকে নেই। বোনের বাড়ি থেকে বিল পাড়ি দিয়ে আসছি। দূর থেকে নজরে এলো, মাঝ বিলের দিকে একটা মানুষ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। নটবর গুণীন, অন্য কেউ নয়—খানিকটা এগিয়ে এসে ঠাহর পেলাম। কী করছে সে ওখানে, ছুটোছুটি কিসের জন্যে? টিপিটিপি এগোচ্ছি।

উঁচু মাচার উপরে এক বটগাছ। চতুর্দিকে ধান কেটে-নেওয়া বিল-গোড়াগুলো রয়েছে। নটবরের দৃষ্টি আকাশমুখো, পায়ের দিকে নেই। জোর বেগে এদিক-সেদিক চক্কোর মারছে। ধানের গোড়ায় ঠোক্কর খাচ্ছে পায়ে, শামুকের খোলায় পা কাটছে। আল বেঁধে দড়াম করে একবার পড়ে গেল। —ভ্রূক্ষেপ নেই, উঠে তক্ষুণি আবার ছুটল। আর তড়বড় করে মন্ত্র পড়ছে সর্বক্ষণ।

চুপিসারে আমি বটগাছে উঠে পড়েছি। উপর থেকে মজাটা ভাল ঠাহর হবে। ডালের উপর পা ছড়িয়ে বসে কাণ্ডকারখানা দেখছি।

এই যাঃ, বেরিয়ে গেলি! যাবি কোথা, গণ্ডি ঘিরে দিয়েছি—গণ্ডির বাইরে যেতে হবে না। রক্ষে নেই আজকে তোর।

তীরের মতন আমার এই বটগাছের কাছে চলে এলো। দোডালার উপর আছি—দেখে না ফেলে, ভয় হ'ল। গলা ছেড়ে হাঁকডাক করে এবারের মন্ত্রপাঠ। আমার গা শির-শির করে। হাউ হাউ করে শূন্যে একটা কান্নার রব উঠল, প্রায় মাথার উপরে।

চোখ তাকিয়ে কোন-কিছুই দেখতে পাইনে। সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে, বাতাসে কান্না। বিলের উপর নটবর মাটিতে লাথি মারে আর আস্ফালন করে : বড় যে পালাচ্ছিলি! কাঁদিস কেন এখন?

মাটির ঢেলা নিয়ে সে উপরমুখো ছুঁড়ছে।

আর্তনাদ মিইয়ে আসে ক্রমশ। তারপরে ছাগলের ডাক।

অবাক কাণ্ড! স্পষ্ট দেখছি, কোথাও কিছু নেই। দুম করে এক ছাগল পড়ল বটগাছের ধারে বিলের উপর। কালো পাঁঠা। দড়ির বাণ্ডিল নটবরের কোমরে জড়ানো। পাঁঠার কান এঁটে ধরে তাড়াতাড়ি গলায় দড়ি পরিয়ে দিল।

তড়াক করে আমিও গাছ থেকে লাফিয়ে পড়লাম। নট-বরের একেবারে সামনে। সে অবাক: তুমি কোত্থেকে এলে গো?

চোখের সামনে ডালের উপরেই তো বসেছিলাম, দেখতে পেলে না।

নটবর বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে, বুড়ো হয়ে চোখের দৃষ্টি আছে কি ভাই? সব ঝাপসা।

কিন্তু আকাশে আমরা কিছু দেখিনে, তুমি কেমন আজব সব জিনিস দেখতে পাও।

নটবর বলে, সে হ'ল আলাদা চোখ। সে চোখ কালেভদ্রে এক-আধ জনের থাকে ছিল বলেই পেটে খেয়ে বেঁচে বর্তে আছি। ভূত দেখতে পাই—ঠা-ঠা দুপুরে খালে-বিলে জলে-জংগলে ভূত শিকার করে বেড়াই। তা ভূত ব্যাটারাও সেয়ানা হয়ে গেছে, তল্লাট ছেড়ে পালাচ্ছে—কমই মেলে আজকাল।

দু-হাতে একটু তুলে ধরে পাঁঠার ওজনের আন্দাজ নিয়ে নটবর বলল, মানুষ মরে ভূত হয়, ভূত মরে পাঁঠা। পাঁঠা সেদিন কী জন্যে তোমায় বেচি নি, বুঝলে তো এবার?

রাজার গালে মশা

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

রাজার গালে হঠাৎ সেদিন
কামড়ালো এক মশা,
সিংহাসনের আসন থেকে
শাস্ত্রীদলে বলেন ডেকে,—
"এক্ষুণি ঐ বে-আদবের
মুণ্ডুখানি খসা।"

উড়লো মশা ভন্‌ভনিয়ে,
তাহার পাছে পাছে,
ঢাল-তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে
ছুটলো সবাই হন্‌হনিয়ে,
শান্ত্রী ছোটে, মন্ত্রী ছোটে,—
রক্ষা কি আর আছে?

ছোট্ট মশার, তুচ্ছ মশার—
বড়ই বাড়াবাড়ি,
রাজার গালে হুল্ ফোটাবে?
এবার মজা দেখ্‌তে পাবে,
মারতে তারে লেঠেল-পাইক
ছুটলো তাড়াতাড়ি।

ঐ উড়ে যায়, ধর্ ঠেসে ধর্,
মুণ্ডুটা ফ্যাল্ কেটে,—
মাটির উপর আছ্‌ড়ে ফেলে—
এক্ষুণি ফ্যাল্ পিণ্ডি গেলে;
পায়ের তলে থেঁত্‌লে দে রে—
পাথ্‌না দুটো ছেঁটে।

উড়ছে মশা উচ্চে কেবল,
যাচ্ছে না তায় ধরা,
তীর-বল্লম-তলোয়ারে
মারতে নাহি পারছে তারে,
সৈনিকেরা হচ্ছে বেকুব
হচ্ছে আগাগোড়া।

গর্জ্জে ওঠেন রাজা আবার,
"কামান্ দাগো তবে,
কামড়ে দেবে আমার গালে ?
সইব না তা কোনো কালে,
তোপের মুখে দাও উড়িয়ে
জব্দ এবার হবে।"

মারতে মশা কামান দাগা
চল্ল রীতিমত,
তোপের আগুন উঠলো জ্বলে
ছুটলো গোলা জলে-স্থলে,
গোলার ঘায়ে প্রজারা সব
মরলো শত শত।
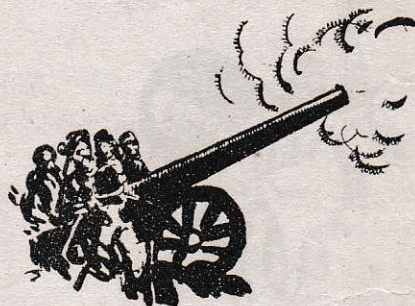
নির্ব্বিকারে গান গেয়ে যায়
তুচ্ছ ছোট মশা ;
আবার এসে পন্‌পনিয়ে
বস্‌লো রাজার গালে গিয়ে,
দেখ্‌তে পেলো মন্ত্রী তারে
যেই-না গালে বসা।

চটাং করে রাজার গালে
মারলো এসে ঘুঁসি,
উল্টে পড়েন রাজা মশাই,
সত্যি এবার মরলো মশা-ই,
ধূলো ঝেড়ে ওঠেন রাজা
বেজায় হয়ে খুসি।

[শিশু-নাটিকা]

॥ স্বপনবুড়ো ॥

[ইস্কুলের ছুটির পর বিচ্ছু লাফাতে লাফাতে বাড়ীতে ফিরে এলো। তারপর নিজের বইগুলো টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিলে। ওর চোখে-মুখে খুশীর আমেজ। বিচ্ছুর কাকাবাবু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে]

কাকাবাবু ॥ কি রে বিচ্ছু, আজ যে খুশীতে একেবারে ডগমগ! ব্যাপারটা কি? ডবল প্রমোশন পেয়েছিস নাকি?

বিচ্ছু ॥ না কাকাবাবু, আজ আমাদের ইস্কুলে প্রবন্ধের প্রতিযোগিতা ছিল। আমি প্রথম হয়েছি।

কাকাবাবু ॥ তাই নাকি রে? সাবাস! কিন্তু প্রবন্ধের বিষয়টা কি ছিল শুনি?

বিচ্ছু ॥ প্রবন্ধের বিষয় ছিল—'মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি'। বুঝলে কাকাবাবু, আমি দশ পাতা লিখে দিয়েছি। মানুষের বুদ্ধি আছে, মগজ আছে। মানুষ চিন্তাশীল। মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে

কত কি সৃষ্টি করতে পারে। বিজ্ঞানের কত উন্নতি হয়েছে এই মানুষের হাতে। আর দু'দিন বাদে মানুষ চন্দ্রে গিয়ে বাসা বাঁধবে। মানুষ যা পারে—আর সব জীব-জন্তু তা ভাবতেও পারে না। এই সব কথা ভালো করে গুছিয়ে লিখে দিয়েছি।

কাকাবাবু॥ বেশ! বেশ! তোকে আমিও একটা পুরস্কার দেবো। বড় হয়ে আমার এই বিরাট ব্যবসা ত তোকেই দেখতে হবে।

বিচ্ছু॥ সে আমি পারবো কাকাবাবু! তুমি দেখে নিও। আমার মাথায় কত বুদ্ধি গিস্‌গিস্ করছে—

মা॥ বিচ্ছু, খাবি আয়—

কাকাবাবু॥ শোনো বৌদি, বিচ্ছু আজ ইস্কুলে প্রবন্ধ লিখে প্রথম হয়েছে। ওর পেট আজ ভর্ত্তি। অনেক পুরস্কার পেয়েছে। আমিও ওকে একটা পুরস্কার দেবো।

মা॥ পুরস্কার নিয়েই পেট ভরবে? ক্ষিদে পায় না?

বিচ্ছু॥ সত্যি মা, হেডমাষ্টার মশাই যখন চেঁচিয়ে বললেন, 'বিচ্ছু প্রথম হয়েছে'—তখন আমার কী গর্ব্ব। সবাই অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

মা॥ তা কি লিখলি তুই প্রবন্ধ?

বিচ্ছু॥ 'মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।'

মা॥ এ সব কথা তুই কি বুঝিস্? তুই ত একরত্তি ছেলে।

বিচ্ছু॥ বা-রে! আমি বুঝি না! দশ পাতা প্রবন্ধ লিখেছি।

মা॥ বেশ করেছ, রাজ্যি জয় করেছ; এখন খাবে চল। খাবারগুলো সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

বিচ্ছু॥ চলো মা চলো, খাওয়াতেও আমি প্রমাণ করে দেবো যে, 'মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি'! তোমার সব খাবার আমি ফুরিয়ে ফেলবো—

মা॥ এই নে,—তোর জন্যে কত খাবার তৈরী করে রেখেছি। [খাবার দিল]

বিচ্ছু। তাই ত মা! পরোটা, সিঙ্গাড়া, জিবে গজা···আরো কত কি! যা ক্ষিদে পেয়েছে···! তুমি দেখে নিও—আমি সব সাবাড় করে ফেলবো—! আগে আমাদের বাগানে গাছতলায় গিয়ে বসি। দিব্যি ঝিরঝিরে মিঠে হাওয়া বইছে। [বাগানে গিয়ে বসলো]

[আপন মনে] বাঃ! সুন্দর জায়গা! চারদিকে পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে! গাইটা ঘাস খাচ্ছে! বেড়ালটা তার ছানা নিয়ে গাছের তলায় ল্যাজ ফুলিয়ে বসে আছে! আচ্ছা, ওদের কথা যদি আমি বুঝতে পারতাম······তা হলে ঠিক জানা যেত জন্তু-জানোয়ার পাখি পাখালির মনের কথা কী! মানুষই ত ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি! কিন্তু ওরা কি বলে! যদি ওদের ভাষা আমি বুঝতে পারতাম!

[গাছের ওপর একটা টিকটিকি বলে উঠলো—ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্!]

বিচ্ছু ॥ তাই ত! টিকটিকিটা ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্ বলে উঠলো আর মনে হচ্ছে,—আমি ওদের কথা বুঝতে পারছি!

[গাছের ওপর একটা শালিক পাখী আর তার ছানা। শালিক পাখীর ছানাটা মাথা নেড়ে বললে :]

[শালিকছানার ছড়া]

অনেক খাবার পড়ছে ভুঁয়ে
খোকার থালা থেকে—
আমি কি মা কুড়িয়ে নিয়ে
দেখবো তারে চেখে?

[শালিকের ছড়া]

মানুষেরই খাবার জেনো
ভেজাল দিয়ে ভরা,
ও সব খেলে অসুখ করে
আয় পালিয়ে ত্বরা!

শালিকছানা ॥ তুমি বলছ কি মা, মানুষের খাবারে ভেজাল? তা হলে কি করে ওরা বেঁচে থাকে?

শালিক ॥ তোকে বুঝিয়ে বলি শোন। ওদের খাবারে সব ভেজাল। ময়দার সঙ্গে ওরা পাথরের গুঁড়ো মিশিয়ে দেয়। আর ঘীয়ের সঙ্গে মেশায় সাপের চর্বি। দেখনা,—মানুষের বাচ্চাটা তাই গোগ্রাসে গিলছে। এর পর অসুখ করবে, ডাক্তার আসবে। রাশি রাশি টাকার ওষুধ কিনবে। সে ওষুধেও ভেজাল মেশানো। মানুষগুলো হচ্ছে আসল শয়তান!

শালিকছানা ॥ তা হলে আমি কি খাবো মা?

শালিক ॥ বনের থেকে টাটকা ফল এনে তোকে আমি খাওয়াবো। দেখবি তোর কোনো অসুখ নেই!

বিচ্ছু ॥ তাই ত! শালিক পাখীটা কি বলছে! আমি যে ওর কথা দিব্যি বুঝতে পারছি!

[এমন সময় গাইটা ডেকে উঠলো, 'হাম্বা'! বাছুরটা কোথায় খেলা করছিল! লাফাতে লাফাতে মায়ের কাছে ছুটে এলো]

বাছুর ॥ মাগো,—দেখেছ, মানুষের বাচ্চাটা গাছের তলায় বসে কেমন গপাগপ্ খাচ্ছে! আমি গিয়ে ওকে ঢুঁ মেরে ফেলে দিয়ে খাবারগুলো সব খেয়ে নেবো?

[গাইয়ের ছড়া]

সাবধান ! সাবধান ! বাছা কথা শোন···
মানুষের খাবারেতে দিস্‌নে রে মন !
ভেজাল মেশানো সব খাবারগুলি—
কচি ঘাস যত খুশী নে মুখে তুলি !

বাছুর ॥ তুমি বলছ কি মা ? মানুষের সব খাবারে ভেজাল মেশানো ?

গাই ॥ তবে আর বলছি কি বাছা ? ওরা লোভে পড়ে লাভ করবার জন্যে নিজেদের খাবারে ভেজাল মেশায়। সারা দেশের খোকাখুকুরা সেই খাবার খেয়ে দিনরাত ভোগে ! আর ভুগতে ভুগতে মরে যায় ! তবু ওদের শিক্ষা হয় না ! তার চাইতে বাছা,—এই কচি কচি ঘাস যত খুশী খেয়ে নে। দেহ মোটা তাজা হবে, কোনো অসুখ করবে না !

বিচ্ছু ॥ অ্যা ! গাই যে গাই···যাকে আমরা বোকা বলে জানি···সেও তার বাছুরকে ভেজাল খাবার খাওয়ায় না ! ওরা যা জানে আমরা তার কিছুই জানি না ! এটা কি করে হলো ?

[হঠাৎ একটা কিচ্‌-কিচ্‌ শব্দ শোনা গেল। বিচ্ছু তাকিয়ে দেখলে—মাটিতে একটা ইঁদুরের গর্ত্ত থেকে একটা ইঁদুরছানা মুখ বাড়িয়েছে। ইঁদুর তার ছানাটাকে সাবধান করে দিচ্ছে—]

ইঁদুরছানা ॥ মাগো, ওই মানুষের বাচ্চাটা রাশি রাশি খাবার খাচ্ছে, আর মাটিতে ছড়াচ্ছে ! আমি যদি গিয়ে ওই খাবারগুলো খেয়ে নি ?

[ইঁদুরের ছড়া]

কিচ্‌—কিচ্‌—কিচ্‌ !
ইঁদুরের ছানা তুই এই জেনে নিস্‌—
মানুষের খাবারেতে আছে শুধু বিষ !
আমি তোরে এনে দেবো শশা-পেয়ারা—
মানুষেরে দূরে রাখ - বড় বেয়াড়া !

ইঁদুরছানা ॥ তুমি বলছ কি মা ? মানুষের বাচ্চারা ভালো খাবার খায় না ? তা হলে কি করে ওরা বেঁচে থাকে ?

ইঁদুর ॥ বাঁচে আর কোথায় বাছা ? শুধু ভুগে ভুগেই ত মরে !

ইঁদুরছানা ॥ তা হলে পালিয়ে চলো গর্ত্তের ভেতর। ও বিষ আমি কিছুতেই খাবো না !

ইঁদুর ॥ সেই ভালো বাছা, সেই ভালো। বেশী লোভ করা ভালো নয়।

[দু'জনে গর্ত্তে ঢুকে গেল]

[মিউ-মিউ ডাক শোনা গেল। মিনি বেড়াল আর তার ছানা এই দিকে আসছিল]

[বেড়ালছানার ছড়া]

অনেক খাবার পড়ছে যে মা ভুঁয়ে—
মজা করে খাবোই শুয়ে শুয়ে!
মানুষেরই বাচ্চা কি মা বোকা…
এমন হাঁদা নেইকো লেখা-জোখা!

[বেড়ালের ছড়া]

ওরে আমার নধর সাদা ছানা—
ওদিক্ যেতে করছি তোরে মানা!
ভেজাল দিয়ে লাগায় খোকা ভোজ…
তাই ত ভোগে নানান রোগে রোজ!

বেড়ালছানা॥ তুমি বল কি মা! মানুষের বাচ্চাটা এত বোকা যে, রোজ ভেজাল খেয়ে ভোগে? আমি ও খাবার কিছুতেই খাবো না।

বেড়াল॥ হ্যাঁ বাছা, সেই ভালো। আমার সাথে চল, রান্নাঘরে এক কড়াই দুধ ঢাকা আছে—তাই তুই চুক-চুক করে খাবি। আর আমি দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেবো—

[বেড়ালের সঙ্গে বেড়ালছানাটা গুটি-গুটি চলে গেল]

বিচ্ছু॥ অ্যা! আমায় যে ভাবিয়ে তুললে বেড়ালছানা! আমাদের বাড়ীতেই দিনরাত আছে—লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদেরই দুধ চুরি করে খাচ্ছে! ওরাও মানুষের চাইতে বুদ্ধিমান! আমরা যে সারা জীবন ভেজাল খেয়ে ভুগছি…সে-কথা ওই বেড়াল আর বেড়ালছানাও জানে! এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি…কেন প্রায়ই আমি অসুখে ভুগি! এত ইস্কুল কামাই হয়। ডাক্তারের ডাক পড়ে · শিশি-শিশি ওষুধ খেতে হয়! তবু কিন্তু আমার অসুখ ভালো হতে চায় না!

[হঠাৎ কুকুরের ভোক-ভোক ডাক শোনা গেল। কুকুরের সঙ্গে রয়েছে একটি ছানা। তার বিক্রমও কিছু কম নয়। সে মাকে ছাড়িয়ে তেড়ে মেড়ে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু কুকুরটা তাকে কিছুতেই আসতে দেবে না!]

[কুকুরছানার ছড়া]

মানুষেরই খোকা যে খায়
রকম রকম খাবার;
ছেড়ে দে মা পেছন থেকে
করবো সে সব সাবাড়!

[কুকুরের ছড়া]

আমার কথা শোনরে বাছা,
করিস্ নেকো লোভ ;
ভেজাল খাবার খেলে পরেই
জাগবে মনে ক্ষোভ !

কুকুরছানা ॥ তুমি বলছ কি মা ! মানুষের ছেলেটা ভেজাল খাবার খাচ্ছে ?

কুকুর ॥ তবে আর বলছি কি বাছা ! মানুষগুলো অতি শয়তান ! নিজেরা খাবারে ভেজাল মেশাচ্ছে আর তাই দেশের ছেলেমেয়েরা কিনে-কিনে খাচ্ছে। মা-বাপেরও এতটুকু হুঁস নেই ! এই দেশের মতো আর কোনো রাজ্যে খাবারে এমন করে বিষ মেশায় না। আমি বাছা তোকে কিছুতেই সে খাবার খেতে দেবো না।

কুকুরছানা ॥ তবে আমি কি খাবো ? আমার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। তুমি আমায় ভালো খাবার এনে দাও—

কুকুর ॥ একটা খরগোশ মেরে রেখেছি। চল, তাই তোকে খেতে দেবো। মানুষের বোকা বাচ্চাটার মতো তোকে কিছুতেই আমি ভেজাল খেতে দেবো না—

বিচ্ছু ॥ অ্যাঁ ! আমি বোকা ! সারাক্ষণ আমার পায়ের তলায় পড়ে থাকে যে কুকুর, সেও আমায় বলছে বোকা ! তা হলে আমি মিছেই প্রবন্ধ লিখে এলাম 'মানুষই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি' ! যে মানুষ জেনে-শুনে দেশের ছেলেমেয়েদের রোজ বিষ খাওয়াচ্ছে…তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করে দিচ্ছে—তারা হলো ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ! এই কথাই আমি দশ পাতা ভরে লিখে সেরা প্রাইজ নিয়ে এলাম ! আমি কি করে সবাইকে মুখ দেখাবো ? লজ্জায় আমার বনে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

[বিচ্ছু দুই হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলো। গাছের ডালে সেই টিকটিকিটা আবার ডেকে উঠলো—ঠিক্ – ঠিক্—ঠিক্ !]

১৩৭২

যবনিকা
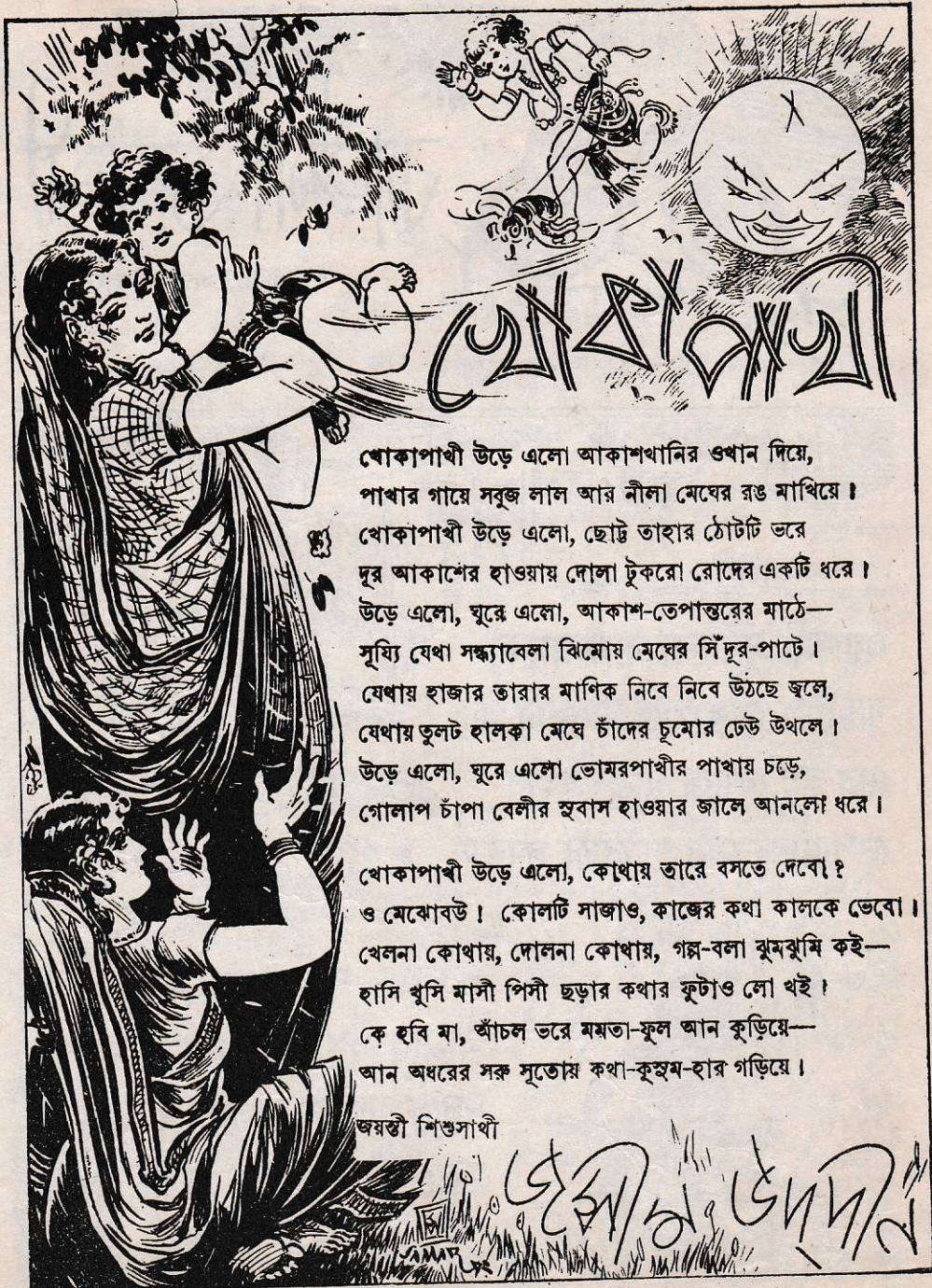
খোকাপাখী
খোকাপাখী উড়ে এলো আকাশখানির ওখান দিয়ে,
পাখার গায়ে সবুজ লাল আর নীলা মেঘের রঙ মাখিয়ে।
খোকাপাখী উড়ে এলো, ছোট্ট তাহার ঠোঁটটি ভরে
দূর আকাশের হাওয়ায় দোলা টুকরো রোদের একটি ধরে।
উড়ে এলো, ঘুরে এলো, আকাশ-তেপান্তরের মাঠে—
সূয্যি যেথা সন্ধ্যাবেলা ঝিমোয় মেঘের সিঁদুর-পাটে।
যেথায় হাজার তারার মাণিক নিবে নিবে উঠছে জ্বলে,
যেথায় তুলট হালকা মেঘে চাঁদের চুমোর ঢেউ উথলে।
উড়ে এলো, ঘুরে এলো ভোমরপাখীর পাখায় চড়ে,
গোলাপ চাঁপা বেলীর সুবাস হাওয়ার জালে আনলো ধরে।
খোকাপাখী উড়ে এলো, কোথায় তারে বসতে দেবো ?
ও মেঝোবউ! কোলটি সাজাও, কাজের কথা কালকে ভেবো।
খেলনা কোথায়, দোলনা কোথায়, গল্প-বলা ঝুমঝুমি কই—
হাসি খুসি মাসী পিসী ছড়ার কথার ফুটাও লো খই।
কে হবি মা, আঁচল ভরে মমতা-ফুল আন কুড়িয়ে—
আন অধরের সরু সূতোয় কথা-কুসুম-হার গড়িয়ে।
জয়ন্তী শিশুসাথী
জসীম উদ্দীন

ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী

অন্নদাশঙ্কর রায়

ব্যাঙ্গমী সুধালো ব্যাঙ্গমাকে,
গাছতলে শুয়ে আছে মানুষটা কে?
মনে হয় কোনো রাজপুত্র হবে
তেপান্তরের মাঠ পেরোবে কবে?

ব্যাঙ্গমা বলল ব্যাঙ্গমীকে,
সামনে বিপদ যদি যায় ওদিকে।
দস্যুর দল আছে, আসবে তেড়ে
একটি নিমেষে নেবে প্রাণটি কেড়ে।

ব্যাঙ্গমা, ব্যথা লাগে দশা ভেবে এর
কাটান কি নেই কিছু এই বিপদের?

একটি উপায় আছে : যদি সে ঘোড়ায়
পক্ষিরাজের মতো আকাশে ওড়ায়।
কিন্তু বিপদ, যেই দম ফুরাবে
ঘোড়াপ্লেন উলটিয়ে অক্কা পাবে।

ব্যাঙ্গমা, বলো তবে, কী হবে উপায়
মনটা আমার কেন করে হায় হায়!

উপায় নেই তা নয়, কিন্তু কঠিন
লাফ দিয়ে ডিগবাজি খাবে গোটা তিন।
কিন্তু পেরোবে যেই চার পোয়া মাঠ
অমনি দেখবে খাড়া লৌহ কপাট।

তা হলে কেমন করে যাবে ওধারে
কপাট কি খুলবে না কোন প্রকারে?
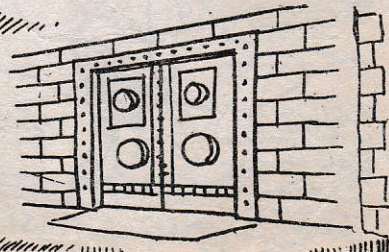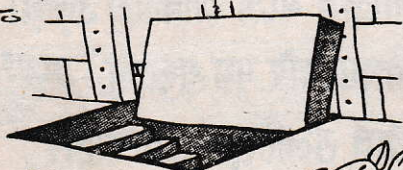
কপাটের তলে আছে গুপ্ত সুড়ং
তিন বার বলবে অং বং চং।
তখন চিচিং ফাঁক। কিন্তু ফাঁড়া!
ওধারেতে রাক্ষস আছে পাহারা।
রাক্ষস! ব্যাঙ্গমা, তরাসে মরি!
উপায় কি আছে এর? প্রশ্ন করি।
নেই যে তা নয়, তবে চাই বাহুবল
এবার খাটবে নাকো কলকৌশল!
মারতে হবে আর মরতে হবে
রাজকন্যাকে পাবে বাঁচলে তবে।
তবে আর কাজ নেই তেপান্তরে
ঘরের ছেলেকে বলি ফিরতে ঘরে।
কুক্ কুক্ কুক্কুরু কুক্ কুর কুর
ঘরে ফিরে যা রে রাজপুত্তুর।
১৩৬১

রকেট-ছোঁড়া-ছড়া

* প্রেমেন্দ্র মিত্র *

খোকন খোকন কোথায় যায়।
খোকন যায় হাটে—
কি কিনতে? একটা রকেট
ছুঁড়বে গড়ের মাঠে।

গড়ের মাঠের গুলবাজেরা
শুনেই ভয়ে কাঠ।
হন্তদন্ত হয়ে সবাই
ছুটল তক্তাঘাট।

তক্তাঘাটে বাঁধা তিনটে
পানসি স্লুপ ছিপ

তাই-না চড়ে পড়ি মরি
পালায় পবন দ্বীপ।

পবন দ্বীপে কি ?
আসল যত তারও ডবল
ভেজাল আর মেকী
আর সেখানে কি ?
বুকে মুখে কুলুপ দেওয়া
নেইক চাবিটি।

খোঁজ খোঁজ কোথায় চাবি—
হাতড়ে যে যার পকেট
নইলে পরে খোকন সোনা
রুখবে কি তার বুকেট ?
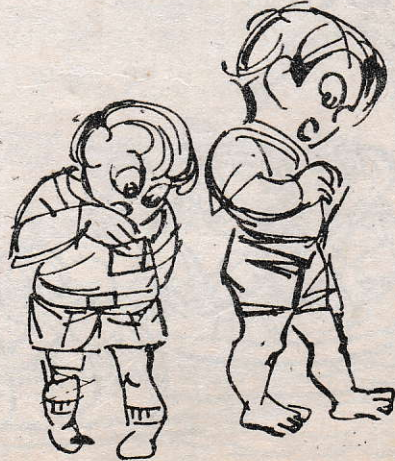
বুজুকে গুলি করে মারা হবে আজ। লোকে লোকারণ্য। টিকিট করে তারা ঢুকেছে সার্কাসওয়ালার বিরাট তাঁবুর মধ্যে—কি করে অত বড় হাতীটাকে গুলি করে ধরাশায়ী করে, তাই দেখতে।

একটা বড়, গোলাকার লোহার খাঁচার মধ্যে ঘুরছে বুজু—যে ঘোরার পরিসমাপ্তি নেই কখনও।

হাঁ, সার্কাসওয়ালা বাধ্য হয়েছে এই অশান্ত হাতীটাকে মেরে ফেলতে—না মেরে তার উপায় নেই। দেশের কর্তৃপক্ষ এই হাতীটাকে জনসাধারণের বিপত্তিজনক ত্রাস বলে অভিহিত করে আদেশ দিয়েছেন,—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাকে মেরে ফেলতে হবে।

আদেশ পেয়ে সার্কাসওয়ালা মাথায় হাত দিয়ে বসল : এত টাকার হাতী তার···আর এত বড় হাতী··· সহসা মড়-মড় করে ভেঙ্গে পড়ল তাঁবুর মস্ত বড় শালের খুঁটিটা—কেঁপে উঠল তাঁবু। রিংয়ের খেলা দেখায় যে লোকটা সে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল—লোহার শিকের ভিতর দিয়ে শুঁড় বাড়িয়ে বুজু তাঁবুর খুঁটি ভেঙ্গে ফেলেছে!

বুজু তখন উন্মাদ আস্ফালন আর চীৎকার করছে খাঁচার মধ্যে।

: না, একে আর রক্ষা করা চলে না।—পায়চারি করতে করতে বলল সার্কাসওয়ালা ম্যানেজার।···জানিয়ে দিল সে কর্তৃপক্ষ সরকারকে—সে প্রস্তুত; কিন্তু দশটা রাইফেল দিয়ে সরকারকে সাহায্য করতে হবে।···সময়, পরদিন সকাল আটটা।

ভারতীয় হাতী বুজু। কিনে এনেছিল ইংলণ্ডের সার্কাসওয়ালা। প্রথম প্রথম বুজু ছোট ছেলেমেয়েদের কি ভালটাই না বাসত! শুঁড়ে তুলে সে তাদের দোল খাওয়াত, শুঁড়ে করে পিঠের উপর তুলে নিত তাদের—সার্কাসে সে কত রকম খেলাই না দেখাত!—কিন্তু হঠাৎ তার হ'ল কি!—গত সপ্তাহে সে তিন তিনবার সার্কাসওয়ালাকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছে, দর্শকদের দিকে গিয়েছে রুখে। যে সব ছোট ছেলেমেয়ে আদর করে তাকে ফল খেতে দিতে এসেছে—শুঁড় তুলে ক্রুদ্ধ চীৎকারে তাদের ভীতি-বিহ্বল করে তুলেছে সে!—তাদের নাগালে পেলে সে বুঝি তাদের আছড়ে, দলে, পিষে চূর্ণ করে দেবে এবার!

কোন কিছুতেই সে শান্ত হ'ল না।

সংবাদটা প্রচার হয়ে গেল রাত্রেই—সার্কাসওয়ালা তার এই বেয়াড়া হাতীটাকে গুলি করে মারবে সকাল আটটায়। দলে দলে লোক ছুটে এল দেখতে। টিকিট কিনে তারা ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভিতর।

সার্কাসওয়ালার যথালাভ।

রাইফেল প্রস্তুত করে দাঁড়িয়ে আছে দশজন সৈন্য—সংকেতের জন্য অপেক্ষা করে আছে তারা।

বুজু বোধ হয় বুঝতে পেরেছে তার পরিণাম। তার ক্ষুদ্র চোখ দুটো রাগে লাল হয়ে উঠেছে। তার দেহের মধ্যে দেখা যাচ্ছে শিহরণ। প্রাণভয়ে বুজু চীৎকার করছে।

খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে রিং মাষ্টার। লম্বা, ঢিলে কোট তার গায়ে—মাথায় চকচকে টুপি। গুলি ছুড়বার ইঙ্গিত করবার জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছে,—ঠিক এমনি সময়ে ম্যানেজারের কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে একজন বেঁটে, মুখে গোঁফ এবং পুরু চশমা পরা লোক বলল: হাতীটাকে কি বাঁচানো যায় না?

: না, অসম্ভব।...মুখ গম্ভীর করে বলল ম্যানেজার: হাতীটা অত্যন্ত বদ-মেজাজী—কিছুতেই ওকে বাগে আনা গেল না।

: আচ্ছা, আমাকে ঐ খাঁচার মধ্যে একটিবার ঢুকতে দিন্। দু'মিনিটের মধ্যেই দেখবেন, আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

লোকটা পাগল নাকি!—আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখল ম্যানেজার: না, মশাই,—এক মিনিটের মধ্যেই আপনার প্রাণ যাবে ওর পায়ের নিচে।

: দেখাই যাক্ না!

: ক্ষেপেছেন আপনি?—শেষে আমার প্রাণটা নিয়েও টানাটানি পড়ে যাবে যে!

: আপনি একথা বলবেন তা আমি আগেই জানতাম।...মৃদু হেসে উত্তর দিল লোকটি: এজন্য আমি সরকারের অনুমতিপত্র নিয়ে এসেছি। সমস্ত দায়িত্ব আমার নিজের।

অনুমতিপত্রখানা সত্যি কিনা ভালো করে দেখে নিয়ে খবরটি ম্যানেজার দর্শকমণ্ডলীর কাছে জানাল।

অবাধ্য হাতীকে গুলির আঘাতে মরতে দেখার চেয়ে একটা মানুষ সেই হাতীর খাঁচার মধ্যে ঢুকছে, এটা দেখা কম চমকপ্রদ নয়!

লোকটি গায়ের কোট আর মাথার টুপিটি খুলে ফেলে দিয়ে বলল : এইবার খাঁচার দোরটা খোলা হ'ক।

থমকে দাঁড়াল বুজু। ক্রুদ্ধ-দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকল ঐ দুঃসাহসী আগন্তুকের দিকে। নিরস্ত্র লোকটি খাঁচার ভিতর ঢুকে বন্ধ করে দিল ভিতর থেকে খাঁচার দরজা!

নিঃস্তব্ধ জনতা যেন রুদ্ধ-নিশ্বাসে দাঁড়িয়ে আছে।

বুজু শুঁড়টা উঁচু করে গর্জে উঠে সতর্ক-বাণী জানাল লোকটিকে। আগন্তুক কিন্তু কিছুমাত্র ভয় পেল না তাতে! মৃত্যুভয়হীন লোকটি আস্তে আস্তে কি সব বলল বুজুকে। বুজু শান্ত হয়ে এল। কান খাড়া আর শুঁড় উঁচু করে এতক্ষণ সে যে উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করছিল—কোন্ যাদুমন্ত্রের বলে তা থেমে গেল। নির্বাক বিস্ময়ে জনতা তাকিয়ে থাকল খাঁচার দিকে।

বুজুর শুঁড়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়ে কি যেন বলছে লোকটি। তার কথা একবর্ণও বুঝতে পারছে না ওরা কেউ!

বুজু ছোট ছেলেদের মত একবার শব্দ করল। সুরটা অতি করুণ।...লোকটি আরও কাছে এগিয়ে গেল তার। শুঁড়টা নিয়ে সে তার হাতে জড়াল, গলায় জড়াল—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পাগলা হাতীটা! তার গায়ে ভয়ের শিহরণ দেখা যাচ্ছে না আর।

ফাঁসীর আসামীর গলায় দড়ি পরাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যদি কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বলে, আসামী খালাস!—তা'হলে দর্শকমণ্ডলীর যে অবস্থা হয় ঠিক তাই। স্তম্ভিত জনতা আনন্দে বাহবা দিয়ে উঠল!
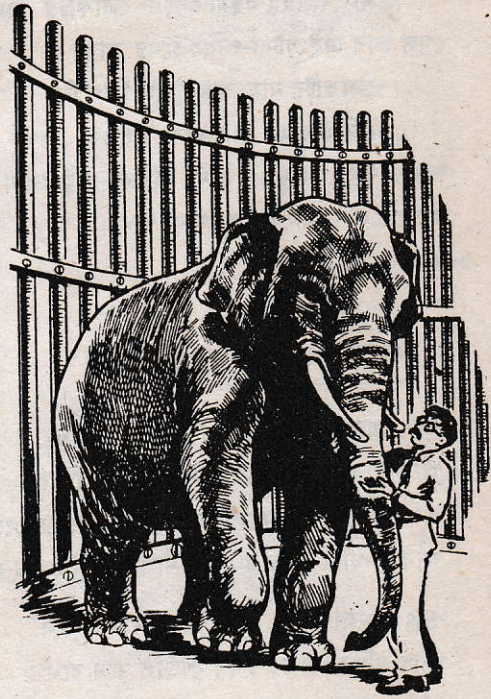
: বুজু দেশে যাবার জন্তে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।—লোকটি বলল ম্যানেজারকে : নানান দেশের নানান ভাষা, বিনা স্বদেশী ভাষা মেটে কি আশা ?—আমি ওর সঙ্গে হিন্দুস্থানীতে কথা বললাম। ভারতীয় হাতী ওটি। হিন্দুস্থানী ভাষাই ও শুনে আসছে আজন্ম কাল। আমি ওকে বুঝিয়ে বলেছি, গোলমাল সে আর করবে না এর পর।

ম্যানেজার হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। লোকটি হয়ত—যে ব্যক্তি হাতীকে গুলি করে মারা দেখাবার জন্ত টিকিট বিক্রী করতে পারে, তার সঙ্গে করমর্দন করতে চাইল না।

অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটি এক মিনিটের মধ্যে !

ম্যানেজার অনুমতিপত্রে লোকটির দস্তখতের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, পরিষ্কার হয়ে গেল তার এই ঘটনা-পরিবর্তনের কারণ।

লোকটির নাম রুড্ইয়ার্ড কিপ্লিং।

ইনি একজন খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক। এঁর লেখা কবিতা, উপন্যাস, চরিত্র-চিত্র প্রভৃতি অনেক বই আছে। ইনি পত্রিকা-পরিচালনা সম্পর্কে অনেকদিন ভারতবর্ষে ছিলেন। সাহিত্যিক হিসাবে ইনি নোবেল পুরস্কার পান।

১৩৬০

শরৎ এলো

—শ্রীপ্রভাকর মাঝি

শরৎ এলো ফুল-বাগানে সোনার হাসি নিয়া,
আঁকাবাঁকা রাঙা মাটির নয়া সড়ক দিয়া।
আলতো বায়ে আসলো নেমে ছুটির দেশের থেকে,
আকাশ-গাঙে সাত রাজ্যের নীলবড়ি রং মেখে।

শরৎ এলো চুপে চুপে সাদা বকের সনে
হঠাৎ খুসির ঝিলিক নিয়ে শিউলি বনে বনে।
কচি রোদের ছোপ লেগেছে শিশির-ভেজা ঘাসে,
সুপ্ত নিখিল চমকে জেগে উঠেছে উল্লাসে।

শরৎ এলো উছলে-ওঠা শিলাই নদীর কূলে,
হিমেল হাওয়ায় কাশের চামর উঠছে দুলে দুলে।
কলমি-ঢাকা পদ্মদীঘি জল-থই-থই করে,
শামকুড় আর পানকৌড়ির আনন্দ না ধরে।

শরৎ এলো চিরকালের কিশোর কচি মনে,
নীল গগনের ছুটির খবর ভাসছে খনে খনে।
দুষ্ট ছেলের চোখে মুখে মিষ্টি হাসি নাচে,
সেই হাসিটি পড়লো ধরা দুষ্ট মেয়ের কাছে।

শরৎ এলো নতুন ভোরে পুজোর আঙিনায়,
দর-দালানে মধুর রাগে সানাই বেজে যায়।
মনের কোণে আজকে রাঙা স্বপন জেগে উঠে,
সকল ব্যথা মায়ের পায়ে প্রণাম হয়ে লুটে।

১৩৬০

॥ শিবরাম চক্রবর্তী ॥

পেট ভরে চর্ব্য চোষ্য খেতে পাওয়া এবং তা হজম করতে পারা আর তার পরে পরিপাটি করে ঘুম লাগানো—জীবনের এই তিনটি সুখ। তিনসুকিয়ায় এই তৃতীয় সুখটি নেই ভাই!

রাত এগারোটার সময় আমায় তিনসুকিয়ায় নামতে হোলো। এখান থেকে গাড়ি বদলে অন্য জায়গায় যেতে হবে। কিন্তু সেই পরের গাড়িটা আসবে পরের দিন—

ষ্টেশনের থেকে কাছাকাছি এক হোটেলের সন্ধান নিয়ে সেখানে গিয়ে উঠলুম। সেখানে রাত্রের মত একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে নাকে মুখে দুটি গুঁজে বিছানায় গিয়ে লম্বা হওয়া গেল।

দিনভোর রেলগাড়িতে যা ধকল গেছে--এতক্ষণে পা ছড়িয়ে বালিশের ওপরে মাথা গড়িয়ে বাঁচলাম।

এইবার ঘুম!

কষে একখানা লম্বা ঘুম—একটানা গভীর—কাল বেলা নটার আগে যার থেকে জাগবার নামটি নেই!

ঘুমোতে আমার এত ভালো লাগে!

বারোটার ঘরে দুটো কাঁটা এক হতে না হতেই আমার দু চোখের পাতা আমি এক করেছি। আর সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেছি ঘুমের অতলে…

কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না কিন্তু হঠাৎ আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা পড়তেই চমকে উঠে জাগতে হোলো আমায়…

কে যেন আমার দরজায় প্রবল করাঘাত করে চলেছে…

দুমদাম…দুম্‌দাম্‌…দুম্‌দাম্‌…

উঠে আলো জ্বাললাম। হাতঘড়িতে দেখলাম একটা ত্রিশ। এক লাফে বিছানা থেকে উঠে পড়ে ছুটে গিয়ে দরজা খুললাম…

ধপাস করে পড়ল একটা লোক।

বাতাহত কদলীবৃক্ষের মতই প্রায়। আর, কদলীবৃক্ষকেই বা কেন দুষি, তুমি আমি যে কেউই হোক না, বাতের দ্বারা আহত হলে তাকেও ঠিক ওই ভাবেই পড়তে হবে। আমার কাকুর মামার বাত ছিল, তাকেও আমি ঐ রকম করে পড়তে দেখেছি। নিজের বিছানার ওপর। ওই ভাবে পড়ে থাকতেন তিনি নিজের বিছানায়।

ধাক্কা মেরে মেরে আমার সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে লোকটা, মনে হয়, দরজার গায় হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিচ্ছিল একটু। আচমকা আমি দরজা খোলায় এখন আপনভোলার মতন আমার ঘরের ভেতর এসে পড়েছ।

এসে পড়েছে আমার ঘাড়ের ওপর।

আমার ঘাড় ভাঙত আরেকটু হলে। কিন্তু আমি হুঁশিয়ার ছিলাম, চক্ষের পলকে নিজের মাথা খেলিয়েছি—মাথাটা আমার ঘাড়ের খুব কাছেই কিনা! ঘাড় কাত করে নিয়েছি, তাই আর আমার ঘাড়কে বিশেষ কাতর হতে হয়নি। লোকটা আমার ঘাড় ঘেঁষে ধপাস করে পড়েছে পাপোষের ওপর।

গাঁটা গোট্টা চেহারা, গোলগাল মুখ—পূর্বে পশ্চিমে চ্যাপটা। নেপালী, না ভুটিয়া, না বেহারী? কী ভাষায় ওকে সম্বোধন করব?

'কোন হ্যায় তুম—গাধাকা উল্লুক?' আমি বললাম।

লোকটা জবাবে কিছুই বলল না। মৃদুমধুর হাসতে লাগল।

পাগল না মাথা খারাপ? রাতদুপুরে এসে অকারণে ঘুম ভাঙায়—কে এই বদ্‌রসিক?

আমি বললাম—'বোরাবুদর!'

বলতে চেয়েছিলাম বুড়ো বাঁদর, কিন্তু বিশুদ্ধ করে বলতে গিয়ে ওইরকম দাঁড়ালো। বুড়ো বাঁদর না বলে ওকে ধেড়ে ইঁদুরও বলতে পারতাম—কিম্বা শুদ্ধ ভাষায় মহেঞ্জোদারো। কিন্তু বলে কোনো লাভ হত না।

বোরাবুদর শুনে সে মাথা নেড়ে সায় দিল।

তার এই অদ্ভুত ব্যবহারে একটু বিচলিত হলাম বই কি! হোটেলে আগুন লাগেনি ত? ভয় হোলো একবার।

কিন্তু দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে চোখ চালিয়ে দেখলাম চারিধারে—না, কোথাও কোনো চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে না। সব দরজাই বন্ধ—সব দিকেই নিশুতি। নাক ডাকার ছাড়া কোন আওয়াজ নেই কোথাও। ঘুমুচ্ছে সবাই।

লোকটাকে ঘরের বার করে দিয়ে দরজায় খিল আঁটলাম। বিছানায় এসে সটান হলাম আবার।

সাত মিনিটও যায় নি, আবার সেই করাঘাত। দরজার ওপর পাগলের সেই দাপাদাপি।

লাফিয়ে গিয়ে দরজা খুলেই তাকে একটা ঝাপটা মারি। কথার ঝাপটা।

তেড়েমেড়ে বলি গিয়ে—এমতি কঁড় করুচি?

লোকটা যদি ওড়িয়া হয়, ওই এক কথাতেই ওকে উড়িয়ে দেয়া যাবে।

কিন্তু উড়ল না লোকটা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু মধুর হাসতে লাগল। অনেকটা 'দরজার পাশে দাঁড়ায়ে সে হাসে' আমাদের সেই 'পুরাতন ভৃত্য' কেষ্টার মতই।

'ভাগ্ ভাগ্ ভাগ্ ভাগ্ ভাগ্'—অবশেষে আমি রাষ্ট্রভাষা ত্যাগ করলাম।

রাষ্ট্রভাষায় বেশ জোর দেখানো যায়, এবং মনের ভাবও রাষ্ট্র করা যায় ফুর্তিতে। আমার জোরালো 'ভাগ ভাগ' শুনে এতক্ষণে সে তার একটা গুণ দেখাল। ভাগলো।

বিছানায় ফিরে এলাম। তখনো বালিশে মাথা রাখি নি, বিছানার ওপরে উঠে বসেছি মাত্র—দরজার ওপর আবার সেই আওয়াজ!

দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলেই আর কথাটি নয়, লোকটার ঘাড় ধরে ভালো করে ঝাঁকুনি দিলাম একখানা। আর বললাম: 'কোন তুমকো বারম্বার এইসা করনে বোলা?'

'আপহি তো।' সে অমায়িক হাসি হেসে বললে।

'হাম?' আমার বিস্ময় দমন করতে পারি না। লোকটার স্পর্দ্ধা তো কম নয়। বদমায়েসির ওপর আবার মিথ্যে কথা?

ভেবে দেখলাম বকাবকিতে কোন কাজ হবে না। লোকটার মাথার ছিট্ আছে হয়ত। বুঝিয়ে শুঝিয়ে বলা যাক।

'হাম? হাম বোলা? বাস্, হাম ফিন্ বোলতা আউর মাৎ আও। তুম যাঁহা খুসি ঘুম্‌নে যাও, হামকো ঘুমানে দেও। সমঝা?'

মনে হোলো সমঝেছে। কেননা ঘাড় নাড়তে নাড়তে চলে গেল। আমিও নিজের বিছানায় ফিরে এলাম—দরজার খিল এঁটে।

শুলাম বিছানায়। শুতে না শুতেই উঠতে হোলো। না, দ্বারদেশের কোনো আবেদনে নয়। দ্বারদেশের জন্যই উঠলাম এবার।

উঠে গিয়ে দরজার খিলটা খুললাম। খুলে দরজার দুই পাটি দন্তপংক্তির ন্যায়—আকর্ণ বিস্তৃত

মুক্ত হাসির মতই উজার করে দিলাম। দরজা আমার খোলা থাক। লোকটা আবার এসে ধাক্কা মারবার যেন কোন সুযোগ না পায়। এসে যেন দেখতে পায় দরজা ফাঁক আর আমি ঘুমোচ্ছি। একজাম্পল ইজ বেটার দ্যান অ্যাডভাইস—বলেই দিয়েছে।

দরজা উন্মুক্ত রেখে বিছানায় গিয়ে নিজের বালিশের সঙ্গে যুক্ত হলাম।

শুয়ে শুয়ে মিটি মিটি তাকাতে লাগলাম দরজার দিকে। এত কাণ্ডের পর ঘুম যেন আর আসতেই চায় না। মেজাজ খিচড়ে গেছল।

আস্তে আস্তে মনটাকে ঠাণ্ডা করতে হবে। তারপর যদি ঘুম আসে।

সেই চেষ্টায় রয়েছি এমন সময়ে আবার সেই দৃশ্য দেখা দিল। পুরাতন ভৃত্য কেষ্টচন্দ্রের চাঁদমুখ উঁকি মারলো দ্বারদেশে।

আধ বোজা চোখে দেখতে লাগলাম চেয়ে চেয়ে।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে প্রথমে সে মাথা বাড়ালো। মাথা বাড়িয়ে উঁকি মেরে দেখল আমায়। তারপর হাত বাড়ালো। হাত বাড়িয়ে নিজের মাথা চুলকাতে লাগল।

আমার উদাহরণ, মানে, আমাকে এমন করে ঘুমোতে দেখে হতভম্ব বনে গেছে মনে হয়।

তারপর আপন মনেই চলে গেল।

উদাহরণ যে উপদেশের চেয়ে কার্যকর হয় তার একটা প্রত্যক্ষ উদাহরণ পাওয়া গেল।

কিন্তু ক' মিনিটের জন্যেই বা!

আবার সেই চাঁদবদন আমার দরজায়। এবং এবার একা নয়, তার সঙ্গে আরেকজনা।

আড় হয়ে শুয়ে আড়চোখে আমি দেখছি।

সেইজনাই এগিয়ে এল এবার। এসে বলল: 'আমরা আপনার কাছে মাপ চাইতে এসেছি। আমাদের একটা ভুল হয়েছে, কিছু মনে করবেন না। আমি এই হোটেলের ম্যানেজার।...'

'আসুন আসুন!' আমি বিছানায় উঠে বসলাম: 'অতি আপ্যায়িত হলাম আপনার দর্শন পেয়ে। আপনার সঙ্গে এ হেন সময়ে আলাপ করবার সুযোগ পেয়ে আমি অতিশয় বাধিত। সত্যি বলতে, আলাপ পরিচয়ের পক্ষে এই নিশুত রাত—এর চেয়ে ভালো সময় আর হতেই পারে না। আমার সৌভাগ্য যে আপনি কষ্ট করে এমন সময়ে···আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে···'

'দেখুন, ভুলটা হয়েছে এই যে···আপনার আগে যিনি এই ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন, আজ বিকেলেই নিয়েছিলেন বলতে গেলে···তাঁর হুকুম ছিল রাত সাড়ে বারোটার পর তাঁকে তুলে দেবার জন্য। রাত দেড়টার গাড়ি ধরবার কথা ছিল তাঁর। তাঁর সেই হুকুমমতই আমাদের এই বেয়ারা··· কিন্তু তিনি যে তাঁর প্ল্যান বদলে হঠাৎ রাত সাড়ে নটার গাড়িতে চলে গেছেন তা এই বেয়ারাটির জানা ছিল না তাই সে···বুঝতে পেরেছেন কি না···।

'বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না।' সমস্ত অবগত হয়ে আমি বলি: 'এবার আপনারা

দয়া করে আমায় ঘুমোতে দিন। আমার গাড়ি কাল সকাল দশটার আগে নয়। আমাকে সকাল নটার সময় তুলে দিলেই হবে। কিন্তু দেখবেন, যেন নটার আগে না ডাকা হয় আমাকে।'

বেয়ারাটিকে মোটেই বেয়াড়া বলা যায় না। তার কাণ্ডজ্ঞান ছিল। অনুতপ্তও হয়েছিল বোধ হয়। কেননা তারপর সে আমাকে তুলতে আসেনি আর।

এমন কি, পরদিন সকাল নটার সময়ও নয়।

পরদিন বেলা বারো-টায় আমার ঘুম ভাঙলো। আপনার থেকেই ভাঙলো। তখন আমার গাড়ি এসে চলে গেছে।

আবার গাড়ি কাল সকালে সেই দশটায়।

কি করি? খেয়ে দেয়ে ঘুম লাগালাম আবার। উঠলাম পরের দিন বেলা দেড়টায়। কেউ আমার ঘুম ভাঙাতে এল না আর।

কেউ আর আসবে না মনে হয়। এখন, কদিনে নিজগুণে যথাসময়ে আমার ঘুম ভাঙবে কে জানে! তিন দিনের আগে বোধ হয় নয়।

এখন তিনসুকিয়ায় বসে বসে তিনদিন শুকোও!

বাংলাদেশের শিশু

বন্দে আলী মিয়া

সোনার শিশু ভাই-বোনেরা আয় রে চ'লে আয়,
তোদের সবার সাথে আমি যাবো সুদূর গাঁয় ;
বাংলাদেশের মাঠে আজি শস্য নাহি ফলে,
কল্‌মি-লতা দাম বেঁধেছে গাঁয়ের পুকুর-জলে।
কচুরি আর টোপা পানায় হ'তে না দেয় ধান,
তোরা সবায় বড় হ'য়ে কর্‌বি এর বিধান।
লেখাপড়া শিখে তোরা হাতে ধরিস্ হল্—
মাঠ জুড়ে তায় সোনার মত ফল্‌বে রে ফসল।
চাষী যারা গরীব তা'রা—পায় না খেতে রোজ,
বড় হ'য়ে খোকনমণি করিস্ তাদের খোঁজ।
পাট-পচানো বিলের জলে মশার জনম ভাই,
তার লাগি যে মর্‌ছে সবায়—দেশেতে লোক নাই।
বড় হ'য়ে ঘুচাস্ এ দুখ—বাঁচাস্ এদের প্রাণ,
গরীব হ'য়ে লুকিয়ে আছে আপনি ভগবান।
দেশকে তোরা ভালোবাসিস্—বাসিস্ সকল জনে,
মলিন মুখে ফুটবে হাসি—শান্তি রবে মনে।

হ'স্ রে তোরা বড় হ'য়ে সবার প্রধান জন,
নিজের হাতে বিচার ক'রে করিস্ রে শাসন।
নিত্য নব আবিষ্কারে ভরিয়ে দিবি ধরা,
ভাগ্যদেবী ঢাল্‌বে শিরে আশিস্-পশরা ;
কেউ বা হবি গায়ক, কবি—কেউ বা চিত্রকর,
পরের দেশের যশ লভিতে ডিঙাবি সাগর।
কেউ বা যাবি যুদ্ধে তোরা—কেউ বা হবি বীর,
জগৎ-সভায় বাংলা-মায়ের কর্‌বি উঁচু শির ;—
জলের তলে মুক্তা-মাণিক তুলে আনিস্ ভাই,
হবি তোরা বিশ্বজয়ী—যার তুলনা নাই।
অগ্নিগিরির বুকের মাঝে আছে কিসের খনি,
নাগপুরীতে আছে নাকি সাত রাজার এক মণি—
কালাহারী মরুর কোথায় হীরার পাহাড় আছে,
এভারেষ্টের চূড়ায় নাকি জয়লক্ষ্মী রাজে।
রকপাখীদের বাসায় নাকি আছে পরশ-পাথর,
অবহেলায় আন্‌বি তোরা—হবি না কাতর।

১৩৪৫

১৩৭৭

এ গল্পটা আমার বানানো নয়, সত্যি গল্প। বলেছিল আমার ভাগ্নে নিত্যহরি। বলেছিল—

'ভোজন বিলাসী অনেকেই থাকে। ভোজনের ব্যাপারে খুঁৎ ঘটলে খুঁৎ-খুঁতুনির আর অন্ত থাকে না তাদের। তেমন তেমন হলে তো খুনই চেপে যায় মাথায়।

যেমন হয়েছিল আমাদের গ্রামের একদার জমিদার বংশধর শ্যামরতন গাঙ্গুলীর। শ্যামরতনের ফাঁসিতে লটকাবার কারণই তো ওই।

ভোজন বিলাস!

না, ফাঁসির খাওয়া খেয়ে মরেন নি শ্যামরতন, তেমন স্থূল বিলাস ছিল না তাঁর, ছিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার। শ্যামরতনের নাক আর জিভ ছিল আনবিক শক্তি সম্পন্ন। শ্যামরতন ভাত খেয়ে ধরে ফেলতে পারতেন ওই ভাতের চালের জন্মস্থান কোনো শ্মশানের ধারে কাছের ধান ক্ষেত কিনা। কারণ তেমন হলে তিনি নাকি ভাতে মড়াপোড়া মড়াপোড়া গন্ধ পেতেন। পায়েস খেয়ে ধরতে পারতেন শ্যামরতন সেই পায়েসের দুধের উৎস স্থল গোমাতাটি ঘাস খেয়েছিল না বেলপাতা খেয়েছিল। বেলপাতা খেলে শ্যামরতন পায়েসে তিক্তস্বাদ পেতেন।

সেই আনবিক অনুভূতিই কাল হয়েছিল তাঁর!

একদিন খেতে বসে মাছের কালিয়ার মাছে পেঁকো-পুকুরের গন্ধ পেলেন শ্যামরতন। ব্যাস্, হাত গুটিয়ে ডাক পাঠালেন মাছওলা জেলেকে। তারপর জেরার ওপর জেরা, কোন পুকুরের মাছ ইত্যাদি।

জেলে ছোকরাও একদার প্রজার বংশধর, কিন্তু এখন তাদের ইউনিয়ন হয়েছে, তাই জেরার মুখে চোটপাট জবাব দিয়ে বসলো, হ্যাঁ, পাঁকের পুকুরের মাছই বটে। তা' করবে কি, পুকুরের পাঁকের জন্যে তো আর সে দায়ী নয়।

আর যায় কোথায়!

একে দুপুরের ভোজটি গুবলেট, তার আবার চোটপাট জবাব, ধাঁই করে হাতের কাছের ভারী কাঁসার গেলাশটা ছুঁড়ে বসলেন শ্যামরতন, আর বললে বিশ্বাস করবে না তোমরা, গেলাশ খেয়ে ছোকরা সেই যে রগ চেপে বসে পড়লো, আর উঠল না।

একবাড়ি লোক সাক্ষী, পালাবার পথ রইল না, ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হলো শ্যামরতনকে।

তা' শ্যামরতনের মতন অতো কড়া না হলেও ভোজন বিলাসী অনেক আছে। ওটা অনেকের দেখা। আবার শয়ন বিলাসীও আছে ঢের।

শয়ন বিলাসীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। মশারির বাইরে মশা ঘুরলেও ঘুম ভেঙে যায়, তোষকের নীচে একগাছা চুল থাকলেও ঘুম আসে না, এমন লোক আমার নিজের চোখেই দেখা। এরা জীবনে কখনো শত প্রয়োজনেও অপর কারো বাড়িতে রাত্রিবাস করতে পারে না। এরা শয়ন বিলাসে হানি ঘটবার ভয়ে নিকট আত্মীয়ের ব্যাপারেও রাতের মড়ায় কাঁধ দেয় না, দূরপাল্লায় বিয়েবাড়ি যায় না, আর সাত জন্মেও ভ্রমণে-টমনে বেরোয় না।

রেলগাড়ি এদের কাছে বাঘ।

এরা অদ্ভুত, তবু এরা সমাজ-মান্য ব্যক্তি, এদের পরিচয় অল্প বিস্তর সকলেরই জানা। 'ভোজন-বিলাসী' 'শয়ন বিলাসী' এ-সব শব্দ অভিধানে আছে।

কিন্তু 'মাখন বিলাসী'?

আছে এ-শব্দ অভিধানে?

নাঃ, আমি তো দেখি নি। 'চলন্তিকা' থেকে শুরু করে ঠাকুর্দার আমলের সেই সাড়ে বারোসের ওজনের 'বৃহৎ সটীক বঙ্গাভিধান' পর্য্যন্ত সব হাতড়ে দেখেছি। কোথাও পাই নি এ-শব্দ।

তার মানে আমাদের চাটুয্যেদা স্রেফ স্বয়ম্ভূ।

তবে চাটুয্যেদার এ পরিচয় আমাদের এই পিকনিকের আগের দিন পর্য্যন্ত জানা ছিল না। গোলা গেরস্ত লোক আমরা, কে বা কবে পিকনিক করছে,; কিন্তু কুঁজোরও তো কখনো-সখনো ,চিৎ হয়ে শুতে সাধ যায়? তাই আমাদের এই ভোঁদড় অফিসের কেরাণীদেরও পিকনিকের শখ।

বারাসতে একজন বড়লোকের একখানা 'আরামকুঞ্জ' জোগাড় করা হলো—কোনো একজনের বন্ধুর বন্ধুর তুতোর তুতো মারফৎ। তারপর উৎসাহের ঘটায় পকেট হালকা করে করে চাঁদাও উঠিয়ে ফেলা হলো অনেক। অতঃপর ফর্দ লেখা আর পরিকল্পনা, চলতে লাগলো বেশ ক'দিন ধরে। উৎসাহের

চোটে বুড়োরাও তরুণ হয়ে উঠলো যেন। এরই মাঝখানে বিনামেঘে বজ্রাঘাত! চাটুয্যেদা বলে বসলো, 'ধ্যাৎ বাপু, আমার বোধহয় যাওয়া হবে না।'

যাওয়া হবে না!

কথাটা শুনে ভেড়ার গোয়ালে আগুন লেগে গেল যেন।

সকলে চেঁচিয়ে উঠলাম 'যাওয়া হবে না মানে?'

'মানে?' চাটুয্যেদা একটু লাজুক হাসি হেসে বললো, 'আমার একটু ইয়ে, মানে একটা বদভ্যাস আছে, তোদের তো বলছিস সক্কাল বেলাই বেরোনো—কাজেই—'

'বদভ্যাস! তোমার আবার বদভ্যাসটা কী? নেশা-টেশা কর না কি সকাল বেলা?' রেগে বলি আমরা।

চাটুয্যে দা তেমনি লাজুক হেসে বলে, 'তা' সে একরকম নেশাই। মানে আমি হচ্ছি বুঝলি, একটু মাখন বিলাসী।'

'মাখন বিলাসী! বুঝলাম না!'

'তার মানে?'

'ও হো-হো, সকাল বেলা মাখন খাওয়ার অভ্যাস আছে? হরিনারায়ণ মধুসূদন! এই তোমার সমস্যা?'

মাথা থেকে পাহাড় নামে আমাদের।

সমস্বরে বলি, 'খেও না বাবা, যতো পারো মাখন খেও। বলো, ক' কিলো মাখন নিয়ে যাবো তোমার জন্যে?'

চাটুয্যে দা মাথা নেড়ে বলে, 'না রে বাবা না, খাওয়া-ফাওয়া না! মাখা। যেমন ভোজন, শয়ন, তেমনি আর কি! সকাল বেলা আমি একটু তেল মাখি।'

'তেল মাখো! তা' সেটা আবার একটা ভাববার কথা না কি? কে না মাখে? কখন মাখো?'

'এই মানে সারা সকালটাই! চা খাওয়ার পর থেকে অফিস যাবার আগে পর্য্যন্ত।'

আমরা অবাক না হয়ে পারি না।

বলি, 'সারা সকাল ধরে শুধু তেল মাখো? রোজ?'

'বললাম তো বাপু, আমি একটু মাখন বিলাসী! আমাকে তোরা পিকনিক থেকে বাদ দে।'

চাটুয্যেদাকে বাদ!

যে চাটুয্যেদা চাঁদা দিয়েছে সব থেকে বেশী!

আমিই আবার কর্মকর্তা দি প্রধান কিনা, তাই তেড়ে উঠে বলি, 'বাদ? অসম্ভব কথা বোলো না চাটুয্যেদা! সারা সকালই তেল মেখো তুমি বাবা! যতোক্ষণ না খিচুড়ি, মাংস নামে ততোক্ষণ ধরেই মেখো। মোটকথা, বাদ কাউকেই দেওয়া হবে না। তোমায় তো প্রশ্নের বাইরে।'

চাটুয্যেদা অন্যমনা গলায় বলে, 'তাই বলছিস?'

'বলছিই তো!'

'বেশ ঠিক আছে। তোদের যখন এতো ইচ্ছে! রওনাটা কখন?'

'ওই তো ভোর সাড়ে পাঁচটায়! অফিস ভ্যানটাই পাওয়া যাবে, বলে রেখেছি ড্রাইভারকে। রোজ যেমন যেমন সবাইকে তোলে সেইভাবে তুলে শ্যামবাজার থেকে মাংস, মিষ্টি আর দই কিনে সোজা এগিয়ে যাওয়া।'

'এতো সব করবি?'

চাটুয্যেদা বিপন্নভাবে বলে, 'পোঁছতে তো তা'হলে অনেক দেরী হয়ে যাবে?'

'দেরী আবার কিসের? শ্যামবাজার থেকে বারাসত আবার কতোটুকু? সাড়ে ছটার মধ্যে পোঁছে যাবো।'

'ঠিক আছে।'

এবার চাটুয্যেদার কণ্ঠ প্রীত।

'তাহলে আর অসুবিধে নেই। সাড়ে ছটাতেই শুরু করি আমি। ওটাই আমার টাইম।'

কিন্তু কে জানতো চাটুয্যেদার 'সুবিধে অসুবিধের' আর 'টাইমের' কাঁটা স্যাকরার দোকানের নিক্তির কাঁটা!

যতোই হোক বেড়ানোর ব্যাপার তো! অফিস টাইমের মতো মার মার কাট কাট কী হয়? হয় না। পাঁচজনের দরজায় পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে দাঁড়াতেই দেরী। চাটুয্যেদার দরজায় গিয়ে যখন দাঁড়ালাম তখন ছটা বাজে।

জোরে জোরে হাঁক পাড়ি, 'চাটুয্যেদা, বেরিয়ে এসো।'

বেরিয়ে আসে চাটুয্যেদা।

খালি গা, পরণে লুঙ্গি।

'একী চাটুয্যেদা? এখনো তৈরী হও নি?'

'হয়েছিলাম!' চাটুয্যেদা নির্লিপ্ত গলায় বলে, 'ছেড়ে ফেললাম! তোদের তো বিস্তর দেরী হয়ে গেল।'

'বিস্তর দেরী? কই না তো? মাত্র তো সাড়ে পাঁচটার জায়গায় ছটা। সাত ঘাটের মাছ এক ঘাটে করা, আধ ঘন্টাটাক দেরী আর এমন কি? নাও নাও, জামাটা গায়ে দিয়ে এসো।'

'নাঃ!'

চাটুয্যেদা অঙ্ক কষার ভঙ্গীতে বলে, 'এখান থেকে তোরা এখনো গ্রে স্ট্রীট থেকে চৌধুরীকে নিবি, তারপর শ্যামবাজার থেকে মাংস কিনবি, দই-মিস্টি কিনবি, তারপর—ওঃ, অসম্ভব। সাড়ে ছটা তো বাজবেই বাজবে। টাইম পার হয়ে যাবে।'

'কী মুস্কিল! তেল মাখা তো আর ক্যাপসুল খাওয়া নয় গো, না হয় আধঘন্টা দেরীই হলো।'

'পাগল!' চাটুয্যেদা মাথা নাড়ে, 'তা হয় না।'

অন্যপথ ধরি। বলি, 'তার মানে এই আধঘন্টা দেরীর জন্যে তুমি আমাদের এতোবড় একটি শাস্তি দিচ্ছো?'

এবার যেন একটু কাজ হয়।

মানে আসলে তো লোকটা ভালো, ওই 'মাখন বিলাস'ই ওকে উল্টোপাল্টা করে দিয়েছে।

বিব্রতভাবে বলে চাটুয্যেদা, 'আঃ, ছি ছি! এ কী বলছিস! মানে ব্যাপারটা কী জানিস?'

'জানি, সব জানি। তুমি উঠে এসো তো। নচেৎ ওই খালি গা অবস্থাতেই তোমায় আমরা পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যাবো।'

আমাদের এই ডাকাতি মনোভাব দেখে বোধকরি ভয় হয় লোকটার। তাড়াতাড়ি বলে, 'না বাবা না, জামা পরে আসছি। তবে ব্যাপারটা কী জানিস?'

আমরা সমস্বরে বলি, 'জানি জানি। তুমি একটু মাখন বিলাসী এই তো। আমরা সবাই মিলে না হয় চাঁদা করে তোমায় তেল মাখিয়ে দেব! হলো তো?'

কিন্তু প্রশ্ন তো মাখিয়ে দেওয়ার নয়, প্রশ্ন হচ্ছে টাইমের। চাটুয্যেদার সেই টাইমটা হচ্ছে সাড়ে ছটা। যখন আমরা মাংসের দোকানে বকাবকি, চেঁচামেচি জুড়েছি। জুড়তে তো হবেই নইলে আর পিকনিকের আমোদটা কী? চল্লিশ না হলেও চব্বিশটা দস্যু তো ঝাঁপিয়ে পড়েছি গিয়ে দোকানে। ফুর্তির বান ডাকছে তখন। অতএব দোকানীকে নিয়েই মস্করা-ঠাট্টা, 'কী বাবা? পাঁঠার গলা না কেটে আমাদের গলাগুলোই কাটছ যে! ও কী ওজন হচ্ছে? বলি মেটেগুলো সরাচ্ছো কেন? বেশী দামে বেচবে বলে?···ওহে ভাই, পাঁঠাটা বোকা পাঁঠা নয় তো? দেখো খেয়ে আবার সবাই মিলে বোকা হয়ে না যাই,···ইত্যাদি প্রভৃতি বুনো গাঁইয়া রসিকতা। ···কসাইয়ের সঙ্গে আর কীই বা উচ্চাঙ্গের রসিকতা হবে!

একই পদ্ধতিতে দই-মিষ্টি, মিঠে পান, কলাপাতা ইত্যাদি কিনে উল্লাসধ্বনি করতে করতে আমরা যখন বারাসতের সেই আরামকুঞ্জে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন আটটা দশ। দেখি চাটুয্যেদা মলিন মুখে নির্জীবের মতো বসে পড়েছে একপাশে।

জোর গলায় বলি, 'কই চাটুয্যেদা লেগে যাও?'

চাটুয্যেদা সর্বহারা গলায় বলে ওঠে, 'আর লেগে যাওয়া। দু'দিক থেকে সর্বনাশ হয়ে গেলো।'

'দু'দিক থেকে সর্বনাশ সেটা কী জিনিষ!'

'কী আবার! একদিকে দেড়ঘন্টা লেট্, অপরদিকে আমাদের তাড়নায় তেলের শিশি আনতে ভুল!'

'তেলের শিশি!'

'কী তেল তুমি গায়ে মাখো চাটুয্যেদা?'

'গায়ে আর কী তেল মাখবো? সরষের তেলই মাখি।'

'তবে? তবে চিন্তাটা কিসের? রান্নার জন্যে তো আমাদের পাঁচসেরি টিন এসেছে।'

'তাতে আর আমার কী কাঁচকলা?' চাটুয্যেদা উদাত্ত গলায় বলে, 'তার তো এক ভাগ সরষে আর তিনভাগ ভেজাল!'

'বল কী চাটুয্যে দা, আমরা কি কলের তেল এনেছি? গনেশতেলের টিন—!'

'আরে রেখে দে তোদের কার্ত্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী!'

চাটুয্যে দা এবার খিঁচিয়ে ওঠে, 'দেখতে আর বাকি নেই কাউকে! মূলোর রস আর লঙ্কা গুঁড়োর ঝাঁজের ভেজাল মেরে—'

'তাহলে তুমি কী তেল মাখো?'

হতাশ হয়ে বলি।

'কী তেল ? চাটুয্যে দা গর্বিত ভঙ্গীতে বলে, 'খাঁটি রাই সরষে কিনে বাড়িতে পিষে তেল তৈরী করে নিই। মানে তোদের বৌদি করে দেয়।'

'তার মানে, তোমার মাখন বিলাসের দাপটে বেচারা বৌদির হাড়ও পেষে ?'

'হাড় আবার পেষা কী ?' চাটুয্যে দা ক্রুদ্ধ গলায় বলে, 'হিন্দুনারী স্বামীর জন্যে এটুকু করবে না ? আর কতোই বা তেল মাখি আমি ? দৈনিক তো মাত্র আধপোয়া।'

'আধপোয়া ! আধপোয়া করে তেল মাখো তুমি ?'

চাটুয্যে দা করুণ স্বরে বলে, 'ওর বেশী আর কোথায় পাবো বল ?'

'পাওয়ার কথা হচ্ছে না। অফিসের বেলায়—'

'অফিসের বেলায় তা কি ? ওই তেল টুকুর জোরেই তো দাঁড়িয়ে আছি। তোদের পাল্লায় পড়ে আমার আজ সর্বনাশ হয়ে গেল। এমন তাড়া দিলি।'

আমরা জোর দিয়ে বলি, 'একটা দিন গণেশ মাখলে কিছু নাশ হবে না চাটুয্যে দা, তোমার সোনার কান্তি সোনারই থাকবে। এসো টিন খুলি।'

'কিন্তু টিন খুললে আর কী হবে ? মন খোলে কই ? মনে যে সীল মারা। জব্বর সীল।'

মাটির গেলাসের এক গেলাস তেল নিয়ে বসে তো পড়ে চাটুয্যেদা কিন্তু মাখে কই ? বারবার কেবল নাকের কাছে তোলে আর নাকটা কুঁচকে নামিয়ে রাখে।

'কী হলো চাটুয্যে দা ? শুরু করো ?'

'শুরু ? ভাবছি—'

চাটুয্যে দা হঠাৎ যাকে বলে নিদ্রোত্থিতের মতো চমকে উঠে বলে, 'তোদের ওদিকে কদ্দূর ?'

'এই তো উনুনে আগুন পড়লো।'

'রান্নার মেনু টা কী ?'

'রান্নার ? খিচুড়ি, মাংস, আলুরদম, পাঁপরভাজা, চাটনী !'

'ঠিক আছে !'

চাটুয্যেদা উল্লাসের গলায় বলে, 'হয়ে যাবে। তোদের হতে হতে আমি এসে যাবো।'

'কোথা থেকে এসে যাবে ?' আমরা হাঁ।

'তেলটা নিয়ে বাড়ি থেকে।' প্রসন্নবদনে উদাত্ত গলায় বলে ওঠে চাটুয্যেদা।

'তেলটা নিয়ে বাড়ি থেকে ! মানে পার্কসার্কাস থেকে ! চাটুয্যেদা তুমি আমাদের সঙ্গে মস্করা করছো, না পাগল হয়ে গিয়েছো ?'

'আরে বাবা, মস্করাও নয়—পাগলও নয়, দিব্যি শাদা বাংলাই বলছি। দেখ না, যাবো আর আসবো।'

'বারাসত থেকে পার্কসার্কাস, তুমি যাবে আর আসবে?'

'আরে বাবা দেখ না। তোদের হাতের রান্না তো! তার মধ্যে তিনবার যাওয়া আসা হয়ে যাবে।'

'চাটুয্যেদা পাগলামী করো না।'

'কী মুস্কিল! পাগলামীও নয়, মাতলামীও নয়, স্রেফ্ শাদা বাংলা।'

'কিন্তু তোমার টাইম?'

'সে তো অনেকক্ষণ আগেই ব্রহ্মপুত্রের জলে তলিয়ে গেছে। এখন আর একটা দিক রক্ষে করার চেষ্টা করতে হবে তো? মুলোর রসটা না মেখে একটু খাঁটি তেল—'

জুতাটা পায়ে গলিয়ে বীর বিক্রমে এগিয়ে যায় চাটুয্যেদা আলো আলো মুখে।

চব্বিশজন দস্যু চব্বিশ দিগুণে আটচল্লিশ বার বারণ করলাম, চাটুয্যেদা অটল।

'অতো ঘাবড়াচ্ছিস কেন? দেখ না, যাবো আর আসবো।'

তারপর আর কি!

গেছে, আর আসছে—মানে আসছেন। মাংস নামলো, খিচুড়ি নামলো, আলুরদম, চাটনী সব নামলো, চাটুয্যেদার দেখা নেই।

এদিকে উনুন নিবে আসছে। তার সঙ্গে উৎসাহও।

তবে পাঁপরগুলোও ভাজা হোক। নেভাগনার প্রস্তাব। উত্তর—হোক!

পাঁপরগুলো তো নেতিয়ে যাচ্ছে, তবে পাতাগুলো পাতা হোক। উত্তর—হোক।

মাংসটা ততোক্ষণ ভাগ করা হোক!

—হোক।

কী করা যায় অতঃপর?

খিচুড়িটা হাতা হাতা পাতায় দেওয়া হোক।—হোক।

দু' একজন বাদে বাকি সবাই বসে পড়া হোক।—হোক। পেট তো চুঁই-চুঁই। খাওয়া আরম্ভ হোক!

--হোক!

গোড়ায় না হয় একটু একটু চাটনী চাটা হোক।

—তাই হোক।

আরও কিছুক্ষণ পরে—বাকি জনেদের যখন পেট কাঁদছে! প্রস্তাব হলো কাক এসে ছড়াছড়ি করছে, বাকি জনেরাও বসে পড়ুক।

—পড়ুক। আর অপেক্ষার মানে হয় না। মানে হয় না।

কী কেলেঙ্কারী! কী কেলেঙ্কারী!

কী যাচ্ছেতাই! কী যাচ্ছেতাই!

কী হোপলেস। কী হোপলেস!

ব্রেণের ডিফেক্ট আছে।…নির্ঘাৎ!

স্ক্রু ঢিলে আছে।…নিশ্চয়।

বৌদি ছাড়ে নি, বোধ হয়।

তাই সম্ভব।

খেয়ে-দেঁয়ে ঘুম মারছে!

তাই সম্ভব!

যাবার সময় ওর ভাগের খাবারটা গাড়িতে তুলে নিয়ে ওর বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া হোক।

—হোক!

ডেকচির তলা চেঁচেপুঁছে যখন দই-মিষ্টির খালি হাঁড়িতে ভরে ফেলা হয়েছে, তখন হঠাৎ ওদিকে কোথায় সোরগোল ওঠে।—'এসেছে এসেছে!'

'কে এসেছে? ড্রাইভার?'

'আরে ড্রাইভারের জন্যে কে মরছে? এসেছে চাটুয্যে দা।'

এই মার সেই মার করে তেড়ে যাই আমরা, 'এই তোমার যাবো আর আসবো ?'

চাটুয্যেদা লাজুক হাসি হেসে বলে, 'তেলটা হাতে নিয়েই দারুণ লোভ এসে গেল বুঝলি ? ভাবলাম মেখেই যাই। মানে আর কি—'

কিন্তু কে তখন তার মানে কানে নেয় ? সামান্য একটু তেল মাখার জন্যে নিজের তো বটেই। এতগুলো লোকের আমোদ মাটি করলে তুমি ? এই অভিযোগ নিয়ে তো ঝাঁপিয়ে পড়েছি সবাই একযোগে।

চাটুয্যেদা নির্বিকার !

আলো আলো মুখে বলে, 'সামান্য কি অসামান্য সে তোরা কি বুঝবি ? অতোক্ষণ বিরহের পর শিশিটা দেখে ফুর্তির চোটে তিন দিনের তেল এক দিনেই মেখে ফেললাম ! বলেই তো ছিলাম বাপু, আমি একটু মাখন বিলাসী।'

১৩৭৬

★

অভিমান

—শ্রীগোপাল ভৌমিক

কালের নাকি আকাল বড়,
দেয় না পুরে রেশন ;
ভাত না খেয়ে রুটি খাওয়া
তাই শহুরে ফ্যাশন।
প্রায় প্রতিদিন থাকে সাথে
শুকনো আলুর দম ;
খেতে খোকা চায় না মোটেই,
খেলেও খায় সে কম।
কালে ভদ্রে মাংস হলে
রুটির কদর বাড়ে,
দু'চার গণ্ডা সাবাড় করে
চাইবে খোকন আড়ে।

এমন কেন রোজ হয় না
নিজের মনেই ভাবে
মাংসটা তো হয় নি রেশন
মনের মতন খাবে।
মনের কথা মনেই থাকে,
আলুর দম ও রুটি
নিত্য দিনের বাঁধা খোরাক
পায় না বিশেষ ছুটি।
মা-র পরে রাগ বেড়ে যায়
বাবাও পড়েন কোপে,
এ দেশ ছেড়ে যাবেই চলে
যাবেই সে ইউরোপে।

১৩৭৬ ১০.

★

রাতের গাড়ি ধরতে অসীমের খুব উৎসাহ ছিল না, কিন্তু না গিয়েও উপায় রইল না। এখানে আপিস করে, বাড়ি গিয়ে কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা গুছিয়ে, চারটি খেয়ে নিয়ে, কোনো রকমে দিদিমা, মা, গিন্নি আর ছোট মেয়েটার পরামর্শ এড়িয়ে, হন্তদন্ত হয়ে এই গাড়ি ধরা। চন্দনপুরে নামার কথা রাত এগারোটায়। এসব অঞ্চলে আটটার সময়ই মাঝরাত। স্টেশনে নাকি লোক থাকবে। কাছেই সরকারি বাংলো। সেখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে। ধনেশবাবু বিছানা মশারির ব্যবস্থা করবেন জানিয়েছেন। খাওয়াদাওয়াটাও মন্দ হবে না মনে হয়। সারাদিন তথ্য সংগ্রহ আবার রাতের গাড়িতে ফেরা। ছোকাইয়ের সঙ্গে যাবার কথা ছিল। কিন্তু সে সকালে বর্ধমান গেছিল, সন্ধ্যে অবধি ফেরে নি।

চন্দনপুর জায়গাটা একেবারে নতুন নয়। আরেকবার গেছিল ওখানে অসীম, আদম-সুমারির সময়। গাঁয়ের লোকরা সেবার খুব খুসি হয় নি। মাথা গোণা তারা পছন্দ করে না। গুণলে নাকি কমে যায়। এক দুই তিন চার না বলে, রাম দুই তিন চার বলতে হয়। জিজ্ঞাসা করলে কোন বাড়িতে কটা মানুষ বলতে চায় না। হয় একটা বাড়িয়ে, নয় একটা কমিয়ে বলে। পুকুরঘাটে গিয়ে দেখে আসতে হয় কটা থালা মাজা হচ্ছে। ঝামেলার এক শেষ। তার উপর এবার একা খাওয়া, অর্ধেক মজাই মাটি। তবু আপিসের কাজের মধ্যে ঐ একটু বৈচিত্র্য হয়, বাড়ি থেকে একটু বেরুনো হয়।

গাড়ি এল দুই ঘণ্টা দেরি করে। ততক্ষণে প্ল্যাটফর্মে পাইচারি করে করে পায়ের গুলিতে ব্যথা ধরে গেছিল। তিন মিনিট থামার কথা, থামল প্রায় পাঁচ মিনিট। লেট হবে না তো কি তবু তাড়াতাড়ি করতে হয়, নইলে ভালো জায়গা সব সময় পাওয়া যায় না। তবে আজকের কথ আলাদা, প্ল্যাটফর্মে জনমানুষ নেই, রেলের লোকরা ছাড়া।

তার উপর সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রীরা ভিতর থেকে দরজা এঁটে শুয়ে থাকে। ধাক্কা দিয়ে খোলাতে হয়, তাও সব সময় খোলে না। তখন গার্ডকে ডাকতে হয়। আজ কিন্তু গাড়ি থাম মাত্র দুটো কামরায় হতাশ হয়ে, তৃতীয় কামরার হাতল ঘোরাতেই দরজা খুলে গেল। অসীম তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে সীটে বসে পড়ল।

এদিকের জয়গা খুব ভালো না; একা রাতে যাতায়াত করলে দরজা খুলে রাখা একটুও নিরাপদ নয়। এক রকম একাই বলতে হবে, কারণ ও ধারের বেঞ্চিতে মাথা অবধি চাদর ঢাকা দিয়ে যে লোকটা শুয়ে আছে, তাকে কিছু দ্বিতীয় ব্যক্তি বলা চলে না। কেউ ঢুকলে সে টের-ও পাবে না এই যে অসীম ঢুকল, একবার চোখ খুলে তাকাল না পর্যন্ত।

আলোটা বেজায় মিটমিটে। গাড়ির বেগ বাড়লে তবু কিছু দেখা যায়, কমলে প্রায় অন্ধকার সবে গাড়ি ছেড়েছে; তার মানে ঘণ্টা তিনেক জেগে বসে থাকতে হবে। ঘুমোলে কিছুই বিশ্বাস নেই; অসীম নিজের ঘুম জানে, সকালের আগে ভাঙবে না। অথচ পকেটে 'হাবসির-ডাইরি বই'টা থাকা সত্ত্বেও এত কম আলোতে পড়া অসম্ভব। বইটাতে মরুভূমির অদ্ভুত বর্ণনা আছে। শ্যামরতনদার বই; পর্যটকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। ভয়ঙ্কর সব সত্যি কথায় ভরা। ঐ সব জায়গা শ্যামরতনদা নিজেও গেছেন।

অদ্ভুত মানুষ উনি; নাইরোবিতে জন্ম, ছেলে বেলাটা কেটেছে—আফ্রিকার মালভূমিতে হিমালয় দেখার আগে কিলিমাঞ্জারো দেখেছেন! ছোট বেলায় এক পাল সত্যিকার অ্যান্টেলোপ হরিণ দেখেছিলেন। বন থেকে বেরিয়ে ঘাড় তুলে দলে দলে দৌড়ে এল; তারপর মানুষদের বাড়ি চারদিকে বেড়া দেওয়া দেখে, এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে, অমনি ঘুরে, বনের মধ্যে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। সে দৃশ্য ভুলবার নয়।

শিম্বা বলে একটা রেল স্টেশন আছে ওখানে, সেখানে রাতে কোনো গাড়ি যায় না। কারণ প্ল্যাটফর্মে সিংহরা হেঁটে বেড়ায়। শিম্বা মানেই সিংহ। গাড়িগুলো একটা স্টেশন আগে পৌঁছে ভোরের জন্যে অপেক্ষা করে। শ্যামরতনদাকে হিংসে করার কথা অসীমের কখনো মনে হয় নি, কিন্তু ওঁর অভিজ্ঞতার এক তিলও যদি অসীমের হত, তা হলে কি ভালোটাই না হত। তবে ঐ রকম সাহস-ও থাকা চাই।

বাইরেটা এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বাধ্য হয়ে অসীম গাড়ির ভিতরটাকে নজর করে দেখছিল। এর মধ্যে ঘণ্টাখানেক কেটে গেছিল; লোকটা তেমনি মাথা থেকে পা অবধি

ঢাকা অবস্থায় শুয়ে ছিল। এতটুকু নড়ছিল না। অবাক হয়ে অসীম ভাবছিল এতখানি সময় গেল একবারও নড়ল না কেন। ততক্ষণে কম আলোতে চোখ দুটোর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। একটু অস্বস্তি লাগছিল। একেবারেই নড়ে না কেন? লোকে তো ঘুমিয়েও হাত পা নাড়ে, একটু আধটু নাক ডাকায়। এ একেবারে স্থির হয়ে আছে কেন? ক্রমে একটা বিকট সম্ভাবনার কথা অসীমের মনে এল। লোকটার বুকটাও তো কই উঠছে পড়ছে না। তবে কি—তবে কি!

সত্যেনদা একবার এইরকম একা অন্ধকার রেলগাড়িতে উঠেছিল। গাড়িতে জনমানুষ নেই, তবু কেমন ভয় করতে লাগল। দরজা এঁটে বন্ধ করেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে, বাথরুমের দরজাটা খুলে দেখল। কই, কেউ নেই তো। তারপর বেঞ্চির তলায় তাকিয়ে হাত-পা হিম। চাদরে জড়ানো মানুষের মতো মনে হচ্ছে। জ্যান্ত হলেও বিপদ আর যদি জ্যান্ত না হয়, তা হলে? ভাগ্যিস সেই সময় ঘ্যাঁচ করে অ-জায়গায় গাড়ি থেমে গেল। সত্যেনদা কোনো রকমে সাহস সঞ্চার করে, দরজা খুলে ঝুপ করে নিচে নেমে, পাশের থার্ড ক্লাস গাড়িতে উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সে গাড়ির কেউ এতটুকু অবাক হল না; তারাও টিকিট না কেটে এইরকম লুকোচুরি করে যাতায়াত করে।

অসীম ভাবল অন্য গাড়িতে যেতে পারলে বেশ হত। কিন্তু এই ট্রেণটা চন্দনপুরের আগে কোথাও থামে না। অসীম চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। হঠাৎ শ্যামরতনদার নিজের অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল।

শ্যামরতনদ তখন সবে আফ্রিকা থেকে এদেশে এসেছেন। অনেক কষ্টে এক চাকরিও জোগাড় করেছেন। যে-সে চাকরিও নয়, বিহারের দুর্গম বনভূমিতে খনির কাজ। সেখানে পথঘাট, লোকালয় ইত্যাদি কিছু নেই। আছে শুধু ঘন গাছপালা, বুনো জানোয়ার, সাপ আর অজস্র ম্যালেরিয়ার মশা। তবে এসব সামান্য জিনিসে দমে যাবার ছেলে শ্যামরতনদা ছিলেন না। যদিও তখন বয়সটা নেহাৎ কাঁচা ছিল। এখন অসীমের যে বয়স, তার চেয়েও অনেক কম।

অন্য গাড়ির অভাবে এই রকম একটা রাতের গাড়ি ধরতে হয়েছিল। আজ অসীমকে যেমন রাত একটায় নামতে হবে, শ্যামরতনদাও তেমনি একটায় নেমেছিলেন। অসীমকে নিতে লোক আসার কথা; কিন্তু শ্যামরতনদাকে নিতে কেউ আসেও নি, আসার কথাও ছিল না।

নেমে দেখেন ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিক। ছোট্ট একটা স্টেশন মাস্টারের ঘর, তেলের বাতি হাতে একটা দুটো লোক আর স্টেশন মাস্টার। গাড়ি পাস্ করিয়ে তারা অসীমকে দেখে অবাক। কাল সকালের আগে তো আর গাড়ি নেই। খনিতে যাবেন? তা হলে তো লরিতে যেতে হবে। খনি থেকেই লরি আসে, কিন্তু আজ তাও আসে নি। রাত কাটাবার একটা জায়গাও নেই; খুদে ঘরটাতে লোকদুটো কোনোরকমে শুয়ে থাকে। স্টেশন মাস্টার তাঁর ছোট্ট কোয়ার্টারে চলে যান। পরিবার আছে। তবে এই শীতে নেহাৎ যদি—।

শ্যামরতনদা জিব কেটে বললেন, 'তাই কখনো হয় ? আমার জন্যে ভাববেন না, আমি প্ল্যাটফর্মে পাইচারি করেই সময় কাটিয়ে দেব। সঙ্গে মোটা কোট আছে আর এইটুকু কষ্টে আমার অভ্যাসও আছে।'

শেষ পর্যন্ত স্টেশনমাস্টার বাড়ি চলে গেলেন। অন্য লোকদুটো খুদে স্টেশনঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আলোটা একটা হুকে টানানো রইল। শ্যামরতনদা পাইচারি করতে লাগলেন। আলোর সামনে থেকে প্ল্যাটফর্মের শেষ অবধি হাঁটেন, আবার ফিরে আসেন। প্ল্যাটফর্মের শেষের দিকে যেখানে কষ্ট করে দেখতে হয়, সেখানে একটা বেঞ্চি। শ্যামরতনদা অবাক হয়ে দেখলেন, তার উপরে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা লোক ঘুমুচ্ছে।

ঘন্টাখানেক পায়চারি করে, আর পারলেন না শ্যামরতনদা। সারাদিন বড় বেশি ধকল গেছে; বিশ্রাম বা খাওয়াদাওয়া ভালো করে কিছুই হয়নি। শেষ পর্যন্ত ঘুমন্ত লোকটাকে প্রথমে ডেকে, তারপর ঠেলে জাগাতে চেষ্টা করলেন। ব্যাটা এতটুকু সাড়া দিল না, সাক্ষাৎ কুম্ভকর্ণ।

তখন আর কি করেন, ওর পা দুটোকে একটু ঠেলে, জায়গা করে নিয়ে বসে পড়লেন। সঙ্গে কেক ছিল। অন্ধকারে তার খানিকটার সদ্গতি করলেন। ফ্লাস্ক থেকে জল খেলেন। তারপর বসে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙল ভোর বেলায় লোকজনের হাঁক ডাকে। উস্কো খুস্কো চুল নিয়ে স্টেশন মাস্টার তাঁকে টেনে তুললেন,। 'কি সর্বনাশ! উঠুন, উঠুন!'

'কি? কি হল? লরি এসে গেছে বুঝি?'

'তা এসে গেছে সত্যি, কিন্তু আপনার তো বেজায় সাহস, মশাই ! একটা মরা মানুষের গায়ে ঠেস দিয়ে দিব্যি সুন্দর রাত কাটালেন ! দূরে সরিয়ে রাখা হল, লোকজন, সকালে এসে নিয়ে যাবে আর আপনি কি না—বলিহারি মশাই !

শ্যামরতনদা দেখেন বাস্তবিকই তাই। কিন্তু কি আর এমন ক্ষতিটা হয়েছিল তাতে ? এই ভেবে অসীম জোর করে ওর গাড়ির সেই লোকটার দিকে চোখ ফেরাল। এখনো ঠিক তেমনি শুয়ে আছে, এতটুকু নড়ে নি। কি করা যায় ?

হঠাৎ আলো দেখা গেল, লোকজনের গলার আওয়াজ শোনা গেল। গাড়িও ঘচ করে থেমে গেল। চন্দনপুর এসে গেছে। অমনি সেই লোকটাও তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, হাঁচড়পাঁচড় করে জিনিস পত্র গোছাতে গোছাতে বলল, 'হাঁ করে দেখছিস কি ? তিন মিনিট থামে।'

লোকটা অসীমেরি আপিসের ছোকাই। বর্ধমান থেকে এই গাড়িটা ধরে ছিল।

১৩৭৫

লেখা শেখা

বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

খোকাবাবুর অ, আ, লেখা
চলছে আজ ক'দিন শেখা।
বাবার ছাতায়, দাদার খাতায়
লেখা তাহার ডিগ্‌বাজি খায়।
চড়ে মায়ের নোতুন শাড়ী
চলল লেখা ধোপার বাড়ী।
ঘরের মেঝেয়, পথের ধারে
খোকার লেখা উঁকি মারে।
এবার লেখা লিখবে কোথা ?
তাই তো খোকার আকুলতা।
হঠাৎ খোকা চলল ছুটে,
মুখে হাসির রেখা ফুটে।
বাহির ঘরে বামুন ঠাকুর
নাক যে ডাকায় সারা দুপুর।
লিখে অ, আ, তাহার টাকে
খোকা হেসে জড়ায় মাকে।

১৩৭৯

বুড়ো জহুরী তার ছোট ম্যাগনিফায়িং গ্লাসটাকে চোখের সামনে তুলে ধরে, জিনিসটার উপর আল্‌তো করে ঠেকিয়েই চম্‌কে উঠল। তারপর মুখে একটা শব্দ করে ঐ ঝকমকে সবুজ লম্বা ধরনের বড় পান্নাটার উপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত সে তার ড্রয়ার টেনে নিকৃতিটা বার করে ওজন করল সেটা এবং ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বার বার দেখতে লাগল তার জেল্লা। অসম্ভব রকমের বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে।

ফ্রাঙ্ক আর শেপার্ড অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসেছিল। এবার ফ্রাঙ্ক বললে, তা হলে কি মনে হচ্ছে আপনার ?

জহুরী মুখ তুলে বললে, কি আর বলব, বলতে গেলে বলতে হয়, এ হচ্ছে সত্যিকার সাত রাজার ধন এক মাণিক !

তার মানে ? কত দাম হতে পারে এর ?

ঠিক কত অবশ্য বলতে পারব না।—বুড়ো মিটমিট করে চেয়ে বললে, সচরাচর যে ধরনের পান্না আমরা দেখে থাকি, এটা মোটেই সে জিনিস নয়। পুরো ন' ক্যারেট এর ওজন ; তা ছাড়া জেল্লাও অত্যন্ত বেশী এবং বেদাগ।

তবু আন্দাজে বলুন, কি রকম দাম হতে পারে এটার ?—শেপার্ড বললে।

তা যদি বলেন তা হলে বলি—জহুরী বললে, এই হারটার লকেট ছাড়া চারদিকে এর যে ছ'টা

পান্না দেখছেন, এগুলোর প্রত্যেকটা অন্ততঃ হাজার ডলার দামে আমিই কিনে নিতে পারি। তা ছাড়া এই বড় পান্নাটার দাম হওয়া উচিত প্রায় কুড়ি হাজার ডলারের মত। তবে পক্ষে আমার এ দাম দিয়ে এখন ওটা নেওয়া সম্ভব হবে না।

একটু থেমে জহুরীটি আবার বলতে লাগল—আমি অনেক দিনের লোক স্যার, হারটার প্যাটার্ন দেখে আমার মনে হচ্ছে, এটা পেরুর ইন্‌কা রাজবংশেরই প্রাচীন হার। আমার আরো মনে পড়ছে, রাজা আটাহুয়েলপার সময়ে রাজকোষ থেকে যে ধরনের একটি হার চুরি গিয়েছিল, এটি সম্ভবতঃ সেই হার! যদি কিছু মনে না করেন স্যার, তা হলে জিজ্ঞাসা করি—আপনারা এটা কি করে পেলেন, বলতে বাধা আছে কি?

'ইন্‌কা'রাজের বহু মূল্যবান প্রাচীন নেকলেস
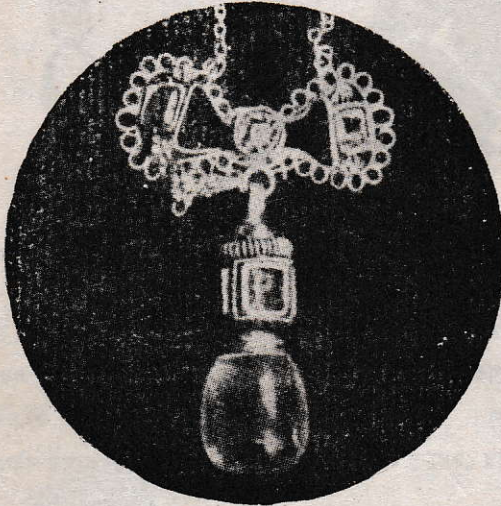
দেখুন, এটা ঠিক আমার নিজের সম্পত্তি নয়—শেপার্ড বললে, আমার এক বৃদ্ধা আত্মীয়া এটা আমায় দর যাচাই করার জন্য দিয়েছেন, এবং তিনি তাঁর নাম বলতে বারণ করেছেন। তা, এর দামটা সম্বন্ধে আপনার মতামতটা একটু লিখে দিন না।

দাম লেখা ছোট্ট টুক্‌রো কাগজটা হাতে নিয়ে বাইরে এসেই লাফিয়ে উঠল ফ্রাঙ্ক। ভাবল, শেষে কি পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে এসে ভাগ্য ফিরল তাদের!

এখানে ফ্রাঙ্ক ও শেপার্ডের পরিচয়টা একটু দেওয়া দরকার। ফ্রাঙ্ক লোকটার পুরো নাম ফ্রাঙ্ক ড্রপ্‌র, বয়স একত্রিশ। থাকত আরিগনে। হঠাৎ কাগজে দক্ষিণ আমেরিকার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অতি মাত্রায় কৌতূহলী হয়ে, জীবনের সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষ করে বেরিয়ে পড়ে একটা ছোট 'এরোনিকা' প্লেনে। আসলে সে যেতে চেয়েছিল পেরুর আরকুইপাতে, কিন্তু গুয়েকুইল-এ পৌঁছেই তার হাতের পয়সা গেল সব ফুরিয়ে! ফলে, এইখানেই থেকে বছর তিনেক ধরে একটা ছোটখাটো কাজ করছে। কিন্তু জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে প্রচুর। এই হ'ল মোটামুটি ভাবে ফ্রাঙ্কের পরিচয়।

আর শেপার্ড হ'ল একজন লেখক। যদিও অন্য অনেক কাজ তাঁর আছে, কিন্তু ধনসম্পত্তি উদ্ধারের ঝোঁকটাই তার সবচেয়ে বেশী।

আসলে, জিনিসটা কিন্তু শেপার্ড-এরও নয়, শেপার্ডের বউ-এর এক আত্মীয়ার। আত্মীয়াটি

বিরাট ধনসম্পত্তির মালিক ; নাম সিনোরা অ্যাকোস্টা। এক ভদ্রলোক সিনোরার কাছ থেকে কিছু জমি কিনবেন বলে স্থির করে, নগদ টাকা-পয়সার অভাবের জন্য এটাই তাঁকে বিক্রি করে দিতে চান। কাজেই সিনোরা এর ঠিক ঠিক দামটা যাচাই করে আনার জন্য শেপার্ডকে এটা দিয়েছিলেন।

শেপার্ড ফিরে এসে খবরটা সিনোরাকে দিতেই তিনি তো লাফিয়ে উঠলেন আনন্দে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জমির বিক্রয়-নামা পাকাপাকি রেজেস্ট্রী করে দিয়ে, তার পরিবর্তে পান্নার নেকলেস্‌টা ঘরে তুললেন।

এ পর্যন্ত ঘটনাটি সহজ ভাবেই ঘটে গেল বটে, কিন্তু আসল ঘটনা শুরু হ'ল ঠিক এর পর থেকে। পান্নার নেকলেস্‌টি ঘরে আসার দিন কয়েক পরেই একদিন স্থানীয় চার্চের বিশপকে আমন্ত্রণ করলেন সিনোরা। তাঁকে তিনি অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এবং কোন কথাই গোপন রাখতেন না তাঁর কাছে। সেদিনও কফি ও সামান্য কিছু জলযোগের পর, এ-কথা সে-কথা কইতে কইতে এসে পড়ল পান্নার কথা। সব কথা শোনার পর বিশপ বিস্মিত হয়ে উঠে বললেন, বলেন কি, জহুরী বলেছে ওটা ইন্‌কা'র পান্না!

সিনোরা বললেন, নিশ্চয়ই। আপনি যদি দেখতে চান তো আসুন না, আপনাকে দেখাই।

একটা ঘরের ভিতর দিয়ে আর একটা ছোট ঘরে গিয়ে, ড্রেসিং

সিনোরা অ্যাকোস্টা বাক্সর ডালা খুলে দেখেন, তার মধ্যে থেকে তাঁর সেই পান্নার নেকলেস্ উধাও

টেবিলের ড্রয়ারের চাবি খুলে ফেললেন সিনোরা। একটা ছোট্ট কারুকার্য-করা বাক্স বার করলেন। পিছনেই আসছিলেন বিশপ। হঠাৎ সিনোরার আর্ত চিৎকার শুনে তিনি চম্‌কে উঠলেন!

সিনোরা তখন ডালা-খোলা একটা খালি বাক্স হাতে নিয়ে প্রায় মড়ার মত বিকৃত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন! বিশপের দিকে চেয়ে কোন রকমে তিনি বললেন, সেটা চুরি গেছে! আর সব যেমন ছিল তেমনিই আছে, শুধু নেক্‌লেসটাই নেই! আমার এত দামের জিনিসটা·· বলতে বলতে প্রায় মূর্ছা যাবার মত হ'ল তাঁর অবস্থা!
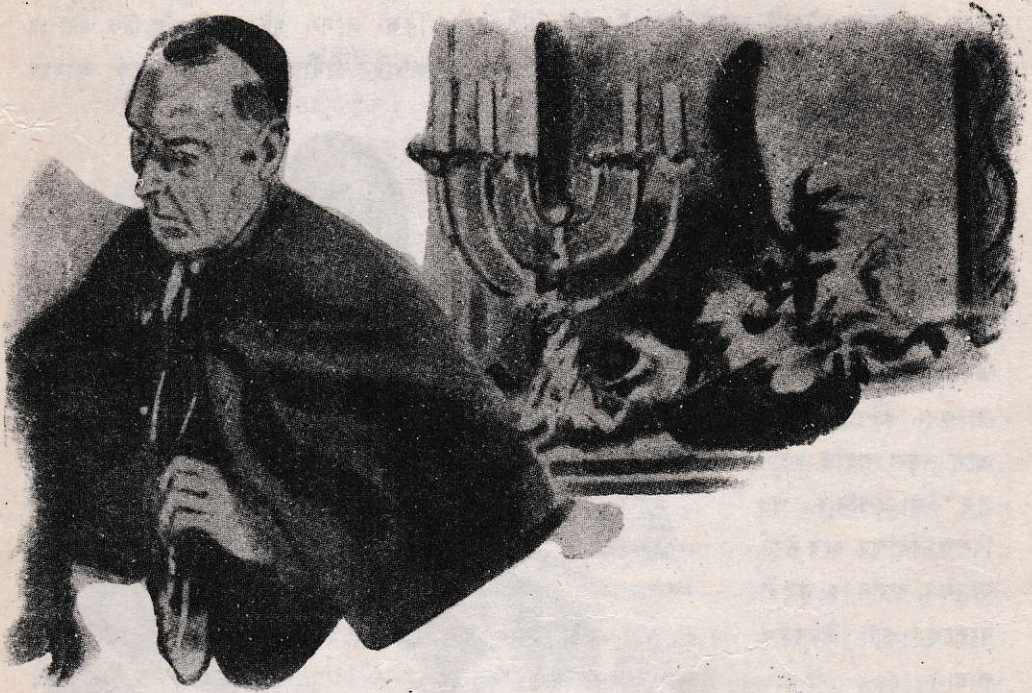
পাশেই বিশপ দাঁড়িয়ে ছিলেন নেকলেস্‌টি দেখবার জন্যে

ফ্রাঙ্ক আর শেপার্ডকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠালেন সিনোরা। অনেক রাত্রি পর্যন্ত জল্পনা-কল্পনার পর ফ্রাঙ্ক খবরটা পুলিসে জানিয়ে এল এবং যে চোর ধরে দিতে পারবে, তার জন্য বেশ ভাল একটা পুরস্কারও ঘোষণা করা হ'ল।

পুলিসের কাছে কাকে এ-ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে সন্দেহ হয় খুলে বললেন সিনোরা। তাঁর নাম ব্লাস।

নামটা শোনা মাত্রই শেপার্ড বললে, তাকে তো আমি দেখেছি, সেই জোয়ান লোকটা তো··· যে গত বছর হঠাৎ নিজে থেকে এসেই চাকরির জন্যে ধরেছিল আপনাকে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ—সিনোরা বললেন। তা ছাড়া তিনি উত্তেজিত হয়ে আরও বললেন যে, সে নিজের পরিচয় দিয়েছিল কুচুয়া উপজাতির লোক বলে। আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল লোকটার উপর। কালই লোকটা আমায় কিছু না বলে চলে গেছে। ও প্রায়ই আমার শোবার ঘরে আসত—আমার আর মোটেই সন্দেহ নেই শেপার্ড, যে এ ওরই কাজ !

পুলিস ইনস্পেক্টার এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলেন। এবার তিনি বললেন, কিন্তু মিসেস অ্যাকোস্টা, সে একটা অশিক্ষিত লোক হয়ে কি করে পান্নার দাম বুঝবে ?

সিনোরা অ্যাকোস্টা বললেন, এতে আর বোঝাবুঝির কি আছে, লোভে পড়ে···

না, না—পুলিস ইনস্পেক্টার বললেন, তা হলে সে আপনার অন্য মূল্যবান অলঙ্কার বা ধনরত্ন যা ছিল, ফেলে যেত না নিশ্চয়ই। যা হোক, এটাও আমরা চিন্তা করে দেখব।

পুলিস অফিসারটি বিদায় নিলেন। কিন্তু ফ্রাঙ্ক ও শেপার্ড তার কথায় খুব নিশ্চিন্ত হ'ল না ; হতে পারল না। কারণ, কুচুয়ারা অশিক্ষিত হলেও খুব বুদ্ধিমান যে সেটা ওদের জানা ছিল। বিশেষ করে ব্লাসকে বোকা কোন মতেই ভাবা চলে না। সুতরাং এটা যে তারই কাজ এ সম্বন্ধে ওদের আর কোন সন্দেহই রইল না।

এরপর ব্লাস কোথায় পালাতে পারে এই নিয়ে আরম্ভ হ'ল গবেষণা। কুচুয়ারা গুয়েকুয়িল-এর মত নীচু জায়গাতেও থাকে বটে, কিন্তু উঁচু পার্বত্য-অঞ্চলে থাকাটাই তাদের পছন্দ বেশী। তার উপর আবার খবর পাওয়া গেল, সমুদ্রতীর থেকে ন'হাজার ফুট উঁচু শহর 'কুটো'তে একটা বিরাট উৎসব হবে কয়েকদিন পরেই।

এই উৎসবটা হয় ওদের সূর্যদেবতা ইন্তির তুষ্টিসাধন উপলক্ষে। কিন্তু এ সম্বন্ধে এইটুকু ছাড়া আর কিছুই ওদের জানা ছিল না।

যাই হোক, পরের দিনই ওখান থেকে একটা ছোট 'প্লেন' যোগাড় করে নিলে ফ্রাঙ্ক। প্লেন চালানোর ব্যাপারে নিজেই সে ছিল বড় দরের ওস্তাদ। শেপার্ডকে নিয়ে, পাহাড়ের চূড়ার উপর দিয়ে উড়ে একেবারে কুটোয় এসে পৌঁছল তারা।

কুটোয় প্লেন নামবার জায়গাতেই ফ্রাঙ্ক তার একজন পুরোন বন্ধু পেয়ে গেল। ভালই হ'ল ; প্লেনটা তারই হেপাজতে রেখে দিল ফ্রাঙ্ক। ওদের কথামত বন্ধুটি দুটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিল ফ্রাঙ্ক ও শেপার্ডকে। ঘোড়ায় চড়ে ওরা দু'জনে বেরিয়ে পড়ল আসল শহরটা দেখতে।

'সান্ পাবলো'র গোটা শহরটাই একটা বিরাট লেকের পাশে গড়ে উঠেছে। লেকটা সত্যিই বিরাট আর ভারী সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন এর জল। এই লেক সম্বন্ধে নানা কাহিনী লেখা আছে ইতিহাসের বইয়ে, গল্পে, গাথায়। এই লেকের ধারেই নাকি স্পেন-এর আক্রমণের ভয়ে স্থানীয়

শেষ রাজা 'ইন্‌কা' আত্মগোপন করেছিলেন। তারপর একদিন ধরা পড়ে যাবার ভয়ে, তিনি তাঁর বহু মণিমাণিক্য-শোভিত মুকুট আর পান্নার কাজকরা হার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন এর জলে।

এই কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে কত খোঁজাখুঁজিই না হয়েছিল! পরবর্তীকালে কত দেশ থেকে কত অভিযাত্রীর দলই না এসেছিল—কিন্তু বৃথাই। লেকের জল একটি কথাও বলে নি কারুকে—কোন আশ্বাসই কেউ পায় নি সেখান থেকে।

সারাদিন ধরে ফ্রাঙ্ক আর শেপার্ড ঘোরাঘুরি করল এখানে-সেখানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে। তখন থেকেই উৎসবের ঢাক-ঢোল বাজনা শুরু হয়েছে। সারারাত ধরেই সে বাজনা বেজেছিল। কিন্তু সেদিন ওরা এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যে, রাত্রে এসবের কিছুই টের পায় নি।

পরদিন ভোর হবার একটু আগেই ঘুম ভেঙে গেল ওদের। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড় পরে নিলে ওরা। জামার তলায় লুকিয়ে ওদের রিভলবার দুটি ভরে নিলে। তারপর গরম গরম কয়েক কাপ কড়া কফি খেয়েই আবার উঠল ঘোড়ার পিঠে।

বাইরে বেরিয়ে বেশ শীত-শীত করতে লাগল ওদের দু'জনেরই। কে বলবে দিনে এত গরম! যাই হোক, সূর্য উঠতে ঠাণ্ডাটা একটু কমল।

রাস্তায় আসতে-আসতেই দেখা গেল, কুচুয়া পুলিস রাস্তার পাশে পাশে লাইন দিয়ে খাড়া হয়ে গিয়েছে। কুচুয়া ছাড়া আর কোন জাতের লোককেই রাস্তায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাধ্য হয়ে রাস্তা ছেড়ে দিতে হ'ল ওদের।

আরো একটু এগুতেই দেখা গেল সমস্ত শহরটা কুচুয়া লোকজনে গিসগিস করছে। অন্যান্য জায়গাতে এই এরাই যে চাকর-বাকরের কাজ করে সে কথা কে বলবে! একদিন চিলি, বলিভিয়া আর পেরু জুড়ে যে বিরাট সাম্রাজ্য এদের ছিল, তারই গর্বে আজ যেন এদের মাটিতে পা পড়ছে না। সাজেরই বা কি ঘটা! পরনে লাল-নীল জামা, স্কার্ট, আর মাথায় সুন্দর সুন্দর সোলার টুপি। প্রত্যেকের পায়ে নতুন হাতে তৈরী স্লিপার—ওদের ভাষায়, 'আলপারগাটা'।

লেকের ধারে ধারে আধমাইল জুড়ে যা কাণ্ড হয়েছে, তা দেখবার মত! বিরাট বিরাট উনুনের উপর মাংস সেদ্ধ হচ্ছে, মস্ত তামার কেটলীতে জল ফুটছে টগবগ করে, নানা খাবার রাখা হয়েছে সাজিয়ে। প্রায় মাঝামাঝি আকাশ-ছোঁয়া উঁচু একটা বাঁশ পোতা রয়েছে, আর তার মাথায় উড়ছে ইন্‌কা রাজাদের সূর্য-আঁকা প্রতীক পতাকা।

উৎসবের প্রথম পর্ব ছিল দৌড়ের রেস। অবশ্য মাঠে যে ধরনের রেস হয় স্পোর্টস্-এর সময় —সে ধরনের জিনিস মোটেই নয়। খামচা-খামচি, ধাক্কাধাক্কি, মারামারি একটা খেলাই বলা যেতে পারে তাকে। খেলা শুরু হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল, রক্তারক্তি হয়ে সে এক বিশ্রী কাণ্ড! কিন্তু সবাই এমন স্ফূর্তিতে মগ্ন ছিল যে ওসব খেয়ালই করলে না। একসঙ্গে গিয়ে তারাই সকলে লেকের ধারে কফি খেতে লাগল খেলার পর।

তারপরই শুরু হ'ল নাচ। সে কি নাচ! ত্রিশ হাজার মেয়ে-পুরুষ বিরাট আঁকাবাঁকা লাইনে, কখনও বা একটি-দুটি বৃত্তে নাচতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হতে লাগল প্রচণ্ড চিৎকার করে গান। আবার তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেজে উঠল প্রকাণ্ড পাকানো রামশিঙা।

এই গানের সমাপ্তি ঘটল দুপুরের একটু আগেই। আর সঙ্গে সঙ্গে কুচুয়াদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। 'রাজা আসছেন, রাজা আসছেন' বলে আওয়াজ উঠল আকাশ বিদীর্ণ

ফ্রাঙ্ক ও শেপার্ড দুটি ঘোড়ায় চড়ে বিস্মিতভাবে দেখতে লাগলেন কুচুয়াদের কীর্তি-কলাপ

করে। হ্যাঁ, রাজাই আসছেন—শেষ ইন্‌কা-রাজ! তিনি আসছেন সূর্য-উৎসবে যোগ দিতে। তাঁর উপস্থিতিতেই সম্পূর্ণ হবে, সার্থক হবে এই উৎসব।

একদিনের সাজা রাজা—কিন্তু তারই বা সম্মান কত! রাজা আসবার আগে এল সাপের মত লাইনে একদল লোক। তাদের পিছনে—ঠিক ঘোড়ায়-চড়া রাজার সামনে-সামনে এল একদল

গলায় পান্নার হার দুলিয়ে, মাথায় ঝকমকে মুকুট পরে, ঘোড়ায় চড়ে একদিনের
পছন্দ করা ইন্‌কার রাজা এসে পৌঁছলেন উৎসবের মধ্যে

নাচিয়ে। কোমরে তাদের কতকগুলো করে ঘণ্টা ঝুলছে। শোভাযাত্রার মধ্যে যখন তারা নাচতে নাচতে আসছিল, তখন বেশ তালে-তালেই বাজছিল এই ঘণ্টাগুলো।

তারপর এল রাজা ইন্‌কা একদিনের পছন্দকরা ইন্‌কা।

কিন্তু রাজাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠেছে ফ্রাঙ্ক। সে আস্তে আস্তে কনুই দিয়ে শেপার্ডকে ঠেলা দিয়ে চুপি চুপি বললে, দেখো, দেখো একবার ভাল করে চেয়ে!

ততক্ষণে শেপার্ডের চোখও ইন্‌কার দিকে পড়েছে। বিচিত্র বেশ ইন্‌কার, কিন্তু বুকের মাঝখানে সেই ঝকমকে বড় পান্নার নেক্‌লেসটা চিনে নিতে একটুও ভুল হয় না! কোন সন্দেহ নেই যে এটা সিনোরা অ্যাকোস্টারই সেই নেক্‌লেস। কিন্তু এখন করা যাবে কি!

এদের এখন যা অবস্থা—সামনে এগুনোই মুশকিল, তাছাড়া স্বয়ং ইন্‌কা! এখন কেবলমাত্র একটি কাজই করা যায়, অর্থাৎ অপেক্ষা করে দেখা যায়, এই ইন্‌কা-রাজ কোথায় থাকেন, তারপর পুলিসে খবর দেওয়া। হয়ত পুরস্কারটা আর এতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু উপায় কি!

একটু পরেই ভোজ আরম্ভ হ'ল। দুটো পংক্তির একটায় আমিষ ও অপরটায় নিরামিষ পরিবেশন করা হ'ল। খেয়েদেয়ে কেউ গান গাইতে লাগল, কেউ বাজাতে লাগল বাঁশী বা গীটার। একটু পরেই মড়ার মত সব শুয়ে পড়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত শরীর নিয়ে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল ফ্রাঙ্ক ও শেপার্ড। কারো মুখে কোন কথা নেই। হঠাৎ তাদের সামনে এসে দাঁড়াল একজন। তাকে দেখে দু'জনেই তারা একেবারে হতবাক হয়ে গেল।

যার জন্যে এত ঘোরাঘুরি, এত খোঁজাখুঁজি আর পরিশ্রম, সেই ব্লাস তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফ্রাঙ্ক মোটামুটি কাজ চলা কুচুয়া ভাষা জানত, সে অন্য কোন কথা না-তুলে ছোট্ট করে বললে, কি খবর?

ব্লাস বললে, আপনারা আমার খোঁজে এখানে এসেছেন তা আমি জানি, কিন্তু এই পান্নাটা আমাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি—আপনাদের নয়।

ফ্রাঙ্ক বললে, কিন্তু চিন্তা করে দেখ দেখি—যে কাজ তুমি করেছ—

ব্লাস ওকে থামিয়ে দিয়ে বললে, শুনুন তা'হলে, এটা হচ্ছে আটাহুয়েলপার বাবা হুয়াইনা কাপাকের সম্পত্তি। আটাহুয়েলপা পেরুতে যুদ্ধযাত্রার সময় এটা রেখে গিয়েছিলেন এখানে। সেই সময়েই এই হারটা চুরি যায়। তারপর হাত বদল হতে হতে এসে পৌঁছয় আমার মনিব সিনোরা অ্যাকোস্টার হাতে।—একটু দম নিয়ে ব্লাস উত্তেজিত হয়ে আবার বললে, আমি জানি এটা এখন আমাদেরই পাওয়া উচিত। কিন্তু আমার মনিব ন্যায্য দাম দিয়েই এটা কিনেছেন—তাঁকে বঞ্চিত করাও আমার ধর্ম নয়! তাছাড়া আপনাদের পুলিসও এ-কথা শুনবে না—তাই নেকলেসটা ফেরতই দিয়ে যাচ্ছি আমি আপনাদের। আপনারা শুধু আমাকে একদিনের ব্যবহার করার জন্য ক্ষমা করবেন।

কোমর থেকে একটা ছোট্ট থলি বার করে নেকলেসটা মুখের সামনে ফেলে তাদের একটিও কথা বলার অবকাশ না দিয়ে ব্লাস চলে গেল।

এত দামী পান্নার নেকলেসটা এ-ভাবে ফিরে পাওয়ার জন্য, পুরস্কার লাভের জন্য, আনন্দ

ব্লাস কোমর থেকে একটা ছোট্ট থলি বার করে, পান্নার নেকলেস্‌টা ফেলে দিল শেপার্ডের কোলের উপর

হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু কেন যেন ফ্রাঙ্ক আর শেপার্ড উভয়েরই চোখ ঝাপসা হয়ে এল। ব্লাসের বিচিত্র চরিত্রের কথা ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত ও ধীর পায়ে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল ওরা।
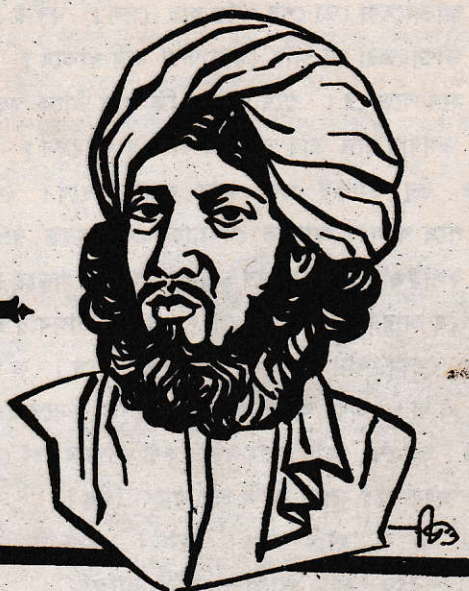
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[দোঁহা আবৃত্তি করতে করতে কবীর বাড়িতে ঢোকে]

কবীর ॥ "চল্‌তি চক্কি সব্ কোই দেখে,
কীল্ দেখে না কোই।
যো কীল্‌কো পাকড়্‌কে রহে,
সাবেৎ রহা হেয়্ ওই॥"

লুই ॥ দোঁহা গাইলেই পেট ভরবে, না চালডালের যোগাড় দেখতে হবে?

কবীর ॥ লুই, তোকে একটা মজার খবর বলি শোন্।

লুই ॥ তোমার গল্প শোনার সময় আমার নেই। ছেলেমেয়ে দুটোর মুখে কী দেবো তার ঠিক নেই—এখন বসে গল্প শোন!

কবীর ॥ যিনি জোটাবার তিনিই জোটাবেন বউ। তুই আমি চেষ্টা করলেই কি জুটবে? মুখ দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

লুই ॥ তত্ত্বকথায় তো পেট ভরে না। তাঁতের কাজে মন নেই, হাটবাজার বন্ধ। সংসার চলবে কি করে?

কবীর ॥ চলবে রে চলবে। সেদিন যে বাড়িতে অতগুলি অতিথ এলো, ছিল ঘরে কিছু? কিন্তু অতিথসেবা তো শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল। কবীর জোলা তো আর রাজাবাদশা নয় যে তার ভাণ্ডারভরা ধন আর গোলাভরা ধান থাকবে? দুঃখের মধ্যে আছি বলেই তো ভগবানের কথা মনে পড়ে রে। সুখে থাকলে কি আর তাঁকে স্মরণ করতাম?

লুই ॥ ভগবান বুঝি তার ভক্তদের খালি দুঃখই দেন?

কবীর ॥ তবু তাঁকেই স্মরণ করে থাকতে হবে। সে-কথাই তো তোকে বলছিলাম, লুই। আজ পথে আসতে আসতে দেখলাম এক গেরস্ত বউ জাঁতায় কলাই ভাঙ্গছে। জাঁতার চাপে কলাইগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

লুই ॥ সে আর নতুন কথা কি গো! কলাই ভাঙ্গবার জন্যই তো জাঁতা ঘোরানো হয়।

কবীর ॥ শোন্ শোন্। তার পরেও কথা আছে। জাঁতার মাঝখানে একটা খিল থাকে না……

লুই ॥ ও মা! এখন আমাকে আবার জাঁতা চিনতে হবে নাকি!

কবীর ॥ ওই তো তোর দোষ বউ—কথা শোনার ধৈর্য নেই!

লুই ॥ অমন করে বললে আমি চলে যাবো কিন্তু।

কবীর ॥ না না, যাবি কেন! শোন্। দেখি কি, সেই খিলের কাছে কয়েকটা কলাই বুঝলি, যেমন ছিল ঠিক তেম্‌নি আছে—একটুও ভাঙ্গেনি।

লুই ॥ সে তো থাকবেই—তা আবার ভাঙ্গে নাকি!

কবীর ॥ তা দেখে আমার কি মনে হলো জানিস্? মনে হলো, ওই খুঁটিটাই ভগবান। খুঁটি ছেড়ে যারা দূরে চলে যায় তারাই ভেঙ্গে চুরমার হয়, আর যারা খুঁটি ধরে থাকতে পারে তাদের বিনাশ নেই। তাই তো আমি দোঁহা বাঁধলাম:

"চল্‌তি চক্কি সব্ কোই দেখে,
কীল্ দেখে না কোই।
যো কীল্‌কো পাকড়্‌কে রহে,
সাবেৎ রহা হেয়্ ওই॥"

[ছেলে কামালের প্রবেশ। বয়েস বারো-তেরো]

কামাল ॥ বাবা, বাবা……

কবীর ॥ কী বাপ কামাল?

কামাল ॥ আমরা কোন্ জাত, বাবা?

কবীর ॥ কেন বাবা, জাতের কথা উঠলো কেন?

কামাল ॥ আমি মন্দিরের দোরে গিয়েছিলাম। আমাকে সবাই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। বলো বাবা, আমরা হিন্দু, না মুসলমান?

কবীর ॥ আমরা মানুষ।

কামাল ॥ দূর ছাই! মানুষ কি কখনো জাত হয়? তুমি আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ।

কবীর ॥ না বাবা, ফাঁকি দেবো কেন? ভগবানের রাজ্যে একটাই জাত—সেটা হচ্ছে মানুষের জাত। আর সব মানুষই সমান।

কামাল ॥ তবে যে কেউ বলে হিন্দু—কেউ বলে মুসলমান?

কবীর ॥ কিন্তু সবাই তো মানুষ, বাবা। কেউ বলে জল, কেউ বলে পানি; কেউ বলে খোদা, কেউ বলে ঈশ্বর। যে নামই দাও সবই এক, বাবা।

কামাল ॥ বাবা, তোমাকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা করে। বলে, তুমি নাকি পাগল।

কবীর ॥ পাগল তো সবাই বাবা। কেউ সংসার নিয়ে পাগল, কেউ স্বার্থ নিয়ে পাগল আর কেউ বা ক্ষমতা নিয়ে পাগল। ভাবের পাগল আর ক'জন? তুইও তো কম পাগল নোস, বাবা! আমাকে কেউ পাগল বললেই তুই পাগল হয়ে যাস।

কামাল ॥ আচ্ছা বাবা, দিল্লীর বাদ্‌শা নাকি একবার তোমাকে পাগলা হাতীর পায়ের তলায় ফেলে পিষে মারতে চেয়েছিল?

কবীর ॥ কে বললে তোকে?

কামাল ॥ আমি শুনেছি।

কবীর ॥ [কামালকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে-] কী শুনেছিস বাবা?

কামাল ॥ বাদশা নাকি একটা মস্ত হাতীকে লেলিয়ে দিয়েছিল তোমার দিকে......

কবীর ॥ আচ্ছা! তারপর?

কামাল ॥ তারপর কী হয়েছিল আমি কি জানি নাকি? বলো না বাবা, কী হয়েছিল? সত্যি তোমাকে মারতে চেয়েছিল?

কবীর ॥ হ্যাঁ বাবা। কিন্তু মারতে পারেনি। রাখেন ঠাকুর মারে কে?

কামাল ॥ বাদ্‌শা তা হলে পাগল, বাবা?

কবীর ॥ হ্যাঁ কামাল, সেও এক রকমের পাগল—ক্ষমতার নেশায় পাগল। ধর্ম-পাগলের দল তাকে আরো ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। তাদের সেই পাগলামি দেখে ভগবান মুচকি মুচকি হেসেছিলেন।

কামাল ॥ বাবা, আর কখ্‌খনো কিন্তু তুমি দিল্লী যেয়ো না। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।

কবীর ॥ মরণ তো একদিন আছেই, বাবা। কেউ তো পৃথিবীতে অমর হয়ে আসেনি। তবে একটা কথা মনে রাখবি কামাল, যা সত্য বলে জানবি, বুঝবি, মরণের ভয়ে সেই সত্যকে কখনো ছাড়বিনে। লুই, বাজারে তা হলে যেতেই হবে, না?

লুই ॥ ঘরে তো খুদকুঁড়ো কিছুই নেই।

কবীর ॥ শাড়ীটা বোনা শেষ হয়েছে?

লুই ॥ কাল রাতে তাঁত থেকে নামিয়েছি।

কবীর ॥ তা হলে দে, শাড়ী আর গামছাজোড়া নিয়ে যাই বাজারে। বেচে যা হোক কিছু মিলবেই। কামালী কোথায়?

কামাল ॥ পাড়ায় খেলছে।

কবীর ॥ মেয়েটা এক মুহূর্তও বাড়িতে থাকে না!

কামাল ॥ তাকে ডেকে নিয়ে আসবো?

কবীর ॥ না থাক। খেলা থেকে ডেকে নিয়ে এলে ও মুখখানা বেজার করে দাঁড়িয়ে থাকবে। ওর বেজার মুখ আমার সহ্য হয় না। ওকে দেখে আমার মনে হয়, আমার মাও বুঝি দেখতে এমনই ছিল। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ]

কামাল ॥ তুমি তোমার মাকে দেখোনি, বাবা?

কবীর ॥ [অন্যমনস্ক ভাবে] উঁ! হ্যাঁ, এক মাকে দেখেছি, কিন্তু আরেক মাকে দেখতে পাইনি।

কামাল ॥ তা হলে তোমার দু'মা ছিল বাবা?

কবীর ॥ লোকে তাই বলে। বউ, কই শাড়ী আর গামছা এনে দে।

লুই ॥ দিচ্ছি।

[মঞ্চের আলো নিভে যাবে। যন্ত্রসঙ্গীতে রদ্বারা একটা রোমাঞ্চকর অবস্থার সৃষ্টি করা হবে। তারপর আলো জ্বলবে—আলো খুব স্পষ্ট হবে না। ছায়ামূর্তির আবির্ভাব। মঞ্চে শুধু লুই ও ছায়ামূর্তিকেই দেখা যাবে। দু'জনের মুখেই আলো পড়বে।]

ছায়ামূর্তি ॥ কবীর!

লুই ॥ [সবিস্ময়ে] আপনি কে!

ছায়ামূর্তি ॥ আমি কবীরের মা—তার গর্ভধারিণী। তার জন্মের পরেই তাকে আমি ত্যাগ করেছিলাম।

লুই ॥ কেন?

ছায়ামূর্তি ॥ সে কাহিনী না-ই শুনলে মা!

লুই ॥ তারপর?

ছায়ামূর্তি ॥ তারপর? এই কাশীরই নীরু জোলা আর তার স্ত্রী নীমা কুড়িয়ে পেলো কবীরকে।

লুই ॥ আশ্চর্য তো!

ছায়ামূর্তি ॥ সংসারে কিছুই আশ্চর্য নয়, মা। গর্ভধারিণী হয়ে যা পারলাম না, সেই জোলা আর তার সহধর্মিণী তাই পারলো। তাদের বুকের স্নেহ দিয়ে কবীরকে তারা বড় করে তুললো।

লুই ॥ তারপর ?

ছায়ামূর্তি ॥ বাল্যকাল থেকেই কবীরের ধর্মে মতি দেখা গেল। বৈষ্ণবদের মতো তিলকমালা ধারণ করে সে নাম জপ করতে লাগলো। আশা তার—সে মহাত্মা রামানন্দের শিষ্য হবে। কিন্তু মুসলমান বলে তাকে মন্ত্র দিতে রামানন্দ অস্বীকার করলেন।

লুই ॥ কিন্তু তিনি যে বলেন, রামানন্দেরই শিষ্য তিনি !

ছায়ামূর্তি ॥ তাও মিথ্যে নয় মা। সেও এক আশ্চর্য কাহিনী। কবীর জানতো, রামানন্দ প্রত্যহ শেষরাত্রে গঙ্গাস্নান করেন। রামানন্দ যে ঘাটে স্নান করতে আসতেন সেই ঘাটের সিঁড়িতে কবীর একদিন রাত্রিবেলা গিয়ে শুয়ে রইলো। ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় অতর্কিতে রামানন্দের পা কবীরের মাথায় ঠেকলো। কোনো অপবিত্র লোকের অঙ্গে পা লেগেছে মনে করে তিনি দুবার 'রাম রাম' শব্দ উচ্চারণ করলেন। কবীর সেই 'রাম রাম' শব্দকেই গুরুর দেয়া মন্ত্র রূপে গ্রহণ করলো। উঠে রামানন্দ স্বামীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে এলো। সেই থেকে কবীর নিজেকে রামানন্দের শিষ্য বলেই ভাবতে লাগলো।

লুই ॥ রামানন্দ কি তাকে শিষ্য বলে গ্রহণ করলেন ?

ছায়ামূর্তি ॥ না, প্রথমে তিনি তা করেননি। তিনি লোকমুখে যখন শুনলেন, রামানন্দের শিষ্য বলে কবীর নিজের পরিচয় দিচ্ছে তখন একদিন তিনি কবীরের কাছে এলেন। এসে তিনি বললেন, "আমার তো মনে পড়ছে না কবে তোমাকে দীক্ষা দিয়ে আমার শিষ্য বলে গ্রহণ করেছি !" কবীর গুরুকে প্রণাম করে বলে, "প্রভু, আর সবাইকে আপনি কানে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করে থাকেন, কিন্তু গঙ্গার ঘাটে আমার মাথায় আপনার শ্রীপাদপদ্ম রেখে আমাকে 'রাম' মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন।"

লুই ॥ রামানন্দ তখন কি করলেন ?

ছায়ামূর্তি ॥ শুনে গঙ্গার ঘাটের সেই ঘটনা রামানন্দের মনে পড়ে গেল। আনন্দে তিনি কবীরকে আলিঙ্গন করে তাকে নিজের শিষ্য বলে গ্রহণ করলেন।

লুই ॥ মা, আপনার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে আমি ধন্য হলাম। নানা লোকের মুখে নানা কথা শুনেছি। কার কথা সত্যি আর কার কথা মিথ্যে ধরতে পারিনি। আজ সমস্ত সংশয় ঘুচলো। কিন্তু বলুন মা, ওঁর তো কোনো অকল্যাণ হবে না ? এখনো যে শত্রুরা ওঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করছে, মা। ওঁকে মারবার জন্যে ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করে !

ছায়ামূর্তি ॥ ভয় নেই, মা। ওর ক্ষতি কেউ করতে পারবে না। ও যে মানুষকে ভালোবাসে। ওর কাছে সব মানুষই সমান—মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। ভালোবাসার কাছে সবাই বশ হয়, মা। একদিন দেখবে শত্রুরাও ওর কাছে পরাজিত হয়েছে—ভালোবাসা দিয়ে ও তাদের হৃদয় জয় করেছে। ফুলের গন্ধের মতো ওর যশ একদিন চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। কবীরের মতো পুত্রকে আমি গর্ভে ধারণ করেছিলাম—এজন্য আমি ধন্য !

লুই ॥ মা, আপনি কি সর্বদাই ওর কাছে কাছে থাকেন ?

ছায়ামূর্তি ॥ হাঁ, মা। অসহায় অবস্থায় ওকে আমি ত্যাগ করেছিলাম—তাই ওর মায়া আমি কাটাতে পারিনি। ছায়ার মতো সর্বদাই আমি ওকে অনুসরণ করি—ওর কাছে কাছে থাকি—ওর যাতে কোনো অকল্যাণ না হয় তারই চেষ্টা করি। আমার অতৃপ্ত আত্মা ওকে ঘিরে আছে, মা। আমি ওকে ছেড়ে চলে যেতে পারছিনে। অন্তরীক্ষে থেকে আমি ওকে আশীর্বাদ করি।

[মঞ্চ অন্ধকার হয় ও ছায়ামূর্তি মিলিয়ে যায়। খানিকক্ষণ নেপথ্যে যন্ত্রসঙ্গীত বাজে ও আবার আলো জ্বলে ওঠে।]

কামাল ॥ তা হলে তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে, মা।

লুই ॥ স্বপ্ন কি সত্যি বলতে পারছিনে, বাবা। তবে যা দেখেছিলাম তাই তোকে বললাম। আমি যখন প্রণাম করবার জন্যে তাঁর পা স্পর্শ করতে গেলাম তখনই তিনি অন্তর্ধান হলেন।

কামাল ॥ মা, কামালী তো এখনো বাড়ি ফিরলো না !

লুই ॥ খেলায় মেতে আছে। যা বাবা, তুই নিয়ে আয় গিয়ে। বাজার থেকে তোর বাবার ফেরার সময় হলো। এসে কামালীকে বাড়িতে না দেখতে পেলেই আবার ছুটবে।

কামাল ॥ না মা, বাবা ফেরার আগেই কামালীকে নিয়ে আসবো। কামালীটা ভারী দুষ্টু। বাড়ি থেকে বেরুলে আর ফেরবার কথা মনেই থাকে না ! আমি যাই মা ?

লুই ॥ যা, দেরী করিস্‌নি। দেখি, আমি রান্নার যোগাড় করি।

[কামাল বাইরের দিকে এবং লুই ভেতরের দিকে প্রস্থান করে। হাঁক দিতে দিতে কবীরের প্রবেশ।]

কবীর ॥ কামালী, কামালী !

লুই ॥ [নেপথ্যে] কামালী এখনো বাড়ি ফেরেনি।

কবীর ॥ এখনো বাড়ি ফেরেনি ! সেই কখন গেছে। আমি বাজার করে ফিরে এলাম—এতক্ষণেও ফিরলো না !

[লুই-এর প্রবেশ]

লুই ॥ বাজার করে ফিরে এলে—কিন্তু বাজার রেখে এলে কোথায় ?

কবীর ॥ আজ যাদের জন্যে বাজার করা হয়েছিল তাদেরই দিয়ে এলাম।

লুই ॥ সে আবার কেমন কথা গো !

কবীর ॥ হাঁ গো হাঁ, তাই। যাদের প্রয়োজন বেশি তাদেরই দিয়ে এলাম। বাজার করে ফিরছি, পথে এক বাড়িতে শুনতে পেলাম ভীষণ কান্না। ভেতরে গিয়ে শুনি—গেরস্তদের দু'দিন যাবৎ খাওয়া হয় নি। পেটের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বউটা তার স্বামীকে নাকি মুখ করেছিল—আর স্বামী অমনি তাকে ধরে লাগালো মার। ছেলেমেয়েগুলি হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ

করলো। তাদের মুখের দিকে চেয়ে বড় কষ্ট হলো, লুই। তারাও তো আমার কামাল-কামালীর মতোই শিশু। তাই জোর করে গছিয়ে এলাম বাজারটা। কেমন, ভালো করি নি?

লুই ॥ গ্যাখো কাণ্ডখানা! বাড়ির অবস্থার কথা একবারও ভাবলে না?

কবীর ॥ তখন ভাববার মতো মনের অবস্থা ছিল না, লুই। মনে হলো, ওদেরই প্রয়োজন বেশি।

লুই ॥ কিন্তু এখন ছেলেমেয়ের মুখে কি দেবো? উনোনে চড়াবো কী আমি!

কবীর ॥ হবে হবে, নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা হবে। ওরাই কি ভেবেছিল আজ ওদের আহার জুটবে? ...ভাবিস্‌নি তুই ভাবিস্‌নি, জুটে যাবে, জুটে যাবে...এক ভাবে না এক ভাবে জুটবেই। বাজার থেকে আসবার সময় পথে কি মনে হচ্ছিল জানিস্? মনে হচ্ছিল:

"হীরা পড়া বাজারমে, রহা ছার লপটায়
বহুতক মুরখ চলি গয়ে, পারিখ লিয়া উঠায়।"

হায়রে, মানুষ কি অন্ধ! বাজারে ধূলোর মধ্যে একখণ্ড হীরে পড়ে আছে, মূর্খেরা তার কাছ দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কারো নজরে তা পড়ে না। আর জহুরী যেই এলো, অমনি সে তা কুড়িয়ে নিল। ভগবান তো সব কিছুর মধ্যেই আছেন রে, যার চোখ আছে সেই তাঁকে দেখতে পায়।

লুই ॥ গোসাঁই!

কবীর ॥ কী রে, আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছিস কেন?

লুই ॥ [আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে] ঠিকই বলেছ গোসাঁই, ঠিকই বলেছ। চোখ থাকতেও আমি অন্ধ। তাই তোমাকে কাছে পেয়েও আমি চিনলাম না। তুমি মানুষ নও গোসাঁই, তুমি মানুষ নও—তুমি দেবতা। তোমার চরণের দাসী হবার যোগ্যতাও আমার নেই। তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো।

[লুই কবীরের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

১৩৬৭

॥ শেষ ॥

একটু পড়েই পণ্ডিত!
শ্রীশৈল চক্রবর্তী

হিপনটাইজ করা শিখে গেছি ভেরি ভেরি-ইজি, দেখাবি?
করম দেখি!

দাঁড়াও, তোমার মাথা নেই মুণ্ডু নেই আমি যা বলবো তাই করবে···আচ্ছা, দাও দেখি তোমার লাট্টুটা···দাও··

··দাও, শিগ্গির বার করো তোমার লাট্টু-হ্যাঁ···এইতো···বাঃ··

কি করে হলো রে মন্টু?
হিপনটিজম না ছাই! আমি ইচ্ছে করেই ওর কথা শুনলাম!

বাঃ, এইতো শিখে গেছি। আর আমায় পায় কে? দেখি—এবার কাকে করা যায়! যা চাইবো তাই পাওয়া যাবে। হাঃ হাঃ হাঃ

ঐ তো আলু কাবলিওলা, খেতেও ইচ্ছে করছে! করে দিই ওকে হিপনটাইজ!

আমি যা বলবো তাই তোমাকে শুনতে হবে! তোমার মাথা নেই মুণ্ডু নেই — দাও আলুকাবলি…

দাও আলুকাবলি! দাও আলুকাবলি- দাও আলু…

ইয়ে জরুর ডাকু হ্যায়!

দুম-

কয়লার কাহিনী
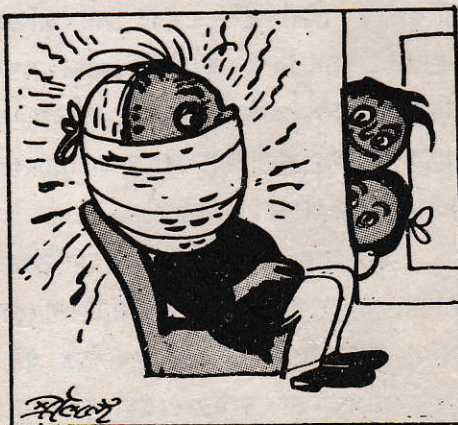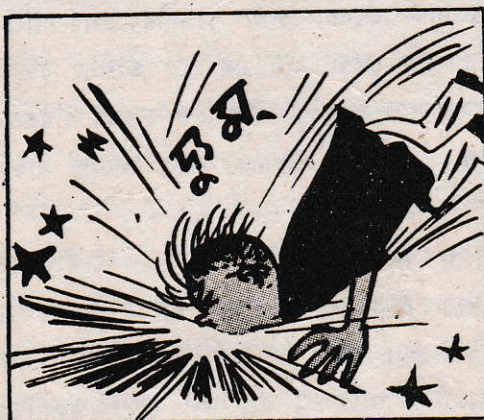
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্. এস্-সি.

লোকে বলিতেই বলে—কয়লার মত কালো, কয়লার মত নোংরা, কয়লার মত বিশ্রী। বাস্তবিক কয়লা বড় বদ জিনিষ। একবার হাতে, মুখে, কি কাপড়ে লাগিলে আর নিস্তার নাই, একেবারে ভূতটি বানাইয়া ছাড়িবে। তবু কেন আমি তোমাদের কয়লার কাহিনী শুনাইতে বসিয়াছি? ছেলেবেলায় পড়িতাম—"রূপেতে কি করে বাপু, গুণ যদি থাকে?" কয়লার বেলায়ও হইয়াছে তাই। কয়লার কালো রূপ ঢাকা পড়িয়াছে তার গুণে। সেই গুণের কথাই আজ তোমাদের কিছু বলিব।

কয়লা কোথা হইতে আসে দেখিয়াছ কি? তোমাদের মধ্যে যারা পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছ—তারা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ বর্দ্ধমান ছাড়াইবার কিছু পরেই ক্রমে একটি দু'টি করিয়া কয়লার খনি চোখে পড়ে। তারপর রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া এগুলি তো কয়লার এক একটি আড়ৎ। ঐ সব জায়গায় মাটীর নীচে রাশি রাশি কয়লা জমিয়া আছে; মাটী কাটিয়া সেই সব খনির ভিতর হইতে কয়লা তোলা হয়। পৃথিবীর নানা জায়গায় এই ধরণের কয়লার খনি আছে।

এই সব খনিতে অত কয়লা আসিল কোথা হইতে? পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে ভারী অদ্ভুত কথা বলেন। তাঁরা বলেন, লক্ষ লক্ষ বছর আগে এই পৃথিবীর বয়স যখন আরও অল্প ছিল, তার চেহারাও ছিল তখন অনেকটা অন্য রকম। মানুষ তখনও জন্মায় নাই—টিক্‌টিকি, গির্‌গিটি—এদেরই সব অতিকায় পূর্ব্বপুরুষেরা তখন পৃথিবীর উপর রাজত্ব করিত; আর যে সব জায়গায় এখন কয়লার খনি দেখা যায় সে সব জায়গা যুড়িয়া ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জঙ্গল। তারপর কালের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বুকে কত না পরিবর্ত্তন হইল! কত প্রাণী আসিল, কত প্রাণী গেল! ঐ সব জঙ্গলও আস্তে আস্তে মাটীর তলায় চাপা পড়িয়া গেল!

তারপর সেই অবস্থায়ই কাটিল আরও কত হাজার হাজার বছর। ঐ দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই সব গাছ উপরকার মাটী-পাথরের দারুণ চাপ সহ্য করিল। গাছের ভিতরকার সমস্ত নরম অংশ দেখিতে দেখিতে নষ্ট হইয়া গেল, রহিল শুধু অঙ্গারটুকু। তখন দেখা গেল সে গাছ আর নাই,—হইয়া গিয়াছে কয়লা। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ কয়লারই জন্মের ইতিহাস নাকি এই।

কয়লা আজকাল আমাদের একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেখানে আগুন জ্বালাইবার দরকার সেখানেই কয়লা। পাড়াগাঁয়ে আগুন জ্বালাইবার জন্য কাঠ-কুটা এখনও কিছু কিছু ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু তার স্থান ক্রমেই দখল করিতেছে কয়লা। রান্নাবান্না, ঘর-গৃহস্থালীর কাজ ছাড়া বড় বড় কল-কারখানা, রেলগাড়ীর এঞ্জিন, জাহাজের এঞ্জিন প্রভৃতি চালাইতে তো কয়লা ছাড়া এক দণ্ডও চলে না। এই সবের জন্য প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ মণ কয়লা খরচ হয়।

কিন্তু শুধু কয়লার আকারেই কয়লার ব্যবহার নয়। কয়লার আসল উপাদানকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন 'অঙ্গার' বা কার্ব্বন্ (carbon)। কিন্তু খনির যে কয়লা, তার মধ্যে অঙ্গার ছাড়া অন্য জিনিষও কিছু কিছু থাকে। খনি হইতে টাট্‌কা-তোলা কয়লা আমাদের ঘরোয়া কাজে ব্যবহার করা যায় না—তার মধ্যে এত জলীয় বাষ্প এবং এত গ্যাস্ মিশান থাকে যে, তা বরদাস্ত করা অসম্ভব। সেজন্য প্রথমে কয়লাকে

রান্নার কয়লা গ্যাসের আলো জমির সার নানাপ্রকার রং

খানিকটা পোড়াইয়া লইতে হয়। পোড়াইলে ঐ সব ধোঁয়াটে জিনিষগুলি উড়িয়া যায় (দরকার হইলে সেগুলিকে আলাদা করিয়া ধরিয়া রাখাও চলে), আর পড়িয়া থাকে অঙ্গার অংশটুকু। ইংরাজীতে ঐ পোড়া কয়লাকে বলা হয় "কোক্"। আমাদের ঘরে গৃহস্থালীতে যে কয়লা দেখ তার প্রায় সবই এই কোক্। কয়লাকে এই কোক্ করিবার জন্য বিরাট বিরাট সব কারখানা আছে। সেগুলিকে বলা হয় "কোক্-ওভেন্"।

কোক্ কয়লা জ্বালাইলে তবুও খানিকটা ধোঁয়া বাহির হয়, তা ছাড়া জিনিষটি বড় নোংরা—পরিষ্কারভাবে নাড়াচাড়া করা চলে না। আর একটা মস্ত অসুবিধা—এই জমাট কয়লার আঁচকে সব সময়ে ইচ্ছামত আয়ত্তের মধ্যে রাখা যায় না। এই সবের জন্য আজকাল কয়লার বদলে জ্বালানী গ্যাসের কদর খুব বাড়িয়া চলিয়াছে। এই জ্বালানী গ্যাস্ তো তোমরা হরদম্ই দেখিতে পাও। বড় বড় সহরে অনেকের বাড়ীতে

এই গ্যাসে রান্নার ব্যবস্থা আছে। কলেজে—ল্যাবোরেটরীতে আগুন জ্বালাইবার জন্যও এই গ্যাস্ ব্যবহার করা হয়, আর আমাদের চোখের সম্মুখে রাস্তায় যে গ্যাসের আলো জ্বলে সেগুলিও এই জিনিষ। কিন্তু মজা এই, এই সব জ্বালানী গ্যাসও কিন্তু তৈরী হয় কয়লা হইতে। এই গ্যাসের নামও কোল্-গ্যাস্ অর্থাৎ কয়লার গ্যাস্। কয়লাকে বন্ধ-করা পাত্রের মধ্যে পূরিয়া খুব করিয়া পোড়াইলে এই কোল্-গ্যাস্ পাওয়া যায়। রাস্তাঘাট আলো করিতে, নানারকম কল-কারখানা চালাইতে এই গ্যাসের খুবই চাহিদা।

কোল্-গ্যাসের কারখানা তোমরা বোধ হয় দেখ নাই। সে এক বিরাট্ ব্যাপার। বিরাট্ হইবার কারণও আছে। কয়লাকে পোড়াইলে শুধু তো গ্যাস্ই বাহির হয় না—আরও কতকগুলি জিনিষ সেই সঙ্গে বাহির হয়; যেমন ধর, আলকাৎরা, এমোনিয়া, সায়ানাইড্, কোক্ ইত্যাদি। এগুলিকে ফেলিয়া দিলে চলে না—নানারকম বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ে এগুলির খুব আদর; তাই নানারকম ফন্দী-ফিকির করিয়া এদের ধরিয়া
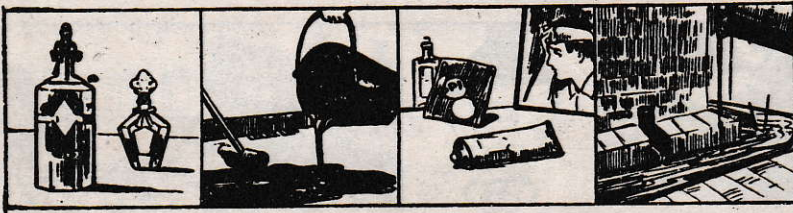
সুগন্ধি দ্রব্য　　রাস্তার জন্য পিচ　　ঔষধ (মাথা ধরার, জ্বরের)　　শোধক (Disinfectant)

রাখিতে হয়, এবং শুধু ধরিয়া রাখা নয়, একটা অন্যটা হইতে পৃথক্ করিয়া—শোধন করিয়াও লইতে হয়। সেই সব ফন্দী-ফিকিরের ব্যবস্থা করিতে গিয়াই কোল্-গ্যাসের কারখানা মস্ত বড় হইয়া পড়ে।

কয়লা হইতে যে আলকাৎরা বাহির হয় সে এক আজব চীজ্। গ্যাস-ব্যবসার প্রথম যুগে এগুলি ছিল এক মহা ঝঞ্ঝাটের জিনিষ। কোথায় এগুলি রাখা যাইবে, কোথায় এগুলি ফেলা যাইবে—এই চিন্তায় কারখানার মালিকদের ঘুম বন্ধ হইবার যোগাড় হইয়াছিল। তারপর পণ্ডিতেরা নানারকম পরীক্ষা করিয়া আবিষ্কার করিলেন—এগুলির মধ্যে দু'-একটা দামী দামী মাল-মশলা আছে—সেগুলি বাহির করিতে পারিলে লাভ মন্দ হয় না। এমনিভাবে তখনকার মত জিনিষটার একটা গতি হইল। কিন্তু তারপরই

হইল অবাক্ কাণ্ড। এক পণ্ডিত আলকাৎরা লইয়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তার মধ্য হইতে এক চমৎকার টুক্‌টুকে লাল রং বাহির করিয়া বসিলেন। তখন দলে দলে বৈজ্ঞানিক আসিয়া আলকাৎরা লইয়া গবেষণায় মাতিয়া গেলেন। ফলে আলকাৎরা হইতে যেন এক আলাদীনের মায়াপ্রদীপ বাহির হইয়া আসিল। এত হরেক রকমের জিনিষ আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা এই আলকাৎরা হইতে বাহির করিতেছেন যে, শুনিলে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না; অথচ কি আশ্চর্য্য রকম সস্তায় সেগুলি বাহির হইতেছে! কত রকম রং—লাল, নীল, সবুজ, হল্‌দে, বেগুনী, খয়েরী, কমলা—কোনটাই বাদ যায় নাই, বাজারে যত রকম রং দেখা যায় তার বেশীর ভাগই এই আলকাৎরা হইতে তৈরী নকল রং। আগে আমাদের দেশে কত নীলের চাষ হইত, সে সব তো এই নকল নীলের পাল্লায় পড়িয়া এক দম উঠিয়া গিয়াছে।

শুধু রংই নয়; কত রকম সুগন্ধি—যা নানা এসেন্সের নাম নিয়া বাজার মশ্‌গুল্

স্যাকারিন্ | নানাপ্রকার বাসনপত্র ও বিজলীর সরঞ্জাম | ফটোগ্রাফের ডেভেলপার | ন্যাপ্‌থ্যালিন (কীটনাশক)

করিয়া রাখিয়াছে, কত রকম ওষুধ—জ্বরের, মাথা ধরার, ঘুমের, অন্যান্য মারাত্মক ব্যারামের—যা প্রত্যহ হাজার হাজার লোককে অপরিসীম যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতেছে, আবার কত রকম মারাত্মক মারাত্মক বিস্ফোরক—যা পৃথিবীশুদ্ধ লোককে তটস্থ করিয়া রাখিয়াছে—সব তৈরী হইতেছে এই এক আলকাৎরা হইতে। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য ফিনাইল্, কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্, ন্যাফ্‌থ্যালিন্—এগুলিও এই আলকাৎরারই দান। খাবার জিনিষও বাদ যায় নাই। যেমন ধর, স্যাকারিন্—যার একটা দানা দিয়া এক গ্লাস সরবৎ তৈরী করা যায়। এক ছটাক স্যাকারিন্ এক ছটাক চিনির চেয়ে পাঁচ শ' গুণ বেশী মিষ্টি।

আলকাৎরা হইতে আর একটা জিনিষ পাওয়া যায়—তার নাম পীচ্। আজকাল রাস্তাঘাট বাঁধাইতে, বাড়ীঘর মেরামত করিতে এই পীচের খুব চাহিদা।

এই তো গেল আলকাৎরা। এমোনিয়া জিনিষটিও নেহাৎ ফেলা যায় না। নানারকম বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ে এর আদর। বরফের কারখানায়, সোডার কারখানায়, জমিতে সার দিবার কাজে রাশি রাশি এমোনিয়ার প্রয়োজন। তা' ছাড়া ডাক্তারী ওষুধ-বিষুধে তো আছেই।

গ্যাস্-কারখানায় কয়লা পোড়াইবার পর যে অংশটুকু পাত্রে পড়িয়া থাকে তাহাও কোক্—যদিও তার মধ্যে অঙ্গারের অংশ কোক্-ওভেনে তৈরী কোকের চাইতে কম। জ্বালানী হিসাবে এগুলিও ব্যবহার করা চলে। এসব ছাড়াও কোল্-গ্যাসের কারখানা হইতে আরও ২।৪ রকমের জিনিষ বাহির করা যায়। তবে তা নির্ভর করে কোথাকার কয়লা এবং সে কয়লায় কি কি বাজে জিনিষ (যেমন ধর—গন্ধক) কতটা পরিমাণ আছে তার উপর।

আজকালকার পণ্ডিতেরা আবার কয়লাকে বন্ধ পাত্রে পূরিয়া অতি কৌশলে এবং খুব অল্প তাপে পোড়াইয়া আরও কতকগুলি নূতন নূতন জিনিষ বাহির করিতেছেন: যেমন ধর, সম্পূর্ণ ধোঁয়াহীন কোক্, লুব্রিকেটিং অয়েল, অয়েল-এঞ্জিন চালাইবার উপযোগী পেট্রোলের মত তেল ইত্যাদি। ভাল কথা, আলকাৎরা হইতে কম খরচে পেট্রোল তৈরী করিবার চেষ্টাও পণ্ডিতেরা করিতেছেন এবং খানিকটা সফলকামও হইয়াছেন। একজন পণ্ডিত এমন কথাও বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে তিনি এই আলকাৎরার সাহায্যে এক এক গ্যালন্ পেট্রোল তু' আনা দামে বাজারে ছাড়িতে পারিবেন। (এখন এক গ্যালন্ পেট্রোলের দাম প্রায় পাঁচসিকা।)

কয়লা হইতে কি রকম সব রকমারি অদ্ভুত জিনিষ বাহির করা যায় তা' বলিলাম। এইবার কয়লা সম্বন্ধে আর একটা ভারী মজার কথা বলিব। কয়লা সাধারণতঃ তিন আকারে পৃথিবীতে দেখা যায়। এক নম্বর—আমাদের সাধারণ কয়লা। এগুলি আবার নানা 'জাতের' আছে। তুই নম্বর—গ্র্যাফাইট্। এগুলি সাধারণ কয়লার মত অতটা নোংরা নয়—দেখিতে একটু কাল্‌চে হইলেও বেশ ঝক্‌ঝকে। গ্রামোফোনের রেকর্ডে এই গ্র্যাফাইট্ খুব ব্যবহার করা হয়, আর হয় তোমরা যে পেন্সিলে লেখ তার শীষ তৈরী করিতে। এক রকম কাদার সঙ্গে গ্র্যাফাইট্ মিশাইয়া এই শীষ তৈরী হয়। কোন কোন বিজলী বাতিতেও (আর্ক্ লাইট্) এই গ্র্যাফাইট্ ব্যবহৃত হয়।

তিন নম্বর রূপটির কথা বলিতে আমি একটু ভয় পাইতেছি। তোমরা হয়ত সন্দেহ করিয়া বসিবে—আমার মাথায় একটু ছিট্ আছে। কিন্তু বাস্তবিক আমার মাথায় কোন

ছিট্ নাই, তোমাদের সত্যি কথাই বলিতেছি। কয়লার এই রূপটি হইতেছে হীরা, হ্যাঁ হীরা—মাণিকের সেরা হীরা। বৈজ্ঞানিকেরা অনেক পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিয়াছেন, এক টুক্‌রা হীরাও যা দিয়া তৈরী, একটা নোংরা, কুৎসিত, কদাকার কয়লার টুক্‌রাও ঠিক তাই দিয়াই তৈরী—সেই এক অঙ্গার, কোনও তফাৎ নাই!

কিন্তু কেমন করিয়া এই ব্যাপার হইল! কয়লার জন্মকাহিনী তোমাদের আগেই বলিয়াছি। বলিয়াছি, পৃথিবীর উপরকার জঙ্গল মাটীর তলায় চাপা পড়িয়া ক্রমে কয়লা হইয়া যায়। পৃথিবীর ভিতরে অনেক—অনেক নীচে যুগ যুগ ধরিয়া অসংখ্য অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। নানা রকম ধাতু সেই প্রচণ্ড উত্তাপে তরল হইয়া সেখানে অবিরাম টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতেছে—আর তার উপর লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি মণ পাথর দিবারাত্র প্রচণ্ড চাপ দিয়া বসিয়া আছে। আমাদের পরিচিত খানিকটা কয়লা হয়ত কোন গতিকে সেই তরল আগুনের মধ্যে মিশিয়া গেল। তারপর এক-আধ দিন নয়, লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া তার উপর দিয়া কত না ঝঞ্ঝা বহিয়া চলিল। ফলে আমাদের কয়লা একটু একটু করিয়া বদ্‌লাইতে লাগিল। তারপর হয়ত একদিন কোন এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সেই আগুনের ভিতরকার খানিকটা অংশ ছিটকাইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। তখন দেখা গেল সে আর কয়লা নাই, আগুনের স্নানে শুদ্ধ হইয়া সে হইয়া গিয়াছে রত্নের সেরা হীরা। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এই ভাবেই কয়লা হইতে হীরার জন্ম।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবিতেছ—তবে তো চেষ্টা করিলে সম্ভবতঃ কয়লাকে নকল উপায়ে হীরা করা যাইতে পারে। পণ্ডিতেরা কেন সে চেষ্টা করেন না? করিয়াছেন বই কি! মোয়াজাঁ নামে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক বিদ্যুতের চুল্লীর দারুণ উত্তাপে কয়লাকে গালাইয়া তরল লোহার সঙ্গে মিশাইয়াছেন। তারপর তাকে হঠাৎ ঠাণ্ডা করিয়া দেখিয়াছেন সেই কয়লা সত্যি সত্যিই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরার কণায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! দুঃখের বিষয় সে হীরাগুলি এত বেশী ছোট হইয়াছে এবং তা' তৈরী করিতে এত বেশী খরচ পড়িয়াছে যে, আসল হীরার চাইতে নকল হীরার দামই হইয়াছে বেশী! কে জানে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতেরা সস্তায় কয়লা হইতে বড় বড় হীরার টুক্‌রা তৈরী করিতে পারিবেন কিনা? যদি পারেন তবে কয়লাকে আর যাই কর, নোংরা বা খেলো জিনিষ বলিয়া তাচ্ছিল্য করা আর চলিবে না।

* বিমলচন্দ্র ঘোষ *

খোকন সোনা হেলে দুলে গান গেয়ে পথ হাঁটে।
চাঁদনী বুড়ি চাঁদে তখন সোনার চরকা কাটে॥
স্বপ্ন-সুতোর জ্যোৎস্না দিয়ে জড়ায় আকাশ মাটি।
তেপান্তরের স্বপ্নে খোকন বেড়ায় হাঁটি হাঁটি॥

অন্ধকারে জোনাক জ্বলে খোকন যখন হাসে।
মুক্তা জ্বলে শিশির-ঝরা পান্নাবরণ ঘাসে॥
মায়ের বুকের স্বপ্নে গড়া ছোট্ট কচি মুখে।
হাসির মাণিক ছড়ায় আলো শিহরজাগা সুখে॥

খোকন চলে দিগ্বিজয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া।
ঝলমলানো ডানার আলো ছড়ায় জগৎজোড়া॥
কড়ির পাহাড় হাড়ের পাহাড় হুড়মুড়িয়ে ভাঙে।
ঢেউ ওঠে নীল আকাশ ছুঁয়ে ঘুমভাঙানি গাঙে॥

সূয্যিমামার মশাল হাতে পুব আকাশের বুকে।
ভোরের বেলা খোকন জাগে অরুণ-রাঙা মুখে॥
ঢেউ খেলে যায় ফসলভরা শ্যামল ধানের ক্ষেতে।
ভোমরা ডাকে রঙবেরঙের ফুলের সৌরভেতে॥

বীরের সাজে খোকন যখন ঢাল-তরোয়াল ধরে।
রাক্ষস আর খোক্কসেরা ভয়েই কেঁপে মরে॥
ভূত-পেত্নী অন্ধকারে প্রাণটি নিয়ে পালায়।
খোকন যখন অন্ধকারে রক্তমশাল জ্বালায়॥

রকেট্-রথে খোকন ছোটে মঙ্গলে আর চাঁদে।
মাটির মায়ের আকাশ জয়ের অমল আশীর্বাদে॥
রূপকথা নয় জীবন ঘেরা তিন ভুবনের পথে।
খোকন হাঁটে শান্তি-সুখের শুভ্র মনোরথে॥

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

যাদুবাবু বাড়ী ফিরে দেখলেন, টেবু আর পানি হাঁ করে দোতলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

তিনি হাঁক দিয়ে বললেন, সন্ধ্যেবেলা পড়াশোনা নেই? ওপরের দিকে দেখছিস কি উটের মতো গলা উঁচু করে?

টেবু তাড়াতাড়ি একখানা বই টেনে নিয়ে এলোপাথাড়ি পড়া সুরু করে দিল। পাঠান রাজত্বের পতনের কারণ। পাঠান, পাঠান, পাঠান রাজত্বের···

পানি কিন্তু ভয় পাবার পাত্র নয়। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমরা কি করব? বই নিয়ে বসেছি, আর···

সত্যিই ত! ছেলেমানুষ, ওদের দোষ কি? অত আওয়াজে পড়া যায়?

গলা নরম করে বললেন যাদুবাবু, তোদের মা কোথায় রে?

পানি বলল, বোঁচনকে নিয়ে মা পাঠ শুনতে গেছে ঠাকুর-বাড়ীতে।

আবার দপ করে জ্বলে উঠল যাদুবাবুর জুড়িয়ে আসা মাথা। তিনি বললেন, টেবু লেখ ত!

ভয়ে ভয়ে জবাব দিল টেবু, কাল হাতের লেখা নেই বাবা।

—ধেৎ গাধা, বলছি একটা চিঠি লেখ।

—কাকে? বড় পিসিমাকে?

—তর সইছে না তোর, না? আমি যা বলছি, তাই লিখে যা একখানা কাগজে।
খাতার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে টেবু বসল ঘটা করে কলম বাগিয়ে।
যাদুবাবু বলতে লাগলেন, লেখ—

মহাশয়, প্রতিদিন সন্ধ্যায় ও সকালে আপনি রেডিও বাজাইয়া আমার পূজাহ্নিক ও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার বিঘ্ন করেন। বার বার বলা সত্ত্বেও বাথরুম ও রান্নাঘর মেরামত করিয়া দেন নাই। এ অবস্থায় আপনার বাকী ভাড়া আমি দিতে সম্মত নহি। নোটিশযোগে ইহা জানাইতেছি। ইতি—

তাং ২৮শে ভাদ্র, ১৩৬৪ শ্রীযাদুগোপাল ভঞ্জ

চিঠি শেষ করে বললেন, যা, দোতলায় বাড়ীওয়ালা বাবুকে দিয়ে আয়। দেরী করিস নে, এসে অঙ্ক করতে হবে।

টেবু তিন লাফে বেরিয়ে গেল।

রেডিও তখন সপ্তমে উঠেছে। লম্বা একটা হিন্দী গান হচ্ছে। রেলগাড়ী চলার মত যেন তার শব্দ।

উত্যক্ত হয়ে যাদুবাবু বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। না, এর আজ একটা প্রতিকার করতেই হবে!

ঠিক সেই সময় দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন স্বয়ং কামাখ্যাবাবু অর্থাৎ বাড়ীওয়ালা। একগাল হেসে বললেন, কি ব্যাপার যাদুবাবু? হঠাৎ এই চিঠি কেন?

মুখ গোমড়া করে যাদুবাবু বললেন, কেন, তা ত ওর মধ্যেই আছে!

কামাখ্যাবাবু বললেন, আপনার রান্নাঘর আর বাথরুম ত কবেই মেরামত করিয়ে দিয়েছি। আর নূতন কি করতে হবে বলুন, করে দোব।

—আর করতে হবে না মশাই, আমি সুবিধা হলেই উঠে যাব। আপনার বাড়ীতে থাকা সম্ভব নয়!

—আহা উঠব বললেই কি হয়? আমি আপনাকে উঠতে দিলে ত উঠবেন!

—আপনি জোর করে আটকে রাখবেন নাকি?

—তা পারলে ছাড়ব কেন? দেখুন বাড়ীতে থাকা না থাকায় ভাড়াটের যেমন খুসী বলে একটা জিনিস আছে, বাড়ীওয়ালারও তেমনি ভাড়াটে রাখা না রাখাতে একটা খুসী বলে জিনিস আছে ত!

—আপনার খুসীর ধার ধারি না আমি।

—খুব ধারেন। আপনিও আমার ধারেন, আমিও আপনার ধারি। নইলে এত খরচ-পত্র করে মেরামতিগুলো করিয়ে দিলাম কেন?

এবার যাত্নবাবুর ধৈর্য্যচ্যুতি হল। তিনি বললেন, আপনি কি আমাকে পাগল মনে করেছেন?

—কি করি বলুন? আপনি নিজেই যদি তা প্রমাণ করেন···

—দেখুন কামাখ্যাবাবু, আপনি কিন্তু···

পানি দেখল ব্যাপারটা ঝগড়ার চেহারা ধরছে। সে বলে উঠল, ও সব ত কবেই সারান হয়ে গেছে বাবা! সেই যখন বুলামাসী এসেছিল, তখন!

যাত্নবাবু ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, হয়েছে, তা আমাকে কি বলেছিস কোন দিন?

—তুমি দেখ নি কেন? রোজ ত চান করো!

যাত্নবাবু জবাব দিলেন না।

কামাখ্যাবাবু বললেন, আর রেডিও! আপনি বলার পর থেকে সকাল বিকাল রেডিও বাজানো আমি বারণই করে দিয়েছিলাম বাড়ীতে। হঠাৎ আপনার স্ত্রী সেদিন ওপরে গিয়ে বললেন—বেশ একটু গান-টান হত। কাজকর্ম্মের ভেতর শুনতে ভালো লাগত!···মেয়েরা আপনার নিষেধের কথা জানান। তিনি তাতে বলেন—এখন থেকে আমি নিজে এসে খুলে দিয়ে যাব।···এখনো তিনি ওপরে আছেন এবং তিনিই রেডিও খুলে গান শুনছেন।

বলতে বলতে চটি ফটফট করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন কামাখ্যাবাবু।

টেবু ইতিমধ্যে কখন নেমে এসে ভালো মানুষটির মত পড়তে বসেছে।

যাত্নবাবু বললেন, টেবা, তোর মা কি ওপরে আছেন? গান শুনছেন?

ভ্যাবাচাকা খেয়ে টেবু বলল, হ্যাঁ বাবা!

—আমাকে বলেছিলি সে কথা?

টেবু জবাব দিল না। ফ্যাঁস করে উঠল পানি, বলব কখন? তুমি ত খালি বকছ সন্ধ্যে থেকে।

মাছির কারসাজি

শ্রীনীলরতন দাশ

নামটি তার ফেলারাম, সবাই ডাকে ফ্যালা ;
পাড়ায় পাড়ায় করে বেড়ায় দুষ্টামি আর খেলা।
ফ্যালার জ্বালায় থাকে নাকো ফুল বাগানে ফুল,
পাড়ার গাছে রাখে না সে কাঁচা আম ও কুল।
একবার সে বালুরঘাটে মামার বাড়ী যায়,
দুপুর বেলা সহরটারে দেখতে বাহিরায়।
ময়রার এক দোকানে সে দেখলো থরে থরে,—
সাজানো সব মণ্ডা-মিঠাই আছে থালার 'পরে।
দোকান ঘরে আর কেহ নাই, আছে শুধু বিশু ;
ময়রার সে ছোট্ট ছেলে, পাঁচ বছরের শিশু।

ফ্যালা গিয়ে সেই দোকানে সটান পড়ে ঢুকে,
থালা থেকে মিঠাই তুলে পুরতে লাগল মুখে!
বিশু তারে শুধায় রেগে, "কে তুই ব্যাটা পাজি ?"
খেতে খেতে বললো বিশু—"নামটি আমার মাছি।"
বিশু তখন বাড়ীর ভিতর বাপকে বলে যেয়ে,—
"দেখ বাবা, মাছি এসে মিঠাই ফেলে খেয়ে।"
বিশুর বাবা বললো রেগে, "মাছি কতই খাবে ?
তাড়িয়ে দে না, তা হলেই ত মাছি উড়ে যাবে।"
ফ্যালা এদিক্ পেটটি পুরে মিঠাই খেয়ে নিয়ে
দোকান থেকে পড়লো সরে, উঠলো বাড়ী গিয়ে।

১৩৫৮

বাঞ্ছারামের ইচ্ছে

শ্রীবিমল মিত্র

বাঞ্ছারামের ইচ্ছে হ'লে কিচ্ছু তার অসাধ্য নাই!
বাব্‌লা গাছে ধরায় কাঁটাল—কাঁটাল গাছে মাসকলাই!
ইস্কুলে তো পড়িস্ সবাই বিদ্যের সব জাহাজ শুনি—
একটা ক'রে প্রশ্ন করি—বল্ তো ন্যাড়া, ক্যান্ত, ঝুনি!

কলম্বাসটা কোন্‌খানে আর কামস্‌কাট্‌কা কে বলো ?
টোকিওতে কোন্ সালেতে মাঞ্চুরিয়ার বে' হ'লো ?
ছ'মাস ধ'রে উপোস ক'রে কুম্ভকর্ণ বাঁচ্‌তো কিসে ?
বল্‌তে পারে—মোনার মামা, বোঁচার কাকা, ঝুনির পিসে ?
আমিই কি সব বল্‌বো নাকি ?···তোদের পেটে কিচ্ছু নাই ?
ইচ্ছে হ'লে বল্‌বো বৈ কি,—ইচ্ছে কেবল হওয়া চাই !
এই তো সেদিন ইচ্ছে হ'লো—ছিলাম ডুবে নদীর জলে ;
সারাটা রাত আয়েস ক'রে সকালবেলা এলাম চ'লে !
সে'বার আমার মামার বাড়ী, ইচ্ছে হ'লো—লাগাই তাগ্—
এক ঘুঁসিতে সাব্‌ড়ে এলাম জ্যান্ত গোটা পাঁচেক বাঘ !
যোগেশকে তুই জিগেস্ করিস্—ওদের বাড়ী সেদিন বিয়ে,
এক জালা জল সাব্‌ড়ে দিলাম একটি শুধু চুমুক দিয়ে !
খুব বেশী নয়—এই তো সে'বার—খুব বড় জোর দু'মাস আগে—
আমার সঙ্গে নন্ত খুড়ো গিয়েছিল হাজ্‌রীবাগে ।—
মস্ত দু'টো জন্তু এসে নন্ত খুড়োর চড়্‌লো ঘাড়ে,
আমিই তা'দের দন্তপাটি উপ্‌ড়ে ফেলি দুই আছাড়ে !
তর্ক ক'রে লাভ কি দাদা, জানে সেদিন সত্য কামার—
বাঞ্ছারামের হস্তে—শুনিস্—কী লাঞ্ছনা পঞ্চু মামার !
তবে যদি বলিস্—সেদিন পট্‌লা পিটে কর্‌লে খুন,
আমি কেন দিই নি দু'ঘা—মুখটি ছিল শুক্‌নো চূণ ;
পিট্‌লে, তা' সে বেশ ক'রেছে, পিটেই সে তো কর্‌বে ঘা'ল—
ইচ্ছে হ'লে দেখিয়ে দিতুম—ক'সের ধানে ক'সের চাল !

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র সাত বছর আগে জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছিল ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। তার দু দিন পরে ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখ ফ্রান্স ও বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। সেই থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বা ইংরাজীতে যাকে Second World War বলে, তার আরম্ভ এবং ছয় বছর পর সেই যুদ্ধ শেষ হলো ১৯৪৫ সালে বা বছর দেড়েক আগে।

কিন্তু একে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বলে কেন? পৃথিবীতে কোন কালেই যুদ্ধ-বিগ্রহের অভাব ছিল না, যদিও আমাদের এই ভারতবর্ষে ইংরেজ আমলে কোন বড় যুদ্ধ হয় নি। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট হলো এবং সেই থেকে ইংরাজ রাজত্বের সুরু—বাঙ্গলার কয়েকজন হিন্দু-মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছিল। তারপর আজ পর্য্যন্ত প্রায় দুশো বছর ধরে আমরা কোন বড় যুদ্ধ করি নি। তবে ইংরাজের ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে অনেক সিপাই অনেক দেশে লড়েছে, কিন্তু সেগুলো আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ নয়। তবু, পৃথিবীতে অনবরত যুদ্ধ লেগেই আছে। এমন কি কোন কোন পণ্ডিত বলেন, পৃথিবীতে মোট যুদ্ধের সময় শান্তির সময়ের চেয়ে অনেক বেশী। শান্তি শুধু এসেছিল আর একটা যুদ্ধ বাধাবার জন্য। যদি তাই হয়, তবে আমাদের চোখের সামনে যে যুদ্ধটা ঘটে গেল, সেটাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বলে কেন?

এটা সবাই জানে যে, আমাদের পৃথিবীটা পাঁচটা মহাদেশ—এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া নিয়ে গঠিত। আবার কতকগুলি সমুদ্র এবং মহাসমুদ্রও পৃথিবীকে ঘিরে আছে। আগেকার দিনে, এমন কি পঞ্চাশ বছর আগেও যে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটেছে, তাতে গোটা পৃথিবী জড়িয়ে পড়ে নি। হ্যানিবল, সীজার, আলেকজান্দার থেকে সুরু করে নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জন্মেছেন, কিন্তু গোটা বসুন্ধরাকে ভূমিকম্পের মত কেউ কাঁপাতে পারেন নি। তাঁরা যে দুর্ব্বল ছিলেন, তা নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের বুদ্ধি ও বীরত্বের সঙ্গে আজও অনেকের তুলনা দেওয়া যায় না। কিন্তু তখন বিজ্ঞানের এবং কলকারখানার এত উন্নতি হয় নি—টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার, এরোপ্লেন, যুদ্ধজাহাজ, ট্যাঙ্ক ইত্যাদির পাত্তা ছিল না। বিদ্যুৎ, বাষ্প, পেট্রোল ইত্যাদির এমন অদ্ভুত ব্যবহার জানা ছিল না; পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গে এত যোগাযোগ, সংবাদ আদান-প্রদান ও ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং এক গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আরেক গবর্ণমেণ্টের এত নিবিড় সম্পর্ক ছিল না। সুতরাং তখন ইউরোপের এক দেশে যুদ্ধ বাধলে, আমেরিকা বা এশিয়ার লোকে হয়তো অনেক দিন পর্য্যন্ত কোন খবরও পেতো না। কিন্তু বিজ্ঞান ও কলকারখানার উন্নতি সারা পৃথিবীকে ছেয়ে ফেললো এবং আজকের দিনে হাজার হাজার মাইল দূরবর্ত্তী নিউ ইয়র্কের (আমেরিকা) খবরও লণ্ডন হয়ে মাত্র পাঁচ মিনিটের ভিতর আমরা কলকাতায় বসে পেতে পারি। তার ও বেতারের এমনি মহিমা! তা'ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত দেশের গবর্ণমেণ্ট-গুলিই ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতির জন্য পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুতায় আবদ্ধ, কিংবা এক দল অন্য দলের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। সুতরাং বর্ত্তমানে কোন এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের লড়াই বাধলে, সেটা খুব দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমে সমুদ্র ও আকাশ ডিঙ্গিয়ে যেন দুনিয়াটাকে গ্রাস করে বসে। এটা প্রথম ঘটেছিল ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত। সেটাকে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ বা First World War বলে। কেননা সেই যুদ্ধে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়া জড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীব্যাপী এত বড় মহাযুদ্ধ তার আগে আর অনুষ্ঠিত হয় নি,—চল্‌তি ভাষায় বলা যেতে পারে ৩৬ জাতের সংগ্রাম। আগে যুদ্ধ হতো রাজায় রাজায় বা সেনাপতিতে সেনাপতিতে, কিংবা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে কারু শৌর্য্য প্রকাশ বা সম্পদ ও প্রভুত্ব বৃদ্ধির জন্য। এক্ষণে যুদ্ধ বাধে জাতিতে জাতিতে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এবং তার লক্ষ্য থাকে দুনিয়ার এক প্রকাণ্ড অংশের উপর জমিদারী ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মানী ছিল নাটের গুরু, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও তাই। জার্ম্মানীর ইচ্ছা ছিল ইংরাজ, ফরাসী, মার্কিন প্রভৃতির উপর জয়-নিশান উড়িয়ে আফ্রিকা ও এশিয়া পর্য্যন্ত নিজের রাজ্য বিস্তার। কিন্তু চার বছর ধরে একটানা লড়াই করে জার্ম্মানী এতগুলি শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারলো না। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে জার্ম্মানী পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হলো এবং পরের বছর ভার্সাই সহরের সন্ধিপত্রের দ্বারা জার্ম্মানী সর্ব্বস্বান্ত হলো।

রাশিয়াকে বাদ দিলে ইউরোপ মহাদেশটা আমাদের ভারতবর্ষের চেয়ে বড় নয়। কিন্তু

এই ছোট্ট মহাদেশটার মধ্যে ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান, ইতালীয়ান, তুর্কি, ওলন্দাজ ইত্যাদি বহু সমৃদ্ধিশালী ও প্রাণবন্ত জাতির বাস। প্রায় তিনশত বছর ধরে এদেরই প্রভুত্ব চলছে পৃথিবীর নানা অংশে। এরা প্রত্যেকেই অপরকে ডিঙ্গিয়ে বড় হতে অর্থাৎ অন্য দেশের ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে শক্তিশালী হতে চায়। কিন্তু পৃথিবীতে এতগুলি বড়র জায়গা নেই। ফলে এদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও বিবাদ অনবরত লেগেই আছে। আগের দিনে ডাকাতরা যেমন লুঠের মাল নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতো, এটাও কতকটা সেই ধরনের। এই ঝগড়া চরমে উঠলেই যুদ্ধ বেধে যেতো এবং ফলে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়তো। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মানী হেরে গেল এবং ইংরাজ, ফরাসী বা মিত্রপক্ষ তার সমস্ত রাজ্য, উপনিবেশ এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য কেড়ে নিলে। আগেই বলেছি, ইউরোপের জাতিগুলি খুব প্রাণবন্ত, এদের মধ্যে তখনকার দিনে আবার ফ্রান্স ও জার্ম্মানী ছিল সেরা, বিশেষতঃ যুদ্ধবিদ্যায় এদের সঙ্গে কেউ পেরে উঠতো না। জার্ম্মানীর মধ্যে প্রুশিয়ার অধিবাসীরা, যাদের প্রুশিয়ান বলে, তারা ছিল জাত যোদ্ধা, তারা আবার জমিদার এবং অভিজাত। আর জার্ম্মান জাতি ছিল গর্ব্বিত, দেশপ্রেমিক এবং সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে ও কলকারখানায় আর সঙ্ঘশক্তিতে খুব অসাধারণ। সুতরাং ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে হেরে গিয়ে তাদের মনে খুব আঘাত লাগলো, তারা অপমানিত বোধ করলো, আর তাদের দেশে খুব দারিদ্র্য দেখা দিল। লক্ষ লক্ষ শিশু এক ফোঁটা দুধ পায় নি। সুতরাং জার্ম্মানরা মনে করলো এই দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য দায়ী ইংরাজ-ফরাসী। সুতরাং তারা প্রতিশোধ নেওয়ার কথা ভাবতে লাগলো।

এ সময় হিট্‌লার নামে একটি লোক দেখা দিলেন। তাঁর জন্ম অষ্ট্রিয়ায় (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ, ২০শে এপ্রিল)। বিদ্যা তার সামান্য—স্কুলের নিম্নশ্রেণী পর্য্যন্ত। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি একজন অতি সাধারণ ও নগণ্য সৈন্য ছিলেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তাঁর রাজনীতির দিকে ঝোঁক ছিল এবং জার্ম্মানী খুব বড় হবে, এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তিনি দৃঢ়চেতা, সাহসী এবং মেজাজী লোক ছিলেন। তাঁর চরিত্রের শক্তিও ছিল খুব এবং জার্ম্মানজাতির বিশুদ্ধতার দিকে তাঁর নজর ছিল। অসামান্য প্রতিভা তাঁর ছিল, সন্দেহ নেই। কিন্তু কতকগুলি মারাত্মক দোষও ছিল তাঁর। জাতিবিদ্বেষ ছিল তাঁর-গভীর, একমাত্র জার্ম্মানরা ছাড়া আর্য্য কেউ নয়, এই ছিল তাঁর ধারণা। ইহুদী জাতিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন, আর ঘৃণা করতেন সাম্যবাদ বা রাশিয়ার কমিউনিষ্ট মতবাদকে। তিনি জোর করে পরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া এবং অন্য দেশের স্বাধীনতা হরণ করা দোষের মনে করতেন না, বরং এর দ্বারা জার্ম্মানী বড় হবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তিনি ভাবতেন ইংরাজ-ফরাসী পৃথিবীতে যখন গায়ের জোরে বড় হয়েছে, জার্ম্মানীই বা পারবে না কেন ? তাঁর মতে এক দিকে ইহুদীরা এবং অন্য দিকে সাম্যবাদীরাই ইউরোপে যত অনর্থের মূল। সুতরাং ক্ষমতা হাতে পেয়েই অর্থাৎ জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বময় প্রভুর আসন দখল করেই তিনি এ সমস্তের দিকে মন দিলেন।

তার আগে তিনি 'জাতীয় সমাজতন্ত্রী দল' নামে একটি শক্তিশালী পার্টি গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই পার্টির নেতা হিসাবেই তিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করলেন। জার্ম্মানীর বড় বড় ব্যবসা অভিজাত ও সমর-বিলাসীরা হিট্‌লারকে সাহায্য ও সমর্থন করলেন। কেননা তাঁরা মনে করলেন যে, হিট্‌লার বেশ শক্তিশালী লোক, তাঁর দলটিও বেশ কাজের। সুতরাং হিট্‌লারের প্রতিষ্ঠিত নাৎসী দল যদি গভর্ণমেণ্টের ভার পান, তা হলে জার্ম্মানী আবার বড় হবে এবং তাঁরা প্রত্যেকেই লাভবান হবেন—চাই কি আর একবার যুদ্ধে জয় লাভও করা যেতে পারে।

হিট্‌লার ক্ষমতা হাতে পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধবাদী সমস্ত দল ও নেতা এবং ইহুদী সম্প্রদায়কে উৎপাটন করলেন; পরে জার্ম্মানীকে বড় করবার জন্য আন্দোলন সুরু করলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়ের জন্য যে ভার্সাই সন্ধি স্বীকার করতে হয়েছিল এবং যার দ্বারা জার্ম্মানীর সর্ব্বনাশ হয়েছিল, তিনি সুযোগমত সেই সন্ধিপত্রের সর্ত্তগুলি একে একে অস্বীকার করলেন। ফলে, দেশপ্রেমিকরূপে তিনি অধিকাংশ জার্ম্মান অধিবাসীর চিত্ত জয় করলেন। তাঁর চেষ্টায় আবার লক্ষ লক্ষ জার্ম্মান সৈন্য গড়ে উঠলো, যুবকেরা সামরিক শিক্ষা পেল, গোপনে বড় বড় অস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা তৈরী হলো—এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক, কামান, বন্দুক এবং যুদ্ধ-জাহাজ ইত্যাদি অজস্র সমরসম্ভার প্রস্তুত হতে লাগলো। হিট্‌লারের নেতৃত্বে জার্ম্মানী আবার তার আগেকার রাইন নদীর তীরবর্ত্তী দেশ এবং খনির দেশগুলি (যেগুলি যুদ্ধের ফলে তার হাতছাড়া হয়েছিল) দখল করলো। ইংরাজ-ফরাসী হিট্‌লারকে কোন বাধা দিল না। সুতরাং হিট্‌লার দেশপূজ্য হয়ে উঠলেন এবং তাঁর ডিক্টেটরি ক্ষমতার নিকট লোক মাথা নত করলো।

হিট্‌লার আগেকার সন্ধিসর্ত্ত অগ্রাহ্য করে গোপনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন, একথা জেনেও ফরাসীরা আর ইংরেজরা বাধা দিল না কেন? এর রহস্য কি? এটা বুঝতে হলে রাশিয়া সম্পর্কে কিছু জানা দরকার। রাশিয়া আগে ছিল জারের বা সম্রাটের অধীনে এক প্রকাণ্ড দেশ। তখন জনসাধারণের দুঃখ, কষ্ট ও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। মিত্রপক্ষের দলে যুদ্ধে (প্রথম মহাযুদ্ধে) যোগ দিয়ে রাশিয়াও জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে লড়েছিল, কিন্তু রুশ সৈন্যেরা বিষম হেরে গেল, তাদের খাবারের জন্য রুটি, গায়ের কম্বল বা বন্দুকের গুলীবারুদ জুটতো না। দলে দলে তারা প্রাণ দিতে ও হেরে যেতে লাগলো। এদিকে রাশিয়ার বড় বড় সহরে জনসাধারণও খেতে পেতো না, তাদের কষ্ট যেন চরমে উঠলো,—অনেকটা আমাদের এই ১৩৫০ সালের বাঙ্গলাদেশের মত। তখন লেনিন নামে একজন মহাপুরুষ সেই দেশে দেখা দিয়েছিলেন। লেনিন ছিলেন জনসাধারণের সেবক, যেমন আমাদের দেশে গান্ধীজী। লেনিনের সাম্যবাদী দলে জনসাধারণ যোগ দিল। ১৯১৭ সালের নবেম্বর মাসে তারা বিদ্রোহ করলো। জার বা সম্রাটের শাসন উঠে গেল। কৃষক, মজুর, কেরানী, কর্ম্মচারী, দপ্তরী বা সাধারণ লোকে যারা এতকাল অত্যাচারিত ও দরিদ্র ছিল তারাই এখন দেশের শাসন চালাতে লাগলো। কমিউনিজম

বা সাম্যবাদ অনুসারে দেশ শাসিত হওয়ায় রাশিয়াতে আর ধনী বা টাকাওয়ালা লোক যেমন নেই, তেমনি ভিক্ষুক বা দরিদ্রও নেই। বড়লোক, ব্যবসায়ী, সুদখোর, কারবারি, জমিদার, তালুকদার, মহাজন ইত্যাদি যারা আমাদের দেশে কিংবা ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় জনগণের রক্ত শোষণ করে, রাশিয়াতে তাদের কোন পাত্তা নেই। সেখানে একজন লোকও বেকার নেই, নিঃস্ব বা ভিখারী নেই। সবই সুখী এবং প্রত্যেকেই লেখাপড়া করতে পারে। অসুখ হলে ডাক্তার বা ঔষধের কোন অভাব হয় না, থাকবার জন্য সকলেরই জায়গা আছে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী নেই। এক চমৎকার দেশ। পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। লেনিনের পর ষ্ট্যালিন এই দেশের নেতা হলেন এবং দেশটি খুব শক্তিশালী হয়ে উঠলো।

এদিকে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং পৃথিবীর সমস্ত বড়লোকের দেশ সোভিয়েট রাশিয়ার জন্য ভয় পেয়ে গেল। কারণ রাশিয়া বড় হয়ে গেলে এবং তাদের সাম্যবাদ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লে টাকাওয়ালা লোকেদের এত বাবুয়ানা আর অত্যাচার চলবে না। সুতরাং তারা রাশিয়াকে জব্দ করতে চাইলো। এদিকে জার্ম্মানীতে হিট্‌লার ছিলেন রাশিয়ার বিদ্বেষী এবং তিনি জানতেন যে, তিনি যদি রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার করেন, তবে সবাই তাঁকে সমর্থন করবে। সুতরাং হিট্‌লার বললেন যে, বলশেভিক বা কমিউনিষ্ট উৎপাত বন্ধ করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাঁকে তলে তলে সমর্থন করতে লাগলো। সেই সুযোগে তিনি ভার্সাই সন্ধির সমস্ত সর্ত্ত ভঙ্গ করতে লাগলেন এবং ক্রমে জার্ম্মানীর চারদিকে রাজ্য বাড়াতে লাগলেন। তিনি জোর করে অষ্ট্রিয়া দেশটা কেড়ে নিলেন। এতে কেউ কেউ প্রতিবাদ জানালো বটে, কিন্তু হিট্‌লার বাধা পেলেন না। তিনি আরও উৎসাহান্বিত হয়ে উঠলেন। চেকোস্লভাকিয়া নামে আর একটি দেশের তিনি একটা অংশ দাবী করলেন। কেননা সেখানে বহু জার্ম্মান বাসিন্দার বাস। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স আপোষে সেটাও ছেড়ে দিলেন। তখন হিট্‌লার সুযোগ পেয়ে গোটা চেকোস্লভাকিয়া দেশটাই কেড়ে নিলেন। এবারও অনেকে প্রতিবাদ জানালো, কিন্তু ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তারা বাধা দিলেন না। ইতালীতে মুসোলিনী ছিলেন হিট্‌লারের বন্ধু, তিনি সমর্থন করলেন। তারপর হিট্‌লার পোল্যাণ্ডের দিকে নজর দিলেন এবং বললেন, 'ডান্‌জিগ বন্দরটা আমায় ফিরিয়ে দিতে হবে।' কেননা ওটা আগে জার্ম্মানীরই ছিল। এই বন্দরটা বাল্‌টিক্ সমুদ্রের তীরে—পোল্যাণ্ডের এইটাই ছিল সমুদ্রে যাওয়ার পথ। জার্ম্মানীর তুলনায় সে ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল। অতএব সে আবেদন করলো ফ্রান্স, বৃটেন ইত্যাদির কাছে।

তখন ফ্রান্স ও বৃটেনের কর্ত্তারা বিপদ গণলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, হিট্‌লার কৌশলে ইউরোপের মনিব হয়ে বসতে চান এবং বিনা যুদ্ধেই সব দেশ কেড়ে নিতে চান। এতটা বাড়াবাড়ি তাঁরা পছন্দ করলেন না, কারণ জার্ম্মানী যদি ইউরোপের প্রভু হয়ে বসে, তবে ফ্রান্স ও

বৃটেনের আর মাতব্বরি থাকবে না। সুতরাং তাঁরাও প্রতিবাদ করলেন; কিন্তু হিট্‌লার শুনতে চাইলেন না। বাঘ যেমন রক্তের স্বাদ পেলে ক্ষেপে যায়, হিট্‌লারেরও তখন সেই অবস্থা। তখন ফ্রান্স ও বৃটেন এই বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক বন্ধুতা করতে চাইলেন। কিন্তু রাশিয়া মনে মনে জানতো কেউ তার বন্ধু নয়, সুযোগ পেলে সবাই তার ঘাড় মটকাবে। তবু, আত্মরক্ষার জন্য রাশিয়া ফরাসী ও ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুতা করতে রাজী হলো। কিন্তু তার সর্ত ছিল এই যে, রাশিয়ার বাল্‌টিক্ সমুদ্রের দেশগুলি, আর পোল্যাণ্ড—এগুলি সম্পর্কে ইংরাজ-ফরাসীর গ্যারেন্টি দিতে হবে এবং পোল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে রুশ সৈন্যকে যেতে দিতে হবে, যদি যুদ্ধ বাধে। কিন্তু পোল্যাণ্ড, বৃটেন বা ফ্রান্স কেউ এতে রাজী হলো না, তাদের ভয় ছিল পাছে সাম্যবাদী রাশিয়া এতে কোন সুবিধা পেয়ে যায়। তাঁদের আসল ইচ্ছা ছিল, জার্ম্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে লড়াই বাধানো—তাঁরা শুধু দূর থেকে দেখবেন। সুতরাং রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক বন্ধুতার কথা ভেঙ্গে গেল। তখন হিট্‌লার দেখলেন যে, এই তাঁর সুযোগ। রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেন ও ফ্রান্সের বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে, রাশিয়াকে হাত করতে পারলে পোল্যাণ্ডকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ-ফরাসীকে জব্দ করা যায়। সুতরাং তিনি বুদ্ধিমানের মত চাল দিলেন। আবার রাশিয়াও দেখলো যে, বৃটেন ও ফ্রান্স তাকে সাহায্য করবে না, অথচ জার্ম্মানী আক্রমণ এবং লড়াই করবেই। এদিকে যুদ্ধের জন্য তার প্রস্তুত হওয়া দরকার, এজন্য আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন, সুতরাং রাশিয়াও জার্ম্মানীর দিকে হাত বাড়ালো। এভাবে দুই শত্রু আত্মরক্ষার গরজে পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলালো ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে।

তখন হিট্‌লার নিঃশঙ্ক। ফ্রান্স ও বৃটেন হিট্‌লারকে ভয় দেখাবার জন্য বললো যে, যদি তিনি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন, তবে তারা জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কিন্তু হিট্‌লার গ্রাহ্য করলেন না। তিনি ১লা সেপ্টেম্বর ভোর রাতে (১৯৩৯ সাল) পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন, এবং দু'দিন পর বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হলো। এভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরু হলো এবং ১৯৪১ সালের মধ্যে সে যুদ্ধ ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। জল, স্থল ও আকাশ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল এবং কোটি কোটি মানুষের সাংঘাতিক বিপদ ঘটলো। একটি মাত্র ব্যক্তি এবং একটি মাত্র রাজ্যকে কেন্দ্র করে এত বড় প্রলয় মানুষের ইতিহাসে আর হয় নি। আজ যারা কিশোরবয়স্ক ছেলেমেয়ে তারা যখন বড় হবে, তখন এই ইতিহাস পড়ে তারা অবাক হয়ে যাবে এবং ভাববে সভ্য মানুষের দল এত বর্ব্বর হয় কি করে!

লোকে কথায় বলে, আমার অবস্থা এখন ত্রিশঙ্কুর মত। মানে—না এ-দিক, না ও-দিক্। মধ্যিখানে ভ্যাবা-গঙ্গারাম হয়ে ব'সে থাকা। যেমন আজকাল গেরস্থদের অবস্থা হয়েছে—তারা না-বড় লোক, না একেবারে শ্রমিক, সমাজের মধ্যিখানে ব'সে দু'ধার থেকেই ধাক্কা খাচ্ছে। ত্রিশঙ্কুর অবস্থাও একদিন তাই হয়েছিল।

ত্রিশঙ্কু ছিলেন একজন সেকাঁলের মস্ত বড় রাজা। দু-তিন বছর পরে পরে তিনি একটা না একটা বড় যজ্ঞ করতেন, আর সেই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও প্রজাদের যেমনি খাওয়াতেন-দাওয়াতেন, তেমনি দক্ষিণাও দিতেন। লোকে একেবারে রাজার নাম নিয়ে ধন্য ধন্য করে বেড়াত।

ব্রাহ্মণরা বাড়ী ফেরার সময় পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে খুশী মনে রাজাকে আশীর্বাদ ক'রে বলতেন—মহারাজ, আপনি গতজন্মের পুণ্যফলে এ-জন্মে রাজচক্রবর্ত্তী হয়েছেন, আবার এ-জন্মের পুণ্যফলে আপনার সশরীরে স্বর্গবাস হবে, বলে যাচ্ছি।

একথা শুনে মহারাজা ত্রিশঙ্কু তো আহ্লাদে ডগমগ—সশরীরে স্বর্গবাস বড় চাট্টিখানী কথা নয়, একেবারে দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসনের পাশে গিয়ে বসবেন, চিরকাল মহা আনন্দে অমৃত ভোগ খেয়ে, প্রত্যহ সন্ধ্যেবেলা নাচ-গানের জলসা শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে থাকবেন, মুনি ঋষিরাও হাত জোড় ক'রে সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন, এটা সহজ কথা নয়। ব্রাহ্মণদের কথার একটা দাম আছে নিশ্চয়—সশরীরে তিনি তাহলে যাবেনই—পৃথিবীতে মরবার সময় আর অসুখে-বিসুখে ভুগতে হবে না, দাঁত ছিরকুটে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে হবে না, একেবারে গট্‌মট্ করতে করতে স্বর্গে চলে যাবেন।

এই ভাবতে ভাবতে রাজা ত্রিশঙ্কু একদিন তাঁর প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে বলে উঠলেন—আচ্ছা মন্ত্রী, ব্রাহ্মণরা আমায় প্রায়ই বলেন, যে আমি নাকি এ-জন্মে যে-সব পুণ্যকাজ করছি তার ফলে সশরীরে স্বর্গে যাব—এটা কি ঠিক ?

রাজার কথা শুনে মন্ত্রী হেসে বললেন—না মহারাজ, মর্ত্তের দেহ নিয়ে স্বর্গে যাওয়া যায় না, শুনেছি যোগী পুরুষরা নাকি ইচ্ছে করলে মর্ত্তের দেহ থেকে বেরিয়ে অন্য আর একটা দেহ নিয়ে স্বর্গে ঘুরে আসেন কিন্তু আপনার পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না। তবে দেহ-ত্যাগের পর হয়তো স্বর্গে আপনি যেতে পারেন।

ত্রিশঙ্কু মন্ত্রীর কথা শুনে মহা চটে গেলেন—বললেন, তুমি কি তাহলে বলতে চাও ব্রাহ্মণরা সব মিথ্যে কথা বলেছেন? তাঁদের আশীর্বাদের একটা জোর নেই?

মন্ত্রী থতমত খাবার লোক নয়, তিনি গম্ভীরভাবে অথচ বিনীতভাবে বললেন তাঁকে—ব্রাহ্মণরা আপনাকে খোশামুদী ক'রে ও-কথাগুলো বলে গেছেন—ওসব কথা ধরবেন না।

ত্রিশঙ্কু আরও চটে মন্ত্রীকে বলে উঠলেন—তুমি একটা নির্বোধ—কিচ্ছু জ্ঞানগম্যি নেই তোমার। তোমার চোখের সামনে দিয়ে আমি সশরীরে স্বর্গে যাবই—দেখো।

সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী বলে উঠলেন—মহারাজ, আপনি যদি সত্যই সশরীরে স্বর্গে যান, আর তা দেখবার সেই ভাগ্য আমার হয়, তাহলে আমিও জানবো যে বহু জন্মের পুণ্যফলে এমন ঘটনা চাক্ষুষ দেখলাম। তবে স্বর্গে যাবার পূর্বে ও-খানকার পথ ঘাট সম্বন্ধে কিছু জেনে রাখা বোধহয় ভাল—কারণ, তাহলে আর কোথাও বাধা পাবেন না।

রাজা চিন্তা ক'রে বললেন—হ্যাঁ, এ-কথাটা অবশ্য তুমি ভালই বলেছ, পথ-ঘাট সম্বন্ধে আগে থেকে জেনে রাখা ভাল—কিন্তু তুমি তো তার কোন হদিস্ই জান না, এখন এমন কাউকে জান, যিনি এ বিষয়ে আমায় কিছু বাৎলে দিতে পারবেন?

মন্ত্রী বললেন—জানি বৈ কি, তাঁকে আপনিও ভাল রকম জানেন– আপনার কুল-পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ দেবের তো সবকিছু নখদর্পণে।

—ঠিকই বলেছ, রাজা তখুনি দূতের মারফৎ ওঁদের কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠ দেবকে ডেকে পাঠালেন।

মহর্ষি এসে পৌঁছলেন রাজসভায় সন্ধ্যে বেলায়। রাজা সিংহাসন থেকে নেমে, তাঁকে খুব খাতির যত্ন ক'রে একটা আসনে বসিয়ে বললেন—গুরুদেব, একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে আমি ডেকে পাঠিয়েছি। আমি সশরীরে স্বর্গে যেতে চাই, এটা কি হতে পারে না?

বশিষ্ঠদেব বললেন—হ্যাঁ, নিশ্চয় হতে পারে—যদি তুমি রাক্ষস-যজ্ঞ কর, তাহলে তার দ্বারা এটা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তার ফল খুব ভাল হয় না।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—কেন?

বশিষ্ঠ দেব বললেন—তার কারণ, অনেকটা বিনা নিমন্ত্রণে অনধিকার প্রবেশের মত। তোমার মনকে পূর্ণভাবে সেখানকার পরিবেশের মত গ'ড়ে নেবার পূর্বেই যদি যাও, তাহলে স্বর্গরাজ্যে তুমি পৌঁছবে ঠিকই কিন্তু তুমি সমাদর পাবে না।

ত্রিশঙ্কু বলে উঠলেন—সমাদর পাই কি না পাই সে পরে দেখা যাবে। আগে তো গিয়ে পৌঁছুই।

আপনি রাক্ষস-যজ্ঞের জন্য কি কি করতে হবে, আনতে হবে, তার ফর্দ দিন, আর নিজে এসে সেই যজ্ঞের পুরোহিত হয়ে যান, এই আমার অনুরোধ।

বশিষ্ঠ মাথা নেড়ে বললেন—বৎস ত্রিশঙ্কু, এ-সব যজ্ঞ আমি করি না। তুমি আমাকে দ্বিতীয়বার এ-রূপ যজ্ঞ করবার জন্য অনুরোধ জানিও না! এই কথা ব'লে ঋষিবর চলে গেলেন।

ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের ওপরও চ'টে গেলেন খুব। মনে মনে তাঁর ধারণা হ'ল যে, তিনি ইচ্ছে ক'রে আমায় সশরীরে যেতে দেবেন না ব'লেই আমার জন্যে যজ্ঞ করলেন না। কিন্তু সশরীরে স্বর্গে যেতেই হবে আমায়। বেশিদিন থাকতে পারি আর না পারি, অন্ততঃ এক পাক ঘুরেও দেখে আসব।

কিন্তু ঋষিদের সাহায্য না পেলে তো আর স্বর্গে যাবার উপায় নেই, অতএব একজন ঋষির সন্ধান করতেই হয়, কিন্তু তেমন ঋষি কে আছেন?

সেই কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে পড়ে গেল ঋষি বিশ্বামিত্রের কথা। অদ্ভুত শক্তিমান ঋষি; ক্ষত্রিয় থেকে তপস্যার জোরে ঋষি হয়ে গেছেন, তার ওপর বশিষ্ঠকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না—ওঁকেই আনা যাক্!

যেমনি ভাবা অমনি কাজ—বিশ্বামিত্রকে খাতির ক'রে নিয়ে এলেন তিনি। বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসা করলেন—কি জন্যে আমায় নিয়ে এসেছ বৎস?

ত্রিশঙ্কু ব'ললেন—ঋষিবর, আমি সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি—কিন্তু কিছুতেই যাবার সুবিধে হচ্ছে না। তন্ত্রমতে রাক্ষস-যজ্ঞ না করলে সেখানে তো যাওয়া যাবে না জানেন, কিন্তু আমার পুরোহিত বশিষ্ঠ দেবকে যজ্ঞ করতে বলায় তিনি বলে দিলেন, তুমি এখনও উপযুক্ত হও নি। অতএব, তোমার জন্যে আমি এ-যজ্ঞ করতে পারবো না!

বিশ্বামিত্র সব শুনে বললেন—বশিষ্ঠকে আমি চিনি না? বিটলে বজ্জাত, মুখ টিপে থাকে, পাছে তুমি সশরীরে স্বর্গে যাও সেটা ও সইতে পারলে না আর কি! ওকে আগে তাড়াও—তারপর আমি তোমার প্রধান ঋত্বিক হয়ে যজ্ঞ ক'রব।

সঙ্গে সঙ্গে বশিষ্ঠ কুল পুরোহিতের পদ থেকে সরে গেলেন আর সেই জায়গায় প্রজাদের সামনে বিশ্বামিত্রকে পৌরোহিত্য করার জন্যে রাজা তাঁকে বরণ করে নিলেন।

পনেরো দিন পরেই রাক্ষস-যজ্ঞ সুরু হয়ে গেল। তিনমাস ধ'রে যজ্ঞ চ'লল—হৈ-হৈ কাণ্ড! শেষ আহুতি দেবার পর দেখা গেল, রাজা ত্রিশঙ্কু সড় সড় ক'রে আকাশের দিকে উঠছেন। কপিকল নেই, দড়ি নেই চড় চড় ক'রে কে যেন তাঁকে টেনে ওপর দিকে তুলছে—আর বিশ্বামিত্র চিৎকার ক'রে মন্ত্র প'ড়ে চলেছেন।

সবাই তো হাঁ হয়ে গেল ব্যাপার-স্যাপার দেখে। সকলের মুখে মহারাজের জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল—তারপর তিনি শূন্যে মিলিয়ে গেলেন। হঠাৎ অদৃশ্য শূন্যলোক থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল, মহারাজ ত্রিশঙ্কু চেঁচাচ্ছেন—মুনিবর, মুনিবর, আমি গেছি, আমি গেছি!

— কি ব্যাপার ?

মহারাজ বলতে লাগলেন—আর ব্যাপার !—ওপর থেকে দেবরাজ ইন্দ্র আমায় ঠেলা দিয়ে নীচের দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।

বিশ্বামিত্র বললেন—আচ্ছা, আমি ইন্দ্রের কারদানি বার কচ্ছি! বলে আবার একটা জোরালো মন্ত্র আওড়াতে সুরু করলেন, ত্রিশঙ্কু আবার চড় চড় ক'রে ওপরে উঠতে লাগলেন। দেবরাজ তখন চন্দ্র, বরুণ, যম সবাইকে নিয়ে বোধহয় মারলেন এক রামধাক্কা! তখন ত্রিশঙ্কু মাটিতেই আছাড় খেয়ে পড়েন বুঝি বা!

কিন্তু বিশ্বামিত্রও সোজা লোক নন, হুং হাং ক'রে কি একটা মন্ত্র ব'লতেই সড়াৎ করে তিনি আবার স্বর্গের দরজায় পৌঁছে গেলেন কিন্তু দেবরাজ বাজ নিয়ে তাড়া করলেন তাঁকে। তখন হাত-পা ছেড়ে তিনি মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন আর কি!

ছ'দিন ধ'রে টাগ্-অফ্-ওয়ার চলল। তখন ত্রিশঙ্কু প্রাণের দায়ে বলে উঠলেন—আপনার কেরামতি আমি বুঝেছি প্রভু, আমায় আপনি এখন নিজের রাজ্যেই ফিরিয়ে আনুন।

বিশ্বামিত্র ক্ষেপে বলে উঠলেন—কভি নেহি, তিষ্ঠ! মানে, দাঁড়াও! যে শূন্যলোকে তুমি রয়েছ ঐখানেই আমি নতুন স্বর্গ, নতুন নক্ষত্র-লোক সৃষ্টি করছি, ব'লে সত্যি সত্যি স্বর্গ ও মর্তের মাঝামাঝি জায়গায় অনন্ত শূন্যলোকে একটি নকল স্বর্গ গড়ে দিলেন।

শোনা যায় সেখানেই নাকি মহারাজা ত্রিশঙ্কু আজও ঝুলে রয়েছেন। কেমন আছেন সে খবরটা কিন্তু কোথাও লেখা নেই!—
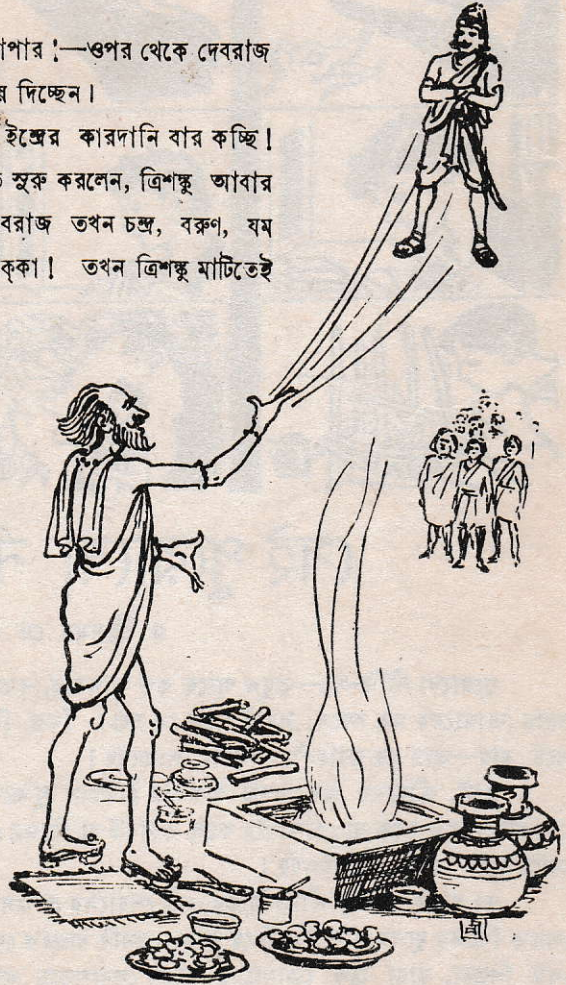
সেই পুরোনো নীতি-গল্প

* শ্রীসমর দে *

পুরোনো নীতি-গল্প—তবুও আছে কত জানবার, কত ভাববার ও কত শেখবার এখনও সে গল্পে। অথচ তোমাদের মত বয়সে, সবাই পড়ে সে গল্প। কিন্তু, কি করে যে আমাদের জীবনেও একে একে ঘটে যায়—তার বহু কাহিনী, সেইটাই আশ্চর্যের!

তাই, জীবনের এক একটি ব্যর্থতার ইতিহাস খুঁজলে একদিন বেশ সহজে বুঝতে পারা যায়—কোনটি লোভে পড়ে বা বোকামীর ফলে, কোনটি বা নিজের দোষে অথবা লোকের আজে বাজে কথার মোহে ভুলে ঘটেছে এই বিপর্যয়!

তা হলেই দেখো, নীতি-গল্পের সেই শেয়ালের প্রশংসায় ভুলে—কাক যেমন তার গান শোনাবার লোভে নিজের মুখের সন্দেশ হারিয়ে ঠকে, তেমনি মানুষও যে বহুবার ঠকে! তবে, সে মানুষ হচ্ছে সেই শিশুরা, যারা ঠিক তোমাদের বয়সে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে,—শুধু খেলা আর হট্টগোলে মেতে কপালে জোটায় বেশী দুর্ভোগ।

অথচ কে না জানে! যদি একটি চারাগাছকে, তোমরা যত্ন করে দেখে শুনে তাকে বড় হতে দাও—তারপর তার ডালই ভাঙ্গো আর ফলই উজাড় করো; আবার সে নতুন উৎসাহে সাজাবে তাকে, ডালে পাতায় ফুলে ফলে এক অপূর্ব শোভায়!

কিন্তু, সেই গাছটির শিশুকালে—তোমরা যদি সেটিকে অযত্নে বাড়তে দিতে, আর সুবিধা পেয়ে গরু-ছাগলে মুড়ে খেতো—তা হলে কি গাছটির যে এত ধৈর্য, এত উদ্যম ও উদার হয়ে মানুষকে খুশি করবার যে মন, কখনও দেখতে পেতে?

শ্রীতারাপদ রাহা

এরে, এই হতভাগা ছেলে,—এই দারুন ঠাণ্ডায় কাপড় না পরে, কিচ্ছু গায়ে না দিয়ে ছুটলি যে! নিউমনিয়া হয়ে মারা পড়বি। শীগ্‌গির ফিরে আয়, জামা-কাপড় পরে যা।—পাশের বাড়ি থেকে কানে আসছে কোন ছোট্ট ছেলের মা শীতের ঠাণ্ডা দিনে কাপড় না পরে বাইরে যাবার জন্য তার ছেলেকে ধমকাচ্ছেন।

আবার কখনও হয়ত অন্য বাড়ি থেকে কানে আসে—এই খোকন, তুই কাপড় না পরেই বাইরে বেরুচ্ছিস্ যে! ধাড়ি ছেলে লজ্জা করে না তোর?

এই দুই মায়ের ধমকানি শুনেই আমরা বুঝতে পারি কাপড় পরার উদ্দেশ্য কি। প্রথম মায়ের ভয় তাঁর ছেলের বুঝি ঠাণ্ডা লাগে, তাই কাপড় পরাতে চান তিনি তাকে ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করবার জন্য। সুতরাং কাপড় পরার এক উদ্দেশ্য হ'ল খারাপ আবহাওয়া থেকে দেহকে রক্ষা করা। দ্বিতীয় মায়ের বেলায় দেখছি—কাপড় পরার উদ্দেশ্য লজ্জা নিবারণ করা।

কাপড় পরার দুটো উদ্দেশ্য আমরা পেলাম, কিন্তু এই সব নয়, এ ছাড়াও আছে। বিয়ের সময় কনেকে যে সুন্দর শাড়িখানা পরিয়ে দেওয়া হয়—সে তাকে সুন্দর দেখাবে বলে। পূজার সময়, নিমন্ত্রণ-বাড়িতে বা উৎসব দিনে তোমরা যে রঙ-বেরঙের জামা-কাপড় পর সে-ও তোমাদের সুন্দর দেখাবে বলে, সুতরাং কাপড় পরার আর একটা উদ্দেশ্য হ'ল—সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা অপরের কাছে প্রশংসা পাওয়া।

আমার সুন্দর কাপড়-জামা দেখে অপরে তারিফ করে—এ কে না চায়? কিন্তু এ-ও সব নয়, এ ছাড়াও আছে: কাপড় পরে ভালই দেখাচ্ছে, কিন্তু আরাম হচ্ছে না, তা হলেও চলে না,—বিশেষ করে বড় লোকদের, রাজা বাদশাদের। টাকা যখন তাঁদের আছে, তখন সুন্দর মিহি মোলায়েম কাপড় তাঁদের চাই বই কি? তাই দেশ-বিদেশের ধনী লোকদের জন্য প্রাচীন কাল থেকেই মিহি মোলায়েম শৌখিন সব কাপড় তৈরী হয়েছে বিভিন্ন দেশে। আর আমাদের সবচেয়ে আনন্দ আর গর্বের কথা, এই ব্যাপারে আমাদের এই বাংলাদেশই ছিল সবার চেয়ে এগিয়ে। বাংলাদেশে নানা রকম সব শৌখিন কাপড় তৈরী হ'ত। এদের মাঝে একটির কথাই আজ তোমাদের বিশেষ করে বলব। এর নাম হচ্ছে মসলিন। এ কাপড় ঢাকায় তৈরী হ'ত বলে এর নাম ছিল ঢাকাই মসলিন।

এ কাপড় কতটা সূক্ষ্ম বা মিহি ছিল দু-একটা ঘটনার কথা বললেই তা তোমরা বুঝতে পারবে। পারস্যের রাজদূত মহম্মদ আলিবেগ পারস্যের সম্রাটের জন্য ষাট হাত একখানা কাপড় ছোট্ট একটা নারকেল-মালায় পুরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ঢাকার বস্ত্র-শিল্পের ইতিহাস যিনি লিখেছেন তিনি তাঁর বইয়ের এক জায়গায় বলেছেন, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মসলিন তৈরীর আধসের সুতো তাঁর সামনে খোলা হলে তিনি দেখলেন ঐ সুতো ২৫০ মাইলের মত লম্বা। অন্য বিবরণীতে পাওয়া যায়, বিশ হাত লম্বা দুই হাত চওড়া একখানা মসলিন একটা আংটির ভিতর দিয়ে অনায়াসে টেনে বের করা যেত। আর এদের ওজনের কথা শুনলেও তোমরা চমকে যাবে। ১৪০ থেকে ১৬০ হাত লম্বা একখানা মসলিনের ওজন হ'ত মাত্র ৪ তোলা। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ১৭৫ হাত লম্বা একখানা মসলিনের ওজন হয়েছিল চার তোলা।

বাদশা ঔরঙ্গজেবের মেয়ে বেগম জেবউন্নিসা বাপের সঙ্গে দেখা করতে এসে একদিন ভীষণ গালাগালি খেলেন,—বাপ ভেবেছিলেন মেয়ে কাপড় পরেই আসে নি। জেবউন্নিসা বললেন, সে কি, বাবা, বিশ হাত কাপড় আমি সাত ফের করে পরে এসেছি। বুঝতেই পারছ মেয়ে পরে এসেছিলেন এই ঢাকাই মসলিন। নবাব জাফর আলি খাঁ সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে প্রতি বৎসর ৫০০ খানা করে মলমল খাস মসলিন পাঠাতেন।

আর এই সব মসলিনের রকমও ছিল বা কত! দু'-চারটির নাম শোনাচ্ছি তোমাদের।

প্রথমেই ধরো—ঝুনা মসলিন। এর সুতো ছিল মাকড়সার জালের মত মিহি। পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা বলতেন, এ কাপড় বিদ্যাধরী বা পরীদের তৈরী, মানুষের পক্ষে এ কখনও করা সম্ভব নয়।

দুই—রং। তিন—সরকার আলি। নবাব বাদশারা এই সব মসলিন ব্যবহার করতেন। চার—খাস। পাঁচ—সবনম বা সান্ধ্য-শিশির। সবনম মসলিন ঘাসের উপর মেলে দিলে দেখা যেত না। নবাব আলিবর্দি খাঁ পরীক্ষার জন্য এই মসলিন একবার ঘাসের উপর মেলে দিয়েছিলেন। একটা গরু এসে সেখানকার ঘাস খেতে গিয়ে টের না পেয়ে কাপড় শুদ্ধই সেখানকার ঘাস খেয়ে ফেলেছিল। ইউরোপীয় কবিরা এর নাম দিয়েছিলেন বায়ুর জাল।

আর এক রকমের মসলিন ছিল, তার নাম হচ্ছে আবরোয়ান। এ জলের মধ্যে ফেললে দেখাই যেত না। ঔরঙ্গজেবের মেয়ে এই মসলিন পরে বাপের কাছে এসে বকুনি খেয়েছিলেন।

এ ছাড়া আরও ছিল, তাদের নাম হচ্ছে আল্লাবাল্লে, তঞ্জেব, তরন্দাস, নয়নসুখ, বদনখাস, সরবন্দ, সরবতি ইত্যাদি। সরবন্দ আর সরবতি দিয়ে পাগড়ি করা হ'ত। কুমীস বলে এক রকম মসলিন ছিল, এ দিয়ে নবাব-বাদশারা তাঁদের কুর্তা বা জামা তৈরী করতেন।

সাদা প্লেন মসলিন ছাড়া ডুরে মসলিনও তৈরী হ'ত। এ-ও অনেক রকম ছিল, এদের নাম ছিল ডোরাকাটা, রাজকোট, ডাকান, পাদশাহীদার, কাগজাই, কলাপাত ইত্যাদি।

ডুরের মত আর এক রকম মসলিন ছিল, তার নাম চারখানা। চারখানাও নানা রকমের ছিল, যেমন নন্দনসাহী, আনারদানা, কবুতর-খোপা, সাকুতা, বাছাদার, কুত্তিদার।

ফুলকাটা বুটিদার মসলিনের নাম ছিল জামদানী। জামদানীও শুধু এক রকম নয়, তোড়াদার, কাবেলা, বুটিদার, তোছা, জলবার, পাল্লাহাজার, মেল, তুবলিজাল, ছাওয়াল, ডুরিয়া, গেদা, সাবুরগা ইত্যাদি নানা রকমের ও বিবিধ নামের বুটিদার মসলিন পাওয়া যেত।

জামদানী মসলিন শুধু নবাব-বাদশাদের জন্যই তৈরী করা হ'ত। তিন গিনির বেশি

দামের মসলিন তাঁতীদের অপরের কাছে বিক্রী করার অধিকার ছিল না, সুতরাং বিদেশী বণিকেরা এ নিয়ে ব্যবসা করতে তেমন সুযোগ পেতেন না।

এ ছাড়া আর এক রকম মসলিন ছিল, তার নাম মলমল খাস।

যেসব তাঁতী-জোলারা এই সব মসলিন তৈরী করত নবাব-বাদশারা তাদের নিষ্কর ভূমি দান করতেন, তা ছাড়া নগদ টাকাও পুরস্কার দিতেন। ভাল মসলিনের দাম সেকালেই দুই শত থেকে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত ছিল। এই ধরনের এক একখানা মসলিন তৈরী করতে ছ' মাস থেকে এক বৎসর পর্যন্ত সময় লাগত।

পলাসীর যুদ্ধের আগ পর্যন্ত ঢাকায় প্রতি বৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মসলিন বিক্রী হ'ত। দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত ঢাকা জেলার বাবুর হাটে প্রতি হাটবারে মসলিন বিক্রী হ'ত। এ থেকে আয়ও একলক্ষ দেড়লক্ষ টাকার কম ছিল না।

তোমরা হয়ত জানতে চাইবে কতদিন আগে আমাদের দেশে এ শিল্পটা শুরু হয়। তা হাজার তিনেক বৎসরেরও আগে বলা যেতে পারে। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে মসলিনের উল্লেখ আছে। তোমরা বলবে, ওরা জানলে কি করে? তার উত্তর হচ্ছে বহু প্রাচীনকাল থেকেই স্থলপথে আলেকজেন্দ্রিয়া হয়ে মসলিন রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশে চালান যেত। তুর্কী সুলতানেরা এখান থেকে মসলিন নিয়ে ব্যবহার করতেন। এটা ছিল তাঁদের বিলাস। আর তুরস্কের রাজধানী ছিল মোসল নগর। এই মোসল নগর থেকেই কাপড়ের নামটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাই অনেক পণ্ডিতের অনুমান এই মোসল কথাটা থেকেই কাপড়ের নাম হয়েছে মসলিন।

যা'ক, এখন তোমরা হয়ত জানতে চাইবে এই এত মিহি মসলিন কি দিয়ে তৈরী হ'ত,—মানে তুলো, রেশম, না অন্য কিছু? জেনে রাখ—মসলিন কাপাস তুলোর সুতো দিয়েই তৈরী হ'ত, যা দিয়ে আমাদের সাধারণ সুতী কাপড় তৈরী হয়। কিন্তু তুলো হলেও এ এক বিশেষ ধরনের তুলো, নাম এর কোটি বা শিরজ তুলো। ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ থেকে উত্তর দিকে মাত্র ৬৪।৬৫ মাইল জায়গা জুড়ে এই তুলোর চাষ হ'ত। তাঁত চলত ঐ জেলারই সোনারগাঁও, নোয়াগাঁ, মুড়াপাড়া, কাপাসিয়া, এই সব জায়গায়। এ ছাড়া ময়মনসিংহের বাজিতপুর, জঙ্গলবাড়ি প্রভৃতি জায়গায়ও মসলিন তৈরী হ'ত। ঢাকাই মসলিনের অর্ধেক আসত কিশোরগঞ্জ থেকে। সেখানকার তাঁতীরা এই মসলিনের টাকায় একুশ-রতন মঠ তৈরী করেছিল।

এখন মসলিনের সুতোকাটা সম্বন্ধেও দু'-চার কথা জেনে রাখা দরকার তোমাদের। কাপাস গাছে ফেটে গেলে তা দিয়ে মসলিনের সুতো কাটা চলত না। বীচির গায়ে তুলো লেগে থাকতে থাকতেই গাছ থেকে সেগুলি তুলে নেওয়া হ'ত। এই তুলো ধুনা, পাট করা এবং তা থেকে সুতো কাটতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হ'ত।

পনের থেকে বিশ বৎসর বয়সের স্থির, শান্ত, ধৈর্যবতী মেয়েরা টাকুতে সুতো কাটত। আবহাওয়া ভাল থাকলে বৃদ্ধারা পাড়ার কাটুনীদের ডাকতেন। কাটুনীরা সকালে স্নান করে ঠাণ্ডা মাথায় সুতোকাটা শুরু করত। আবহাওয়া খারাপ বুঝলেই সুতো কাটা বন্ধ করে দেওয়া হ'ত।

মসলিন তৈরীর সময় ছিল সাধারণতঃ আষাঢ়, শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাস, কারণ এই সময়কার বাতাসে জলোভাব থাকায় সুতো কেটে যাবার সম্ভাবনা কম থাকত।

এ ছাড়া কাপড় বুনবার সময় তাঁতের নিচে জল ভরা সব পাত্র রেখে দেওয়া হ'ত।

এখনও অবশ্য ঢাকাই মসলিন আছে, কিন্তু মসলিনের সে দিন আর নেই। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে নটিংহাম শহরে সুতোর কল প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই বাংলার মসলিন-শিল্পের অবনতি শুরু হয়ে যায়।

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

এক সন্ন্যাসী চলেছিলেন পথ দিয়ে। চলেছিলেন হিমালয়ে তপস্যা করতে। একদিন পথে যেতে যেতে এক গাঁয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো। সন্ন্যাসী দেখলেন সামনেই এক মস্ত বড়লোকের বাড়ী। দ্বারে বসে বাড়ীর কর্তা তামাক খাচ্ছে, সন্ন্যাসী বললেন—আজ রাতে থাকার মত একটু জায়গা দেবেন ?

কর্তা বললো—অজানা অচেনা লোককে আমি বাড়ী ঢুকতে দিই না। রাতে যদি তুমি সবকিছু চুরি করে পালাও, তখন কি করবো ?

—আজ্ঞে, আমি চোর নই।

—মানলাম তুমি চোর নও, কিন্তু তোমাকে আমি রাতে থাকতে দেবো খেতে দেবো কেন ? আমার বাড়ী কি অতিথশালা ? আমার কাছে সুবিধা হবে না বাপু, তুমি অন্য জায়গায় চেষ্টা কর।

সন্ন্যাসী আরেকটু এগিয়ে দেখলেন একখানি কুঁড়ে ঘর, বাড়ীর কর্তা বাইরে বসে কাঠ কাটছে। সন্ন্যাসী বললেন—আজ রাতে থাকার মত একটু জায়গা দেবেন ?

কর্তা বললো—বেশ তো থাকুন না, এক রাত্তির থাকবেন তো কি হয়েছে ?

সন্ন্যাসীকে কর্তা ভিতরে নিয়ে গেল, হাতমুখ ধোবার জল দিলে। বললে—আপনি এসেছেন এ আমার সৌভাগ্য ! সাধু-সন্ন্যাসীর পায়ের ধুলো সহজে তো মেলে না।

মাদুর পেতে সন্ন্যাসীকে বসিয়ে কর্তা মুড়ি-বাতাসা এনে খেতে দিয়ে বললে—গরীবের ঘরে, এর বেশি আর কিছু নেই।

তাদের অতিথিসেবায় সন্ন্যাসী বড় খুশি হলেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তিনি যখন আবার বেরুবার উদ্যোগ করছেন তখন কর্তা বললো—ফেরার পথে আবার আসবেন, পায়ের ধুলো যেন পড়ে।

সন্ন্যাসী খুশি হলেন, বললেন—তুমি অতি সজ্জন। তোমাকে আমি তিনটি বর দেবো, কি চাই বল।

কর্তা বললো—তিনটি বর দেবেন? বেশ, আশীর্বাদ করুন ারাজীবন যেন শান্তিতে থাকি।

—একটা হলো, আর?

—আর? আশীর্বাদ করুন যেন শরীর সুস্থ থাকে, গায়ে শক্তি থাকে, রোজগার করে খেতে পারি।

—দুটো হলো, আর?

—আর? আর কি চাইবো?

—এই কুঁড়ে ঘরখানাকে একটা ভাল বাড়ী করে দিই না?

—ভাল বাড়ী করে দেবেন? দিন্।

সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে তখনই সেখানে একটি ভাল বাড়ী হয়ে গেল। সন্ন্যাসী চলে গেলেন।

বড়লোক একটু দেরীতে ঘুম থেকে ওঠে। ঘুম থেকে উঠেই বড় বাড়ীর কর্তা দেখলো পাশের কুঁড়ে ঘরের জায়গায় মস্ত বাড়ী হয়ে গেছে। এ কী! গিন্নীকে ডেকে বললো—দেখ দেখ, রাতারাতি এ কি ব্যাপার!

গিন্নী তখনই ছুটলো পাশের বাড়ী। গরীব গিন্নীকে ডেকে বললো—ব্যাপার কি গো?

গরীব-গিন্নী মিছে কথা বলে না। সন্ন্যাসীর আশীর্বাদের কথা সব বললো।

বড়লোক-গিন্নী বাড়ী এসে বললো—এখনি যাও, দেখ সেই সন্ন্যাসী কোথায় আছে।

বড়বাড়ীর কর্তা তখনই ঘোড়ায় চড়ে ছুটলো সন্ন্যাসীর খোঁজে।

কিছুদূর গিয়েই সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা। বললো—এ কি প্রভু, আপনি চলে যাচ্ছেন? আমার বাড়ীতে একবার পায়ের ধুলো পড়বে না?

সন্ন্যাসী বললেন—কাল তো গিয়েছিলেম বাবা, তোমার বাড়ীতে, তুমি বললে জায়গা হবে না।

—তখন আমার মনটা ভাল ছিল না, শরীরটাও খারাপ ছিল। আজ চলুন। আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে অবধি আমি মনে স্বস্তি পাচ্ছি না।

—কিন্তু আর তো ফেরার উপায় নেই বাবা, আমাকে এখন সামনের দিকেই এগিয়ে যেতে হবে।

তারপর তার মুখের পানে তাকিয়েই সন্ন্যাসী তার মনের কথাটা বুঝতে পারলেন, বললেন—তিনটে বর চাইতে এসেছ, না?

—হেঁ হেঁ হেঁ, যদি আপনি দয়া করেন!

—বেশ, তোমায় আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার তিনটি ইচ্ছা পূরণ হবে।

বড়লোক কর্তা তো ভারী খুশি। সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বাড়ী ফিরলো।

পথে সে শুধুই ভাবছে কি কি সে ইচ্ছা করবে। টাকাপয়সা? হাতীঘোড়া, পাইকপেয়াদা রাজত্ব? কি কি চাইবে? কর্তা ভাবছে আর বুড়ো ঘোড়া ঠুকঠুক করে চলছে বাড়ীর পথে। কর্তা বিরক্ত হলো। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গিন্নীর সঙ্গে যে একটা পরামর্শ করবে তারও উপায় নেই, ঘোড়াটা যেন আর চলতে চায় না। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে, তবু ঘোড়া জোরে চলতে চায় না। এবার কর্তার রাগ হয়, বললো—এমন ক্ষীণজীবী ঘোড়ার মরাই ভাল।

যেই এই কথা বলা, তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি পড়ে মরে গেল। কর্তার প্রথম ইচ্ছা পূর্ণ হলো।

যাক্ এখনও তা হলে দুটো বর বাকি আছে। মরা ঘোড়া ফেলে কর্তা ছুটলো বাড়ীর দিকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে কর্তা বাড়ী ফিরলো। বাড়ী ঢুকে দেখে গিন্নী বারান্দায় বসে পান চিবুচ্ছে আর বিড়ালকে দুধ খাওয়াচ্ছে। রাগে কর্তা রি-রি করে উঠলো, বললো—আমি ছুটোছুটি করে মরছি আর উনি পান চিবুচ্ছেন! অমনিভাবে সারাজীবন শুধু বসে পান চিবোও, আর যেন উঠতে না হয়।

গিন্নী তাড়াতাড়ি উঠতে গেল, কিন্তু আর উঠতে পারে না। কর্তার দ্বিতীয় ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। গিন্নী মেঝের সঙ্গে আটকে গেছে!

আর একটি মাত্র ইচ্ছা বাকি। টাকাপয়সা চাইবে, না গিন্নীকে রেহাই দেবে? কর্তা মাথায় হাত দিয়ে বসলো।

এদিকে গিন্নী তো চেঁচামেচি কাঁদাকাটি সুরু করলো। বললো—আমি যদি এভাবে মেঝেতে বসে বসেই মরে যাই, কি হবে তোমার টাকাপয়সা? মানুষ আগে না পয়সা আগে?

শেষে কর্তা হতাশ হয়ে বললো—বেশ, তবে তাই হোক। তুমি মেঝে থেকে ওঠো, আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হোক্!

গিন্নী রেহাই পেল।

বড়লোক অসৎ ও অহংকারী। তিনটি বর পেয়েও ভাল কাজে লাগাতে পারলো না, তার ভাল কিছু হলো না।

কিন্তু গরীব লোক সৎ ও বিনয়ী, তিনটি বরে তার জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কেটে গেল।

১৩৬৭

আমাদের নস্তেদা নতুন গাড়ি কিনেছে জানতাম না।

মানে, গাড়িটা নতুন নয়, সেকেণ্ডহ্যাণ্ড অ্যাম্বেসেডার কার, বছর দশেকের পুরণো মডেলের, তবে নস্তেদা এতদিন পরে এই প্রথম মোটর কিনলো বুঝি।

আগে এতদিন নস্তেদা আমাদেরই মত বাসে-ট্রামে বাদুড় ঝোলা হয়ে যেতো! কোন এক বড় অফিসে ভাল চাকরি করতো। তবে সে চাকরি করে গাড়ি কেনা যায় কিনা জানিনে।

অবশ্য পরে কানে এসেছিলো, ঐ গাড়ি নাকি নস্তেদা-র নিজের নয়, অফিসের গাড়ি, নস্তেদা চালায়!

নস্তেদা নাকি ড্রাইভার?

বিশেটা বড্ড ফাজিল। একদিন নস্তেদা-কে প্রায় বলেই ফেলেছিলো, হ্যাঁ নস্তেদা, গাড়ি বুঝি আপনার?

নস্তেদা হেসে বললো, যখন চালাচ্চি, তখন আমারই।

—সে তো ড্রাইভাররাও চালায়।

—তবে ধর আমি ড্রাইভার।

অর্থাৎ নস্তেদা ভাঙলো তবু মচকালো না!

যাক, আমি বলি, আমাদের অত জানবার কী দরকার বাপু! মোটর বাস নস্তেদা-র নিজেরই হোক বা সে তার ড্রাইভারই হোক, সেটা খুব বড় কথা নয়। নস্তেদা মোটরগাড়ি চড়ে এ'খানে ওখানে যেতে পারছে সেইটাই বড় কথা। আমাদের মত আর তাকে ট্রামে বাসে বাদুড় ঝোলা হয়ে ঘুরতে হচ্চে না?

সেদিন বাসের জন্তে দাঁড়িয়ে ছিলাম বাস ষ্ট্যাণ্ডে। হঠাৎ কানে এলো, আমার নাম ধরে কে যেন ডাকচে! আমি এদিক-ওদিক দেখতে লাগলাম—

—এই যে রে আমি !

দেখি, আমার সামনেই গাড়িতে বসে নন্তেদা আমাকে ডাকচে, আয়, উঠে আয় গাড়িতে !

—আরে, নন্তেদা !

নন্তেদা ড্রাইভারের সীটের বাঁ দিকের দরজাটা খুলে দিতেই আমি ঢুকে পড়লাম মোটরে। একবার দেখে নিলাম বাস-ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়ানো ভদ্রলোকের আর মেয়েদের। তাঁরা নিশ্চয়ই ভাবছেন, লোকটা কী ভাগ্যবান !

ভাগ্যবানই তো বটে ! বাসে ঠেলাঠেলি করে না গিয়ে মোটরে সারা শরীর এলিয়ে মেলিয়ে হেলিয়ে বসে যাওয়া—কম কথা !

হেসে বললাম, যাক নন্তেদা, তুমি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় এসে ধরেচো আমাকে। একেই বলে ঈশ্বর প্রেরিত ব্যাপার।……তারপর. গাড়িখানা কিনলে বুঝি ?

হুঁ। নন্তেদা-র নজর রাস্তার দিকে। হাতে ষ্টীয়ারিং ধরা। এ অবস্থায় বেশী কথা বলতে নেই। এ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

—বেশ গাড়িটা। আবার বললাম।

—হ্যাঁ, ভালই। আবার ছোট্ট জবাব।

আমি যে এই গাড়ির ব্যাপারে অন্য কথা শুনেছি। সে কথা আর বললাম না। কী দরকার ! বিশেষ করে তার গাড়িতেই বসে চলেছি যখন।

—তা তুমি কোন দিকে চললে ? জিগ্যেস করলাম।

—চৌরঙ্গীর দিকে। তুই ?

—আমিও তো ঐদিকেই যাবো। যাক, ভালই হলো।

মনে মনে খুশিই হলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে গাড়ির ভেতরটা ভাল করে দেখতে গিয়ে দেখি পেছনের গদির উপরে বেশ বড় একটা প্যাকেট, ফুল লতা পাতা ছাপা রঙীন কাগজে চমৎকার করে প্যাক করা। তাতে লাল রিবন বাঁধা !

—কোথাও নেমন্তন্নে যাচ্ছো নাকি নন্তেদা !

—না।

—তবে পেছনের গদিতে বেশ বড় একটা প্যাকেট দেখছি। কাউকে প্রেজেণ্ট করবার জন্যে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, প্রেজেণ্ট করবার জন্যেই।

নন্তেদা খুব ছোট ছোট জবাবই দিচ্ছে। উপায় কি ? গাড়ি চালাতে চালাতে বেশি কথা বলা উচিত না। রাস্তায় লোকজন গরু ষাঁড়, কুকুর বেড়াল আর গর্ত। তাছাড়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে জঞ্জালের পাহাড়। ওঠাবার নাম নেই। সব বাঁচিয়ে তো চালাতে হবে গাড়ি।

নস্তেদা চৌরঙ্গী পার হয়ে ময়দানের কাছে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে গাড়িটা থামালো! তারপর নেমে বললো, নাম্, ঐ ষ্টলটার থেকে দু' কাপ চা খেয়ে আসি।

নস্তেদা-কে পা চালাতে দেখে জিগ্যেস করলাম, গাড়ির দরজাগুলো লক্ করে যাবে না? কাঁচ গুলোও খোলা রইলো।

—থাক, কোন ভয় নেই। নস্তেদা বললো, ঐ তো চায়ের ষ্টল। যাবো আর আসবো।

—তবু···আমার পছন্দ হলো না নস্তেদা-র কথাটা।

নস্তেদা আমার জামা ধরে বললো, নে চল্ আর দেরি করিসনে।

অগত্যা যেতে হলো নস্তেদা-র সঙ্গে।

আশ্চর্য নস্তেদা। আজকের দিনে অতটা কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নাকি? কে হয়তো হাত-সাফাই করে দেবে তার ঠিক নেই।

ঠিক যা ভেবেছিলাম, তাই।

চা খেয়ে গাড়ির কাছে এসে দেখি, পেছনের সীটে সেই সুন্দর কাগজে মোড়া প্যাকেটটা আর নেই। কে যেন চক্ষুদান করেছে।

—দেখলে তো। জিনিষটা গেল তো! প্রায় আঁতকে উঠলাম।

দেখি নস্তেদা হাসছে।

—তুমি হাসছো? অবাক হলাম! অমন দামী প্রেজেন্টেসনটা চলে গেল, আর তুমি হাসছো!

নস্তেদা বললো, শোন্ তবে, ওটা বেহাত করবার জন্যেই তো এদিকে আজ আসা আর নেমে চা খেতে যাওয়া। হাত সাফাই করবার সুযোগ দেবার জন্যে একটু সরে গেলাম আমরা।

শুনে আরো অবাক হলাম আমি! তার মানে? ওতে কী ছিল তবে?

—জঞ্জাল। বাড়ির সাত—আট দিনের জঞ্জাল।

—জঞ্জাল!

—হ্যাঁ। দেখছিসনে সহরময় জঞ্জাল। জঞ্জাল পরিষ্কার হচ্ছে না। কাজেই এই মতলব করেছি। বাড়িতে টবে জঞ্জাল জড়ো করা থাকে। আর যখন যেখানে যাই। ঐগুলোকে ভাল করে প্যাকেট করে নিয়ে গিয়ে গাড়ি আর বাড়ি হাল্কা করে দিই।

শুনে হো-হো করে হেসে উঠি আমি: আচ্ছা মজার লোক তো তুমি নস্তেদা! কিন্তু বেচারা! তার মজুরি পোষাবে না! তার কত আশায় ছাই পড়বে।

১৩৮০,

* শ্রীকরুণাময় বসু *

চিকন সোনা ময়ূরকণ্ঠী মেঘে
হালকা রোদের একটু ছোঁয়ায় স্বপ্ন আছে লেগে ;
ঘুম ভরা এই দুপুর বেলার মিষ্টি রোদের আলো
ছোট্ট ছেলে পুপুর চোখে লাগছে বড়ো ভালো।
ফুল বাগানের একটি কোণে বসে
অলখ সূতোর মায়ায় বোনা স্বপ্নখানি উড়িয়ে দিয়ে
ভাবছে একা ও-সে।

এমন যদি হয়—
প্রজাপতির পাখার নাচন নীল আকাশে নয়,
দোতলার ওই শোবার ঘরে একটা আছে কাঁচের রঙীন শিশি,
আমের আচার পাঠিয়েছিল কতো দূরের ফয়জাবাদের পিসি,
রাখবে ধরে ফুলবাগানের একটি দু'টি প্রজাপতি
ওই শিশিতে পুরে,
ঝিলমিলিয়ে রঙীন ডানা নাচবে ঘুরে ঘুরে।

এমন যদি হয়—
পাখির গানে গাছের পাতা, বনের ছায়া ভরবে সে তো নয়,
আনবে ডেকে সবুজ টিয়ে, হলুদ পাখি, বুলবুলিদের
মাঠের ধারে গিয়ে,
আদর করে রাখবে তাদের খাঁচার ভিতর নিয়ে,

খাঁচার ভিতর গাইবে তারা আপন মনে গান,
সেই সুরেতে রোদের খুসি ছড়িয়ে যাবে, বাতাস হয়ে দুলিয়ে দেবে
ছলছলিয়ে মাঠের কচি ধান।
জ্যোৎস্না রাতের স্বপ্ন হয়ে মিষ্টি গানের সুরে
ঘুমের ভিতর পুপুর কানে চম্পাবতী রূপকথাটি
আসবে ঘুরে ঘুরে।

শীতের দিনে শম্ভু কাকা সুদূর বনে গেলে,
বলবে তারে আনতে হবে একটা ছোট হরিণ ছানা পেলে।
রাখবে তারে ঝিলের ধারে, সাঁকোর কাছে কচি ঘাসের পাশে,
ভালোবাসায় ভুলিয়ে দেবে মনের ব্যথা : মায়ের কথা, বনের কথা
মনেই নাহি আসে।
রাতের বেলা বাবার কাছে এ-সব কথা বললে পুপু হেসে,
বললে বাবা, একটু ভেবে অল্প একটু কেশে,
এমন যদি হয়—
সোনার খাঁচা গড়িয়ে দিলাম তার ভিতরে ছোট্ট পুপু রয়,
হেসে, নেচে কাটিয়ে দেবে বেলা,
খাঁচার ভিতর আপন মনে সঙ্গী-বিহীন খেলা,
বাবা, মা কেউ থাকবে না তার কাছে,
সন্ধ্যেবেলার অন্ধকারে শাঁকচুন্নীর নাতনীরা সব
দুলবে গাছে গাছে।
ওরে ব্বাবা! আৎকে উঠে ছোট্ট পুপু বললে কেঁদে,
কক্ষণো তা নয়।
একটু হেসে বললে বাবা, তবে?
উড়িয়ে দেব প্রজাপতি নীল আকাশে, বনের পাখি, বনের হরিণ
বনেই ছাড়া রবে।

১৩৭৬

★

কেষ্টর কাণ্ড

শ্রীলীনা দত্তগুপ্তা

কেষ্টকে তো চেন? চেন না? আরে ঐ যে পাকড়াশীদের ভোম্বলের সঙ্গে দিনরাত খেলে বেড়ায়,—ঐ সীতাবলদীর মোড়ে গো—

হ্যাঁ—সেদিন কেষ্ট কি করেছে জান? ওর মা বিষ্টুকে (কেষ্টর দাদা) ডেকে বললেন,—"ওরে বিষ্টু, যা তো বাবা একপো দই কিনে নিয়ে আয়।" বিষ্টু এখন কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্র, মেজাজটা একটু উঁচু সুরে বাঁধা। কথায় কথায় দোকান বাজার যেতে তার মহা আপত্তি। নাক সিটকে বললে,—"আঃ—একটু দইএর জন্ম আবার আমাকে দোকানে যেতে হবে? সকালে গেলাম, তখন কেন বলনি?—কেষ্টকে পাঠাও।"

মা বললেন,—"ও ছেলে মানুষ, পারবে?"

"ঐ তো রাস্তার মোড়ে দোকান।" বলে বিষ্টু—তার বন্ধুর বাড়ী চলে গেল।

কেষ্টর মা আর কি করেন—কেষ্টকেই বলে কয়ে হাতে পয়সা দিয়ে দই কিনতে পাঠালেন। বললেন,—"দেখিস রে কেষ্ট, দোকানদারকে টাট্‌কা ভাল দই দিতে বলিস।"

কেষ্ট দই কিনে ফেরবার পথে ভোম্বলের সঙ্গে দেখা। আগের দিনের অসমাপ্ত খেলা শেষ করবার জন্য ভোম্বল ওকে ধরে পড়ল।

কেষ্টর কি? সে তো এ-ই চায়। কাগজ-কলমের সঙ্গে সম্পর্ক তার খুবই কম। পড়াশোনার কথা উঠলেই মুখ শুকিয়ে আমসি। কিন্তু খেলার কথা বলে দেখ—মুখে তখন কথার যেন খই ফোটে। সারাদিন টই টই করে ঝোপে ঝাড়ে ঘুরে বেড়াবে। কোথায় কার বাগানে জামরুল আর জলপাই, আমড়া আর আম পাকল, সব কেষ্টর নখদর্পণে। সে সব ফলের অধিকাংশই কেষ্ট আর ভোম্বলের হাত এড়াতে পারে না। যথাসময় ঠিক সেগুলো তাদের হস্তগত হয়ে পকেটস্থ হয়, পরে উদরস্থ।

যা হউক ভোম্বল হ'ল নেহাৎ অন্তরঙ্গ বন্ধু, তার কথা কি কেষ্ট ফেলতে পারে? সে দইএর ভাঁড়টা ভোম্বলদের রোয়াকে রেখে দিব্যি খেলায় মেতে গেল।

ঘণ্টা দুই পরে কেষ্টর খেয়াল হ'ল—নজর গেল দইএর দিকে। তাও লাট্টু লেগে দইটা কাত হয়ে পড়ে গিয়েছি[illegible] বলে। তাড়াতাড়ি দইএর ভাঁড়টা তুলে—কেষ্টর তো চক্ষুস্থির। অর্দ্ধেক দই-ই পড়ে গেছে!—"কি হবে ভাই? এখন মা যে বকবে!" বলে কেষ্ট দইএর ভাঁড়টা হাতে নিয়ে করুণচোখে তাকাল ভোম্বলের দিকে। যত দুষ্টুই হোক ভোম্বলও একটু হকচকিয়ে গেল,—কারণ সেই তো কেষ্টকে আটকে রেখেছিল খেলবার জন্য। ভোম্বল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে

চেয়ে রইল কেষ্টর মুখের দিকে। কিন্তু দুষ্টুমীতে দলের সেরা কেষ্টই। ভণ্টে, ভোম্বল, টুট্টা, ফুট্টা, ক্যাবলা—সবার আগে তার মাথায়ই যত দুষ্টু বুদ্ধি খেলে, বললে,—"ঠিক হয়েছে রে ভোম্বল,—যা

তো—তোদের বাড়ীর ভেতর থেকে যদি একটু গরম জল এনে দিতে পারিস।"

ভোম্বল বললে,—"গরম জল দিয়ে কি করবি ?"

—"তুই আন তো।"

ভোম্বল ভেতরে গিয়ে দেখল, মা রান্নাঘরের উনুনে চাএর জল চাপিয়ে রেখে পাশের ঘরে ছোট বোনটিকে হরলিকস্ খাওয়াচ্ছেন। ভোম্বল চুপচাপ প্রায় ফুটন্ত গরম জল এক কাপ কেষ্টকে এনে দিল। কেষ্ট গরম জলটা দইএ ঢেলে বেশ করে মিশিয়ে নিয়ে চলল বাড়ীর দিকে। বাড়ী পৌঁছতেই কেষ্টর মা এগিয়ে এলেন। এত দেরী দেখে তিনি ব্যস্ত হয়ে ঘর বার করছিলেন; বললেন—"এত দেরী হ'ল যে ?"

কেষ্ট মুখখানা শুকনো করে বললে—"কি করব ? টাট্কা দই তৈরী ছিল না যে! দই রান্না করতেই তো এত দেরী হ'ল,—এই দেখনা হাতে নিয়ে, এখনও কেমন গরম গরম আছে।"

ছেলের কথা শুনে কেষ্টর মা হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পেলেন না। দইটা হাতে নিয়ে তিনি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কেষ্টর পিট্‌পিটে চোখ দুটোর দিকে চেয়ে।

প্রায়শ্চিত্ত

ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী

(আমার বন্ধু শান্তিবাদী বিজ্ঞানী ডাঃ এডল্‌ফ গন্‌সের নাম শিশুসাথীর পাঠক-পাঠিকার পরিচিত। তাঁর একখানা চিঠি সম্প্রতি এসেছে। সেই চিঠিটার অনুবাদ তোমাদের উপহার দিচ্ছি।)

হাইডেলবুর্গ, ১৭ই জুলাই '৬৯

প্রিয় ডাঃ বাগচী,

তোমার বোধ হয় মনে আছে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ জন ফ্লেমিং ১৯৬৫ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বৈজ্ঞানিক গবেষণার সময় প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ থেকে পড়ে তাঁর গবেষণার যন্ত্রপাতি সমেত জলে ডুবে যান। তাঁকে উদ্ধারের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

খবরের কাগজগুলোতে এ সংবাদ প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'সায়েন্স ক্রনিকল' পত্রিকায় এর বিশেষ বিবরণ বের হয়েছিল। অতবড় একটা বৈজ্ঞানিক প্রতিভার এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়াতে সব দেশের বিজ্ঞানী মহল খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন। কিন্তু আজ বুঝেছি তাঁর মৃত্যুর পিছনে অন্য কারণ ছিল। সেই কারণটা জেনেছি এই ত সেদিন অর্থাৎ এই বছরের ১০ই জুন তারিখে।

ডাঃ জন আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কত সন্ধ্যা আমরা দু'জনে আমার হাইডেলবুর্গের নিরালা বাড়ীতে বসে বিজ্ঞানের আলোচনায় মশগুল হয়ে গিয়েছি। কতবার দুঃখ করেছি যে বিজ্ঞান সবার হিত করবে—কিন্তু সব রাজ্যেই গভর্ণমেন্ট বিজ্ঞানীকে লাগাচ্ছেন

মারণাস্ত্র তৈরীর কাজে আর যেহেতু টাকা দেন তাঁরাই, সেহেতু তাঁদের নির্দেশিত পথ ছাড়া যাবার রাস্তাও আর আমাদের নাই।

সেই আলোচনার এক দুঃখময় পরিণাম দেখিয়ে গেলেন ডাঃ জন।...তাঁর আবিষ্কার যা পৃথিবীর মানুষের কত উপকার করতে পারত, যে আবিষ্কার তাঁকে নোবেল পুরস্কার এনে দিতে পারত, সব নিজের হাতে ধ্বংস করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন তিনি বিবেকের কাছে অপরাধী হওয়াতে। সেই কথাই আজ বলছি।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে তিনি একটা মস্তবড় শীল করা খাম আমার নামে ডাকে পাঠিয়ে একখানা আলাদা চিঠিতে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ১৯৬৯ সালের ১০ই জুন তাঁর জন্মদিনে যেন এ খাম খুলে পড়া হয় এবং ঐ তথ্য পৃথিবীতে প্রচার করা হয়। তাঁর ইচ্ছামত আমি খাম খুলেছি এবং তাঁর সব কাহিনী জেনে তোমাকে জানাচ্ছি। এই কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ 'সায়েন্স ক্রনিকলে' প্রকাশিত হবে।

ডাঃ জন ছিলেন একাধারে পদার্থ বিজ্ঞানী আবার জীব বিজ্ঞানী। বহুদিন ধরে তিনি ফসল নষ্ট করা পোকামাকড় ধ্বংস করবার জন্য গবেষণা করেছিলেন। তিনি বলতেন ঐ সব পোকামাকড় মারবার জন্য যে সব ওষুধ খুব ব্যবহার হয় তার কুফল দু'টি, এক নম্বর হ'ল ঐ সব ওষুধে পোকামাকড়রা প্রথম প্রথম মরলেও যে সবগুলো ঐ ওষুধের ক্রিয়া থেকে পালাতে পারে তাদের শরীরে ঐ সব ওষুধ ঠেকাবার মত কিছু শক্তি জন্মে যায়। কিছুদিনের পরে ঐ পোকাগুলো আর ওষুধে মরে না। শুধু তাই নয়—ওদের বাচ্চারা ঐ ওষুধের ক্রিয়াকে ঠেকাবার শক্তি নিয়েই জন্মায়। তখন আবার নূতন ধরনের ওষুধ দরকার হয় ওদের মারতে। দুই নম্বর হ'ল—ঐ সব বিষাক্ত ওষুধ খুব কম মাত্রা হলেও ফসলের সাথে সাথে অল্প মাত্রায় মানুষের পেটে গিয়ে অনিষ্ট করে। তাই তিনি অন্য কোনও উপায় আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছিলেন। আগেই বলেছি তিনি পদার্থ বিজ্ঞানী ছিলেন। রেডিও তরঙ্গ নিয়ে তাঁর গবেষণার কথা উঁচু দরের বিজ্ঞানী মহলে সবাই জানতেন। পনেরো বৎসর গবেষণার ফলে তিনি অতি সূক্ষ্ম কম্পনযুক্ত (ইংরাজীতে যাকে বলে আলট্রাসনিক) এমন এক তরঙ্গ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা ঐ সব পোকামাকড়ের মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম কোষগুলির কম্পনে ঠিক মুখোমুখি ঘা দেয়। ফলে ওদের মগজটা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আর পোকাগুলো একেবারে জড়ভরত হয়ে বসে থাকে। দু'একদিনের মধ্যে না খেয়ে শুকিয়ে মরে যায়। খুব উৎসাহিত হয়ে তিনি তাঁর গবেষণার কথা সরকারকে জানালেন। সরকারী তরফের বিজ্ঞান গবেষণা বিভাগ তাঁকে গবেষণার জন্য সব রকম সুযোগ করে দিলেন। ডাঃ জনও সব কিছু ভুলে গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। এমনই করে তাঁর যন্ত্রপাতির এমন উন্নতি তিনি করলেন যাতে পাঁচ মাইলের ভিতর যাবতীয় পোকামাকড় মেরে ফেলতে পারেন। তারপর তিনি আরম্ভ করলেন উচ্চতর প্রাণী নিয়ে গবেষণা।

পৃথিবীর সব দেশেই ইঁদুর প্রচুর ফসল নষ্ট করে। তাই তিনি এবার ইঁদুর নিয়ে পড়লেন।

কিন্তু দেখা গেল শুধু ইঁদুর নয়, ইঁদুর-বিড়াল-কুকুর প্রভৃতি বড় বড় প্রাণীও মরে যায়। এদের ব্যাপারে দেখা গেল মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হবার আধঘন্টার মধ্যেই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিষ্ক্রিয় হয়ে প্রাণী মরে যায়।

সরকারী বিজ্ঞান বিভাগ তাঁর গবেষণার সব সংবাদই রাখতেন। হঠাৎ তাঁরা নির্দেশ দিলেন তাঁর আবিষ্কৃত তরঙ্গ মানুষের মস্তিষ্কে কি ক্রিয়া করে তা পরীক্ষা করা হোক। ডাঃ জন ত নির্দেশ পেয়ে হতভম্ব। মানুষ যদি পরীক্ষা করতে গিয়ে মরে যায় বা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয় তার জন্য দায়ী হবে কে ?

সরকার তরফ থেকে বলা হ'ল তার জন্য ভাবনা নেই। প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে এরকম দু'জন মানুষের উপর পরীক্ষা চালান হবে।—ওই দুই অপরাধীর প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে। এমনই দু'জন আসামীকে চেয়ারে বসিয়ে ইলেক্ট্রিক শক না দিয়ে দেওয়া হ'ল ডাঃ জনের রেডিও তরঙ্গ। এক মিনিটের মধ্যে দু'জন কেমন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল—তারপর নিস্তেজ হয়ে আধঘন্টার মধ্যেই মরে গেল। এই আধঘন্টা অনেক ডেকেও তাদের সাড়া পাওয়া গেল না—বা কিছু খাওয়ান গেল না। ডাঃ জন তখনও জানেন না যে কি ভীষণ ফাঁদে তিনি পা দিয়েছেন। তিনি তখন তাঁর আবিষ্কারের সাফল্যে নিজেই মশগুল। এবার সরকার থেকে তাঁকে অনুরোধ করা হ'ল যে প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে কিছু জন্তু জানোয়ার রাখা হচ্ছে ডাঃ জন যেন জাহাজে করে সেখানে গিয়ে পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে ঐ তরঙ্গ পাঠিয়ে জন্তু জানোয়ারের উপর তার ক্রিয়া লক্ষ্য করেন। বলা বাহুল্য—ডাঃ জন খুশী মনেই স্বীকার করলেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি জাহাজে চেপে সেই দ্বীপের কাছে গেলেন। সমস্ত মন তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে তিনি তরঙ্গ প্রয়োগ করলেন। আনন্দে উদ্বেগে তাঁর মন তখন অভিভূত। তিনি যেন মনের চোখ দিয়ে সেই সূক্ষ্ম ইথারের কম্পন দেখতে পাচ্ছেন। যথেষ্ট সময় অপেক্ষার পর তাঁরা দ্বীপে জাহাজ লাগালেন। দেখলেন—বাঘ, হরিণ, বুনো মহিষ সব মরে পড়ে আছে এদিক ওদিক। শুধু সজারু জীবিত আছে। ডাঃ জন বললেন—'ওদের মস্তিষ্কের কম্পন পরীক্ষা করলে এই বেঁচে থাকবার কারণ বোঝা যাবে।'

গবেষণা চলতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ তরঙ্গের ক্রিয়া দুইশ' মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন ডাঃ জন। তখন সরকারী বিজ্ঞান বিভাগ আর একবার তাঁকে অনুরোধ করলেন যে প্রশান্ত মহাসাগরের আর একটি দ্বীপে পরীক্ষা চালান হোক। ডাঃ জনও মহা আনন্দিত। তিনি তাঁর সবটুকু বুদ্ধি খাটিয়ে দুইশ' মাইল পর্যন্ত সেই মারণ-তরঙ্গ চালালেন। তারপর ফিরে এলেন। দু'দিন পরে বিজ্ঞান বিভাগ তাঁকে জানাল যে সব পরীক্ষাই সফল হয়েছে। পরীক্ষার জন্য আনা একটী প্রাণীও বেঁচে নেই। আধঘন্টার মধ্যে সবগুলো মরে গেছে। ডাঃ জন যথেষ্ট আনন্দিত হলেন বটে—তবে সে আনন্দ স্থায়ী হ'ল না। ডাঃ জনের প্রধান সহকর্মী ডাঃ ইসপ জানলেন, যে সামরিক বিভাগ থেকে এ দ্বীপে তিনশ জন যুদ্ধ-বন্দী রাখা হয়েছিল। ডাঃ জনকে না জানিয়ে তাদের উপরই পরীক্ষা চালান হয়েছে। ঘটনা জানালে ডাঃ জন

কিছুতেই সহযোগিতা করতেন না তাই সব কথা গোপনেই রাখা হয়েছিল। কিন্তু যে হেলিকপ্টার থেকে ফটো নেওয়া হয়েছিল তাদেরই একজন ইসপের কাছে ফটোও দেখিয়েছে—আর সব কথা বলেছে। এই কথা শোনবার পর ডাঃ জনের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়া হ'ল। ঐ দিন তিনি নিজের ডায়েরীতে লিখেছিলেন—"কি ভয়ানক কাজ আমি করলাম। সামরিক বিভাগ কি আমাকে তাদের হাতের তরবারীর মত করে ব্যবহার করল—আমরা কি তাদের হাতের খেলার পুতুল। কি আবিষ্কার করতে চেয়েছিলাম জগতের সব মানুষের উপকার করবার জন্য! ওরা আমায় কান ধরে টেনে নিল মারণাস্ত্র আবিষ্কারের জন্য। আর না—এবার আমি নিজেকে ধ্বংস করব—আমার আবিষ্কারকে ধ্বংস করব—আর সম্পূর্ণ কাগজ-পত্রও ধ্বংস করব। নাকি অন্য কোথাও পালিয়ে যাব। কি করি!"

ডায়েরীর লেখা থেকেই তাঁর মনের ভাব বোঝা যায়। এর কিছু দিন পরে ডাঃ জনকে বিজ্ঞান বিভাগ জানালো যে এবার তাঁর গবেষণার কাগজ-পত্র বিজ্ঞান সভায় বুঝিয়ে দিন। তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান পুরস্কার ইত্যাদি দেওয়া হবে।

ডাঃ জন্ বুঝলেন এবার সব কাগজ-পত্র বুঝে নিয়ে আরও বিজ্ঞানী লেগে পড়বেন মারণাস্ত্রটিকে সম্পূর্ণ করবার জন্য!

এক সপ্তাহ ডাঃ জন চিন্তা করলেন, তারপর মন স্থির করে ফেললেন। বিজ্ঞান পরিষদকে তিনি জানালেন যে প্রশান্ত

মহাসাগরের আর একটা দ্বীপে তাঁকে আর একবার পরীক্ষা করবার সুযোগ দেওয়া হোক। তারপর তিনি তাঁর আবিষ্কারের মূল সূত্র প্রকাশ করবেন।

গভর্ণমেন্ট তাঁর কথা মেনে নিয়ে জাহাজের ব্যবস্থা করে দিলেন।

তারপর এল সেই ভয়ঙ্কর দিনটি। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জাহাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। ডাঃ জন তাঁর সমস্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে জাহাজের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছেন। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে তিনি পরীক্ষা আরম্ভের অছিলায় সব লোকজন সরিয়ে দিলেন। তারপর প্রথমেই একটা ভারী-হাতুড়ির সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সব গবেষণার কাগজ-পত্র সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর এক এক করে সব যন্ত্রপাতি সমুদ্রে দিতে লাগলেন। জাহাজের ক্যাপটেন দূর থেকে দেখে ছুটে এল। ডাঃ জন কি পাগল হলেন নাকি? ক্যাপটেন কাছে আসতে আসতেই ডাঃ জন মুখে হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিডের ক্যাপসুল পুরে গিলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণহীন দেহ সমুদ্রে পড়ে ডুবে গেল। ক্যাপটেন এবং লোকজন এসে দেখল কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধুই সমুদ্রের জলে কয়েকটা বুদ্বুদ উঠে এল যেন ডাঃ জনের বিদ্রূপের হাসি!

ডাঃ জন যেন সমস্ত বৈজ্ঞানিককে পথ দেখিয়ে গেলেন—যে বিজ্ঞান যদি বিপথে চলে তবে সেই পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত!

১৩৭৬

ইতি—

তোমার বিশ্বস্ত—গনস্

●

ঢাক গুড় গুড়

সরল দে ॥

ঢাক গুড় গুড় ঢাক গুড় গুড়
ঢাকনা দিয়ে রাখ,
চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে—
কখন হবে ফাঁক।

ঢাক গুড় গুড় ঢাক গুড় গুড়
কে ঘুর ঘুর করে?
বাইরে আছে কাক-পক্ষী,
হুলো বেড়াল ঘরে।

ক্ষুদে পিঁপড়ে ডেয়ো পিঁপড়ে,
ইঁদুর আরশোলা,
দেখলে ওদের সপ্ সপিয়ে
উঠতে পারে নোলা।

খোকন বলে, তার চে' ভাল
পেটের মধ্যে থাক!
ঢাক গুড় গুড় ঢাক গুড় গুড়—
এককেবারে ফাঁক ॥

-১৩৭৩

ভজহরি ফিল্ম কর্পোরেশন

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বউবাজার দিয়ে আসতে আসতে ভীমনাগের দোকানের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে গেল টেনিদা। আর নড়তে চায় না। আমি বললুম, রাস্তার মাঝখানে অমন করে দাঁড়ালে কেন ? চলো।

—যেতে হবে ? নিতান্তই যেতে হবে ? কাতর দৃষ্টিতে টেনিদা তাকালো আমার দিকে। প্যালা, তোর প্রাণ কি পাষাণে গড়া ? ওই ত্যাখ, থরে থরে সন্দেশ সাজানো রয়েছে, থালার ওপর সোনালি রঙের রাজভোগ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, রসের মধ্যে ডুব-সাঁতার কাটছে রসগোল্লা, পান্‌তো। প্যালারে—

আমি মাথা নেড়ে বললুম, চালাকি চলবে না। আমার পকেটে তিনটে টাকা আছে, ছোট মামার জন্তে মকরধ্বজ কিনতে হবে। অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে, চলো এখন—

টেনিদা শাঁ করে জিভে খানিকটা লালা টেনে নিয়ে বললে, সত্যি বলচি, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে রে। আচ্ছা, দুটো টাকা আমায় এখন ধার দে, বিকেলে না হয় ছোট মামার জন্তে মকরধ্বজ—

কিন্তু ওসব কথায় ভোলবার বান্দা প্যালারাম বাঁড়ুয্যে নয়। টেনিদাকে টাকা ধার দিলে সে টাকা আদায় করতে পারে এমন খলিফা লোক দুনিয়ায় জন্মায় নি। পকেটটা শক্ত করে ঢেকে ধরে আমি বললুম, খাবারের দোকান চোখে পড়লেই তোমার পেট চাঁই চাঁই করে ওঠে—ওতে আমার সিম্‌প্যাথি নেই। তা ছাড়া, এবেলা মকরধ্বজ না নিয়ে গেলে আমার ছেঁড়া কানটা সেলাই করে দেবে কে ? তুমি ?

রেলগাড়ির এঞ্জিনের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেনিদা।

—ব্রাহ্মণকে সকালবেলা দাগা দিলি প্যালা—মরে তুই নরকে যাবি।

—যাই তো যাব। কিন্তু ছোট মামার কান-মলা যে নরকের চাইতে ঢের মারাত্মক সেটা জানা

আছে আমার। আর, কী আমার ব্রাহ্মণ রে! দেলখোস্ রেস্তোরায় বসে আস্তে আস্তে মুরগীর ঠ্যাং চিবুতে তোমায় যেন দেখি নি আমি!

—উঃ! সংসারটাই মরীচিকা—ভীমনাগের দোকানের দিকে তাকিয়ে শেষবার দৃষ্টিভোজন করে নিলে টেনিদা : নাঃ, বড়লোক না হলে আর সুখ নেই।

বিকেলে চাটুয্যেদের রোয়াকে বসে সেই কথাই হচ্ছিল।

ক্যাব্‌লা গেছে কাকার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে, হাবুল সেন গেছে দাঁত তুলতে। কাজেই আছি আমরা দু'জন। মনের দুঃখে দু' ঠোঙ্গা তেলেভাজা খেয়ে ফেলেছে টেনিদা। অবশ্য পয়সাটা আমিই দিয়েছি এবং আধখানা আলুর চপ ছাড়া আর কিছুই আমার বরাতে জোটে নি।

আমার পাঞ্জাবীর আস্তিনটা টেনে নিয়ে টেনিদা মুখটা মুছে ফেলল। তারপর বললে, বুঝলি প্যালা, বড়লোক না হলে সত্যিই আর চলছে না।

—বেশ তো, হয়ে যাও না বড়লোক— আমি উৎসাহ দিলুম।

—হয়ে যাও না বড়লোক! হওয়াটা একেবারে মুখের কথা কিনা। টাকা দেবে কে, শুনি? তুই দিবি?—টেনিদা ভেংচি কাটল। আমি মাথা নেড়ে জানালুম, না, আমি দেব না।

—তবে?

—লটারীর টিকেট কোনো।—আমি উপদেশ দিলুম।

—ধ্যাত্তোর লটারীর টিকিট! কিনে কিনে হয়রান হয়ে গেলুম, একটা ফুটো পয়সাও যদি জুটত কোনো বার! লাভের মধ্যে টিকিটের জন্যে বাজারের পয়সা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লুম, বড়দা দু'টো অ্যায়সা থাপ্পড় কষিয়ে দিলে! ওতে হবে না—বুঝলি? বিজ্‌নেস করতে হবে।

—বিজ্‌নেস!

—আলবাৎ বিজ্‌নেস!—টেনিদার মুখ—সংকল্পে কঠোর হয়ে উঠল: ওই যে কী বলে, হিতোপদেশে লেখা আছে না, বাণিজ্যে বসতি ইয়ে—মানে লক্ষ্মী? ব্যবসা ছাড়া পথ নেই—বুঝেছিস?

—তা তো বুঝেছি। কিন্তু তাতেও তো টাকা চাই।

—এমন বিজ্‌নেস করবে যে নিজের একটা পয়সাও খরচ হবে না। সব পরস্মৈপদী—মানে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে।

—সে আবার কী বিজ্‌নেস?—আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলুম।

—হুঁ হুঁ, আন্দাজ কর দেখি?—চোখ কুঁচকে মিটি মিটি হাসতে লাগল টেনিদা: বলতে পারলি না তো? ওসব কি তোর মতো নিরেট মগজের কাজ? এম্‌নি একটা মাথা চাই, বুঝলি?—সগৌরবে টেনিদা, নিজের ব্রহ্ম তালুতে দু'টো টোকা দিলে।

—কেন ছলনা করছ? বলেই ফেল না—আমি কাতর হয়ে জানতে চাইলুম।

টেনিদা একবার চারদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখে নিলে, তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললে, ফিলিম কোম্পানী!

—অ্যাঁ!!—আমি লাফিয়ে উঠলুম।

—গাধার মতো চ্যাঁচাস্‌নি—টেনিদা ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠলো: সব প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। তুই গল্প লিখবি—আমি ডাইরেক্‌ট্‌—মানে, পরিচালনা করব। দেখবি, চারদিকে হৈ হৈ পড়ে যাবে।

—ফিলিমের কী জানো তুমি? আমি জানতে চাইলুম।

কে-ই বা জানে? টেনিদা তাচ্ছিল্য ভরা একটা মুখভঙ্গি করলে: সবাই সমান সকলের মগজেই গোবর। তিনটে মারামারি, আটটা গান আর গোটা কতক ঘর বাড়ি দেখালেই ফিলিম হয়ে যায়। টালীগঞ্জে গিয়ে আমি শুটিং দেখে এসেছি তো।

—কিন্তু তবুও—

—ধ্যাৎ, তুই একটা গাড়ল!—টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, সত্যি সত্যিই কি আর ছবি তুলব আমরা! ওসব ঝামেলার মধ্যে কে যাবে!

—তা হলে?

—শেয়ার বিক্রী করব। বেশ কিছু শেয়ার বিক্রী করতে পারলে—বুঝলি তো?—টেনিদা চোখ টিপল: দ্বারিক, ভীমনাগ, দেলখোস, কে. সি দাশ—

এইবার আমার নোলায় জল এসে গেল। চুক্‌ চুক্‌ করে বললুম,—থাক্‌ থাক্‌, আর বলতে হবে না।

পরদিন গোটা পাড়াটাই পোষ্টারে পোষ্টারে ছেয়ে গেল।

"দি ভজহরি ফিল্ম কর্পোরেশন"

আসিতেছে—আসিতেছে

রোমাঞ্চকর বাণীচিত্র

"বিভীষিকা" !!

পরিচালনা : ভজহরি মুখোপাধ্যায় (টেনিদা)

কাহিনী : প্যালারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

তার নীচে ছোট ছোট হরফে লেখা :

সর্বসাধারণকে কোম্পানীর শেয়ার কিনিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য মাত্র আট আনা। একত্রে তিনটি শেয়ার কিনিলে মাত্র এক টাকা।

এর পরে একটা হাত এঁকে লিখে দেওয়া হয়েছে : বিশেষ দ্রষ্টব্য—শেয়ার কিনিলে প্রত্যেককেই বইতে অভিনয়ের চান্স দেওয়া হইবে। এমন সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। মাত্র অল্পই শেয়ার আছে, এখন না কিনিলে পরে পস্তাইতে হইবে। সন্ধান করুন—১৮নং পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা।

আর, বিজ্ঞাপনের ফল যে কত প্রত্যক্ষ হতে পারে, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই হাতে-নাতে তার প্রমাণ মিলে গেল। এমন প্রমাণ মিলল যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

অত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা আমরা আশা করি নি। টেনিদার এত বড় বাড়িটা একেবারে খালি, বাড়িশুদ্ধ সবাই গেছে দেওঘরে হাওয়া বদলাতে। টেনিদার ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে, তাই একা রয়ে গেছে বাড়িতে, আর আছে চাকর বিষ্টু।

তাই দিব্যি আরাম করে বসে আমরা তে-তলার ঘরে রেডিয়ো শুনছি আর পাঁটার ঘুগনি খাচ্ছি, এমন সময় বিষ্টু খবর নিয়ে এল মূর্তিমান একটি ভগ্নদূতের মতো।

বিষ্টুর বাড়ি চাটগাঁয়। হাই মাই করে নাকি সুরে কী যে বলে ভালো বোঝা যায় না। তবে যেটুকু বোঝা গেল, শুনে আমরা আঁতকে উঠলুম। গলায় পাঁটার ঘুগনি বেধে গিয়ে মস্ত একটা বিষম খেলো টেনিদা।

বিষ্টু জানালো : 'ঁআড়িত্ ডাঁহাইত হইড়্ছে' (বাড়িতে ডাকাত পড়েছে) !

বলে কী ব্যাটা! পাগল না পেট খারাপ! ম্যাড়া না মিরগেল! এই ভরদুপুর বেলায় একেবারে কলকাতার বুকের ভেতর ডাকাত পড়বে কী রকম!

বিষ্টু বিবর্ণ মুখে জানালো : নীছে হাঁসি দেইক্যা যান (নীচে এসে দেখে যান)।—আমি ভাবছিলাম খাটের তলাটা নিরাপদ জায়গা কিনা, কিন্তু টেনিদা এমন এক বাঘা হাঁকার ছাড়লে যে আমার পালা-জ্বরের পিলেটা দস্তুরমতো হকচকিয়ে উঠল।

—কাপুরুষ! চলে আয় দেখি—একটা বোম্বাই ঘুষি হাঁকিয়ে ডাকাতের নাক থ্যাবড়া করে দি! আমি নিতান্ত গোবেচারা প্যালারাম বাঁড়ুয্যে, সিং মাছের ঝোল খেয়ে প্রাণটাকে কোনোমতে ধরে

রেখেছি, ওসব ডাকাত-ফাকাতের ঝামেলা আমার ভালো লাগে না। বেশ তো ছিলাম, এসব ভজঘট ব্যাপার কেন রে বাবা আমি বলতে চেষ্টা করলুম, এই—এই মানে, আমার কেমন পেট কামড়াচ্ছে—

—পেট কামড়াচ্ছে! টেনিদা গর্জন করে উঠল: পাঁটার ঘুগনি সাবাড় করার সময় তো সে কথা মনে ছিল না দেখছি। চলে আয় প্যালা, নইলে তোকেই আগে—

কথাটা টেনিদা শেষ করল না, কিন্তু তার বক্তব্য বুঝতে বেশি দেরী হ'ল না আমার। 'জয় মা দুর্গা'—কাঁপতে কাঁপতে আমি টেনিদার অনুসরণ করলুম।

কিন্তু না—ডাকাত পড়ে নি।

পটলডাঙার মুখ থেকে কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত 'কিউ'!

কে নেই সেই কিউতে? স্কুলের ছেলে মোড়ের বিড়িওয়ালা, পাড়ার ঠিকে ঝি, উড়ে ঠাকুর, এমন কি যমদূতের মত দেখতে একজোড়া ভীমদর্শন কাবুলীওয়ালা!

আমরা সামনে এসে দাঁড়াতেই গগনভেদী কোলাহল উঠল।

—আমি শেয়ার কিনব—

—এই নিন্ মশাই আট আনা পয়সা—

ঝি বললে, ওগো বাছারা, আমি একটা টাকা এনেছি। আমাকে তিনখানা শেয়ার দাও—আর একটা হিরোইনের চান্স দিও—

পাশের বোর্ডিংটার উড়ে ঠাকুর বললে, আমিও আষ্টো গণ্ডা পয়সা আনুচি—

সকলের গলা ছাপিয়ে কাবুলীওয়ালা রুদ্র কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল: এঃ বাব্বু, এক এক রূপেয়া লায়া, হাম্‌কো ভি চান্স্ চাহিয়ে—

তারপরেই সমস্বরে চীৎকার উঠল: চান্স্—চান্স্!

চীৎকারের চোটে আমার মাথা ঘুরে গেল—দু'হাতে কান চেপে আমি বসে পড়লুম।

আশ্চর্য, টেনিদা দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে রইল একেবারে শান্ত, শুদ্ধ বুদ্ধদেবের মতো। শুধু তাই নয়, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত একটা দাঁতের ঝলক বয়ে গেল তার—মানে, হাসল।

তারপর বললে, হবে, হবে, সকলেরই হবে।—বরাভয়ের মতো একখানা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, প্রত্যেককেই চান্স্ দেওয়া হবে। এখন চাঁদেরা আগে সুড় সুড় করে পয়সা বের করো দেখি। খবরদার, অচল আধুলি চালিয়ো না—তা হলে কিন্তু—

* * *

—জয় হিন্দ্—জয় হিন্দ্—

ভিড়টা কেটে গেলে টেনিদা দু'হাত তুলে নাচতে সুরু করে দিলে। তারপর থপ্ করে একটা চেয়ারে বসতে গিয়ে চেয়ারশুদ্ধই চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল।

আমি বললুম, আহা-হা—

কিন্তু টেনিদা উঠে পড়েছে ততক্ষণে। আমার কাঁধের ওপর এমন একটা অতিকায় থাবড়া বসিয়ে দিলে যে, আমি আর্তনাদ করে উঠলুম।

—ওরে প্যালা, আজ দুঃখের দিন নয় রে, বড় আনন্দের দিন! মার্ দিয়া কেল্লা! ভীমনাগ, দ্বারিক ঘোষ, চাচার হোটেল, দেলখোস—আঃ!

যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে আমিও বললুম আঃ!

—আর, শুনে দেখি—এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত আবার হাসির ঝলক উলসে উঠল।

রোজগার নেহাৎ মন্দ হয় নি। গুণে দেখি ছাব্বিশ টাকা বারো আনা!

— বারো আনা?—টেনিদা ভ্রূকুটি করলে, বারো আনা কী করে হয়? আট আনা আর এক টাকা করে হলে—উঁহু! নিশ্চয় ডামাডোলের মধ্যে কোনো ব্যাটা চার গণ্ডা ফাঁকি দিয়েছে—কী বলিস?

আমি মাথা নেড়ে জানালুম, আমার তাই মনে হয়!

—উঃ—দুনিয়ার সবই জোচ্চোর। একটাও কি ভালো লোক থাকতে নেই রে? দিলে সকাল বেলাটায় বামুনের চার আনা পয়সা ঠকিয়ে।—টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: যাক, এতেও নেহাৎ মন্দ হবে না। দেলখোস, ভীমনাগ, দ্বারিক ঘোষ—

আমি তার সঙ্গে জুড়ে দিলুম, চাচার হোটেল কে. সি. দাশ—

টেনিদা বললে, ইত্যাদি—ইত্যাদি। কিন্তু শোন্ প্যালা, একটা কথা আগেই বলে রাখি। প্ল্যানটা আগাগোড়াই আমার। অতএব বাবা সোজা হিসেব—চৌদ্দ আনা—দু' আনা।

আমি আপত্তি করে বললুম, অ্যাঁ, তা কি করে হয়?

টেনিদা সজোরে টেবিলে একটা কিল্ মেরে গর্জন করে উঠল, হু, তাই হয়। আর তা যদি না হয়, তা হলে তোকে সোজা দোতলার জানালা গলিয়ে নীচে ফেলে দেওয়া হয়, সেটাই কি তবে ভালো হয়?

আমি কান চুলকে বললুম, না, সেটা ভালো হয় না।

—তবে চল্—গোটা কয়েক মোগলাই পরোটা আর কয়েক ডিশ ফাউলকারী খেয়ে ভজহরি ফিল্ম কর্পোরেশনের মারফৎ করে আসি।—টেনিদা ঘর-ফাটানো একটা পৈশাচিক অট্টহাসি করে উঠল। হাসির শব্দে ভেতর থেকে ছুটে এল বিষ্টু। খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললে, ছুটোবাবুর মাথা হাঁড়াপ্ (খারাপ) অইচে।

কিন্তু দিন কয়েক বেশ কেটে গেল। দ্বারিকের রাজভোগ আর চাচার কাটলেট খেয়ে শরীরটাকে দস্তুর মতো ভালো করেছি দু'জনে। কে. সি. দাশের রসোমালাই খেতে খেতে দু'জনে ভাবছি—আবার নতুন কোনো একটা প্ল্যান করা যায় কিনা, এমন সময়—

দোরগোড়ায় যেন বাজ ডেকে উঠল।

সেই যমদূতের মতো একজোড়া কাবুলীওয়ালা। অতিকায় জাব্বাজোব্বা আর কালো চাপ-দাড়ির ভেতর দিয়ে যেন জিঘাংসা ফুটে বেরোচ্ছে।

আমরা ফিরে তাকাতেই লাঠি ঠুকল : এঃ বাব্বু:—রূপেয়া কাঁহা? হাম্‌লোগ্‌ গা চাল কি ধর?

—আঁঃ!—টেনিদার হাত থেকে রসোমালাইটা বুক-পকেটের ভেতর পড়ে গেল : প্যালারে, সেরেছে!

—সারবেই তো!—আমি বললুম, তবে আমার সুবিধে আছে। চৌদ্দ আনা—দু' আনা। চৌদ্দ আনা ঠ্যাঙানি তোমার, মানে স্রেফ্‌ ছাতু করে দেবে। দু' আনা খেয়ে আমি বাঁচলেও বেঁচে যেতে পারি।

কাবুলীওয়ালারা আবার হাঁকল :—এঃ ভজহরি বাব্বু, —বাহার তো আও—

বাহার আও—মানেই

নিমতলা যাও! টেনিদা এক লাফে উঠে দাঁড়াল, তারপর সোজা আমাকে বগলদাবা করে পাশের দরজা দিয়ে অন্তদিকে!

—ওগো ভালো মানুষের বাছারা, আমার ট্যাকা কই, চাল্‌ কই?

ঝি। হাতে আঁশবটি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

আমারো চাল্লো মিলিবো কিনা?—উড়ে ঠাকুর ভাত রাঁধবার খুন্তিটাকে হিংস্রভাবে আন্দোলিত করল।

—জোচ্চুরি পেয়েছেন স্যার—আমরা শ্যামবাজারের ছেলে—আস্তিন গুটিয়ে একদল ছেলে তাড়া করে এল।

এক মুহূর্ত আমাদের চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন ঘুরতে লাগল। তারপরেই—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!' আমাকে কাঁধে তুলে টেনিদা একটা লাফ মারল। তারপর আমার আর ভালো করে

জ্ঞান রইল না। শুধু টের পেলুম, চারদিকে একটা পৈশাচিক কোলাহল : "চোট্টা—চোট্টা—ভাগ যাতা—" আর বুঝতে পারলুম—যেন পাঞ্জাব মেলে চড়ে উড়ে চলেছি!

ধপাৎ করে মাটিতে পড়তেই আমি হাঁউমাউ করে উঠলুম। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি হাওড়া স্টেশন। রেলের একটা এঞ্জিনের মতোই হাঁপাচ্ছে টেনিদা।

বললে, হুঁ হুঁ বাবা, পাঁচশো মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ান—আমাকে ধরবে ওই ব্যাটারা! যা প্যালা—পকেটে এখনো বারো টাকা চার আনা রয়েছে, ঝট করে দু'খানা দেওঘরের টিকিট কিনে আন। দিল্লী এক্সপ্রেস এক্ষুনি ছেড়ে দেবে। *

* ১৩৫৫ সনের বার্ষিক শিশুসাথীতে প্রকাশিত।

টিক্ টিক্

বলিতেছে ঘড়ি যেন করি "টিক্ টিক্"—
"করিবার আছে যাহা করে ফেল ঠিক!
সময় যেতেছে ব'য়ে জলের মতন,
কর শিশু, কর কাজ, কলের মতন!
"পড়িবার আছে যাহা এখনি তা' পড়,
করিও না খুঁৎ খুঁৎ—কাজে হও দড়!
কাজ শেষ হয়ে গেলে পাও যেই সুখ—
এমন পাবে না আর—বুঝ' এইটুক্।
"বাপমায় বলে যবে—'শোন্ বাছা শোন্,
করিও না অবহেলা—খুঁজিও না কোণ্,
করিও না দেরী শিশু একটী নিমিখ্—
করিবার আছে যাহা করে ফেল ঠিক্।

১৩৩৩

কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি-এ

কুটুম এল

শ্রীরবিদাস সাহা-রায়

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন তোমাদের ঠাকুরদার ঠাকুরদারও জন্ম হয় নি।

এক দেশে এক কৃপণ চাষা বাস করত। নাম তার বংশী। সে কি যেমন-তেমন কৃপণ? যাকে বলে 'হদ্দ কিপ্টে'। পিঁপড়ে গুড় খেয়ে পালালে তার পা থেকে গুড় চিমটি কেটে রাখত। লোকে ভোরবেলা তার মুখ দেখলে মনে করত দিনটা খারাপ যাবে। যাত্রার সময় তাকে দেখলে লোকে ভাবত—অযাত্রা।

কিন্তু কৃপণ হলে কি হয়! তার একটি সুন্দরী ফুটফুটে মেয়ে ছিল। মেয়েটি যখন খেলা করত তখন মনে হ'ত একফালি রোদ ঝলমল করছে—যখন হাসত তখন মনে হ'ত পদ্মফুল ফুটে উঠল।

চাষার ঘরের মেয়ে—আদর নেই যত্ন নেই। বনের ভেতর গাছ যেমন অনাদরে ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে, তেমনি মেয়েটি বড় হতে লাগল। এত রূপ—তার উপর ডাগরটিও হয়ে উঠল—মেয়েকে তো আর ঘরে রাখা যায় না; চাষার বউ ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্যে।

কিন্তু চাষার ভাবনা হ'ল—বিয়ের খরচ নিয়ে। মেয়েকে বিয়ে দিতে হলে টাকা-পয়সা খরচ করতে হবে। খরচের কথা উঠলেই কৃপণের গায়ে জ্বর আসে—দাঁতকপাটি লাগে।

অবশেষে বংশী মনে এক ফন্দি আটল। ভাল জামাই আনলে যৌতুক দিতে হবে। তার চেয়ে যদি যেমন-তেমন একটা জামাই ধরে আনা যায় তা হলে সে আর যৌতুক বা টাকা চাইতে পারবে না—তার মেয়েকে দেখেই খুসী হবে। এই ভেবে, বংশী মেয়ের জন্যে বর খুঁজতে বেরিয়ে গেল।

মেয়ে বিয়ে দিলেও আবার কম জ্বালা নয়। জামাই মাঝে মাঝে শ্বশুর-বাড়ী এসে হাজির হবে। তখন তাকে আদরযত্ন করতে হবে—ভাল করে খাওয়াতে হবে। তাতেও খরচা হয়ে যাবে অনেক টাকা। এসব কথা ভাবতে ভাবতে চাষার মেজাজ বিগড়ে যাবার উপক্রম হ'ল।

চলতে চলতে এক ক্ষেতের কাছে এসে বংশী থামল। সেখানে কয়েকজন চাষা একটি পাটের ক্ষেতে নিড়েন দিচ্ছিল। কয়েকজন আবার ক্ষেতের বাইরে বসে তামাক খেতে খেতে জটলা পাকাচ্ছিল। বংশীও তামাক খাবার ছুতায় সেখানে বসে পড়ল।

একজন চাষা হুঁকোটা এগিয়ে দিল বংশীকে, তারপর জিজ্ঞেস করল—ঘর কোথায় গা?

—ঐ তো ওখানে—ঐ কালো গাঁটার কাছে। হাতের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বংশী। তারপর কথায় কথায় মেয়ের বিয়ের কথা তুলল। একজন জিজ্ঞেস করল—মেয়ে দেখতে কেমন?

—সুন্দরী।

—হাত-পায়ের গড়ন?

—ভাল।

—চোখ?

—কালো। জোড়া ভুরু।

—বয়স

—আট কি দশ।

—দেবে কি কি?

এবার বংশীর মুখ শুকিয়ে গেল। মেয়ের এত রূপ-গুণের বর্ণনা দেবার পরও যে দেনা-পাওনার কথা উঠবে তা সে ভাবতে পারে নি। সে মুখ কাচুমাচু করে বলল—গরীব মানুষ, খেতে পাই না, দেবার সাধ্য কি আর কিছু আছে?

—যৌতুক ছাড়া কি মেয়ের বিয়ে হয়?

—সেই দুঃখেই তো সকাল সকাল মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলছি। খেতে পরতে দিতে পারি না—যদি কেউ আহ্লাদ করে আমার ছোট মেয়েকে নিয়ে যায়—

একজন বুড়ো চাষা ক্ষেতের এক ধারে বসে বসে নিড়েন দিচ্ছিল, বংশীর কথা শুনে তার দয়া হ'ল। সে বলল—আমার এক ছেলে আছে—দেবে তোমার মেয়েকে?

কথা শুনে বংশী যেন হাতে চাঁদ পেল। সে হাতজোড় করে বলল—যদি দয়া করে তোমাদের ঘরে নাও তো আমি বেঁচে যাই—রক্ষে পাই।

—তা হলে যাব তোমার বাড়ী একদিন মেয়ে দেখতে।

বংশীর বুকে যেন শেল পড়ল। সর্ব্বনাশ! তা হলেই তো মুসকিল! মেয়ে দেখতে গেলে আদর করে বসাতে হবে, খাওয়াতে হবে—সে কি কম খরচ?

কাজেই বংশী বিষম চিন্তায় পড়ল। কিছুক্ষণ পর একটা উপায় তার মাথায় এল। এতে মনটা যেন তার অনেক হাল্কা হয়ে গেল। বিনয়ভরে সে বলল—এত কষ্ট করে কেনই বা আমার বাড়ী যাবে—তা ছাড়া রাস্তাঘাটও বড় ভাল নয়। যদি বল তো আমিই মেয়ে নিয়ে তোমার বাড়ীতে দেখিয়ে যেতে পারি।

বুড়ো কথা শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল। নূতন বেয়াইবাড়ীর খাওয়াটা মারা যাবে ভেবে মনে একটু দুঃখও হ'ল। তারপর যখন ভেবে দেখল—মেয়ে দেখতে গেলে পাট-নিড়ানির একটা মূল্যবান দিন মারা যাবে, তখন মনে মনে একটু খুসীও হ'ল। তারপর যখন আরও ভেবে দেখল যে, মেয়েকে বাড়ীতে নিয়ে এলে বাড়ীর মেয়েরাও কনে দেখতে পাবে, তখন সে আরও খুসী হয়ে উঠল।

বুড়ো বলল—আচ্ছা, তা হলে নিয়ে এস একদিন। কবে আনবে?

—কাল।—বংশী বলল।

—কাল? এত শীগ্‌গির? আচ্ছা, তাই এস। খুব সকাল সকাল আসবে—যেন নিড়ানির বেলা কামাই না হয়।

বংশী রাজি হয়ে চলে গেল।

এমন টুকটুকে মেয়ে—পছন্দ না হয় কার? মেয়েকে দেখে বুড়োর বাড়ীতে কাড়াকাড়ি লেগে গেল। একবার ছেলের মা কোলে নেয়—একবার দিদি কোলে নেয়—আহ্লাদ করে বুড়োও মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

মেয়ের মত মেয়ে বটে।

গাঁয়ের লোকে বলাবলি করতে লাগল—বুড়োর ভাগ্যি ভাল। বুড়োর ছেলেরও ভাগ্যি ভাল, নইলে এমন মেয়ে এ বাড়ীর বউ হয়ে আসে?

কিন্তু কিপ্টে বংশী যে এমন টুকটুকে মেয়েকে বিয়ে দিতে যাচ্ছে, সে কিন্তু ভাবী জামাইটিকে ভাল করে দেখলেও না। জামাই যে একটি হাঁড়িমুখো গোবর গণেশ—দেখেও দেখলে না।

তারপর ভাল দিন দেখে-বিয়ে হয়ে গেল।

বংশীর এবার যেন হাত-পা জুড়োল। মনটা প্রথম প্রথম কয়েক দিন মেয়ের জন্ম খারাপ লাগলেও ধীরে ধীরে তা সয়ে গেল।

কিন্তু মেয়ের মা তো আর এমন কিপ্টে নয়। কাজেই তার মনের দুঃখ আর কাটে না। মেয়ের জন্য তার মনটা রোজই যেন কেমন করে। মা ভাবে মেয়েকে এনে কিছুদিন নিজের কাছে রাখবে। কিন্তু বংশী বাধা দেয়, বলে—এই তো মাত্র সেদিন বিয়ে হ'ল, এর মধ্যেই এত অস্থির হয়ে পড়লে! চিরকাল তো মেয়ে থাকবে পরের ঘরে।

মায়ের মন কি আর এ সব কথা মানে? মেয়েকে দেখবার জন্যে সে অস্থির হয়ে উঠল। জামাইএর উপরেও একটা মায়া এসে গেছে। তাকেও দেখতে তার ইচ্ছে হয়।

স্বামী যখন কিছুতেই তার কথায় কান দেয় না তখন সে গোপনে অন্য লোক পাঠিয়ে জামাইকে আনবার জন্যে খবর পাঠিয়ে দিল; ভাবল, জামাই এলে সব কথা তাকে খুলে বলবে—তারপর জামাই মাঝে মাঝে তার মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে আসবে।

জামাই এল। তাকে দেখেই তো বংশীর চোখ চড়কগাছ! সর্ব্বনাশ! এ কি আপদ এসে জুটল। প্রথম জামাই এসেছে—তাকে ভাল ভাল খাওয়াতে হবে, নূতন কাপড় দিতে হবে—এত খরচ করলে যে সে একেবারে দেউলে হয়ে যাবে! বংশীর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠল।

জামাই এসে বংশীকে প্রণাম করল। বংশী আশীর্ব্বাদ করল না—একটা কথা পর্য্যন্ত বলল না, চুপ করে রইল।

চাষার বউ স্বামীর মনের ভাব বুঝতে পেরে ভয়ানক লজ্জিত হ'ল। ছিঃ ছিঃ, এতদিন পর নূতন জামাই এসেছে তার সঙ্গে এমন ব্যাভার!

সে গোপনে বংশীকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বললে—তুমি এসব করছ কি? জামাই নূতন শ্বশুর-বাড়ী এসেছে—কি মনে করবে?

বংশী থতমত খেয়ে বলল—এসেছে আসুক, কিন্তু খরচপত্তর আমি করতে পারব না। আজ এসেছে—আবার দু'দিন পরে ঝুপ করে এসে হাজির হবে—তখন? আমি কি দানছত্তর খুলে বসেছি নাকি?

—চুপ চুপ! ওসব তোমার ভাবতে হবে না, খরচপত্তর করে বাজার থেকে কিছু আনতে হবে না। ঘরে ডাল আছে—ডাল-ভাত জামাইকে খাওয়াব।

বউএর কথা শুনে বংশী যেন একটু নিশ্চিন্ত হ'ল। সে চুপ করে গেল।

চাষার বউ উনুনে ডাল চাপিয়ে দিল। মাছ নেই—তরকারী নেই—জামাইকে কি দিয়ে খাওয়াবে! চাষার বউ বিষম চিন্তায় পড়ে গেল। এক ডাল, তাও যদি ভাল না হয় তবে জামাই খেয়ে নিন্দে করবে। কাজেই ডাল যাতে ভাল রান্না হয়—খেয়ে জামাই প্রশংসা করে—সেজন্যে ভাল করে রান্নার দিকে মন দিল।

যে ঘরে চাষার বউ রান্না করছিল, সে ঘরটা ছিল স্যাঁৎসেতে—অন্ধকার। বেশী খরচ লাগবে ভয়ে কিপ্টে বংশী ভাল করে রান্নাঘর তোলবার দরকার মনে করে নি।

হাঁড়ির ভেতর ডাল ফুটছে, চাষার বউ তাতে হলুদ দিল—ডালের রং যদি ভাল না হয় তবে জামাই নিন্দে করবে। কিন্তু ডালের রং ফুটল না।

আবার হলুদ দিল। তাতেও ডালের রং খুলল না।

আবারও খানিকটা হলুদ দিয়ে দিল হাঁড়ির মধ্যে। এবারও রংটা যেন একটু ফ্যাকাসে মনে হ'ল। চাষার বউ নিরুপায় হয়ে আবার হলুদের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিল ডালের ওপর।

আসল কথা, ঘরের অন্ধকারের দরুণ ডালের রং ভাল করে বোঝা যাচ্ছিল না। এবার সে হাঁড়িটা বাইরে নিয়ে এল।

সর্ব্বনাশ! ডাল যে একেবারে হলুদে পোড়া হয়ে গেছে! কোন্ মুখে এ ডাল জামাইকে সে খেতে দেবে? চাষার বউ লজ্জায় যেন মরে গেল। রাগ হ'ল তার নিজের ওপর—অভিমান হ'ল তার কৃপণ স্বামীর ওপর। ক্ষোভে দুঃখে শেষে হাঁড়িটা নিজের মাথায় আছড়ে ভেঙে ফেলল।

দেখতে দেখতে চাষার বউ হলদে পাখী হয়ে গেল। সারা দেহে তার হলুদভরা ডালের রং আর মাথায় সেই ভাঙা হাড়ির কালো দাগ লেগে রইল।

আজও কোন বাড়ীতে অতিথি এলে সেই পাখী 'কুটুম এল' বলে ডেকে ওঠে।

হিসেবের ঠ্যালা

শক্তিপদ রাজগুরু

"আচ্ছা—ওই বিট্লে বামুনের এত পিত্তেপ কেন বল দিকি? এসেছিলাম নেমতন্ন খেতে না মানসাঙ্কের পরীক্ষা দিতে? অধিকারীরা কি ওকে ছেলে তাড়ানোর জন্যই ডেকে এনেছিল?"

আমার কথায় সন্তু জবাব দেয়—'থাম—মেলা বকিস্ না'।

খিদেতে আঁতকস্তালে লেগে গেছে। উঃ—" একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সন্তু মাথার চুলে হাত লাগিয়ে পট্ পট্ করে টানতে থাকে।

আপশোষ হবারই কথা। কার না হয়। অধিকারীদের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নবমীতে গ্রাম শুদ্ধ লোকের নেমতন্ন, ছেলেরাও বাদ যায় নি। বিশাল চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় সতরঞ্চি পেতে দেওয়া হয়েছে। প্রবীন ব্যক্তিরা এসে হাজির হয়েছেন সদলবলে, সঙ্গে সিকি দু'আনির মত ছোট বড়ো ছেলেপুলে নাতি নাতনীকে হাজির করে। মনসা ভট্চায নিম্নপ্রাইমারী স্কুলের মাষ্টার, বুড়ো টিকটিকে চেহারা। মাথায় ইয়া ফুল বাঁধা 'ফুল সাইজের' টিকি। আগে থেকেই খোঁজ খবর নেওয়া হয়ে গেছে—মাংস কতটা পরিমাণ দেওয়া হবে, মিষ্টি কত রকম তৈরী করা হয়েছে। আর আসরে চলেছে তামাক সহযোগে রকমারি গল্প। তার মধ্যে কবে কোন বাড়ীতে কে কত গণ্ডা পানতোয়া খেয়েছিল —কোন বিয়ে বাড়ীতে কে দু খোরা দই চুমুক মেরে সাবড়ে দিয়েছিল এই সব গল্প। ছেলেরা এককোণে দল পাকিয়ে গোলমাল করছে। আমরা হচ্ছি বড় ইস্কুলের ছাত্র, তাই মনসা ভট্চাযের জাতশত্রু। তার ইস্কুলে অঙ্ক—মানসাঙ্ক যা করানো হয়—তা নাকি আর কোথাও হয় না। বড় ইস্কুলের মাষ্টাররা তো নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়, এটাই প্রতিপন্ন করবার জন্য সে ফাঁক খুঁজে বেড়ায়।

হঠাৎ ডেকে ওঠেন—"ওরে মদনা, বল দিকি এক কাহণ খড়ের দাম সতের টাকা পাঁচ আনা হলে—পাঁচ পণ পনের গণ্ডা খড়ের দাম কতো?"

ছেলের দল একটু ভড়কে গেছে। সন্তু গজরায়—"ইকি, খড় চিবতে এসেছি?"

"তুমি! ওহে ও লালজামা—বলো?"

মনসা ভট্চায যেন তার পাঠশালা পেয়েছে। সমবেত ভদ্রলোকদের—প্রবীণদের গল্প থেমে যায়, একজনকে কাদায় পড়তে দেখে ওরা বেশ তারিফ করে সেই বেচারার কাদায় লুটোপুটি খাওয়া দেখছে। মনসা ভট্চায বীরদর্পে চারদিক চাইছে যেন বড় ইস্কুলকে হারিয়েই দিয়েছে। সবাই নীরব, আমাদের দলবলও। হঠাৎ মনসার পাঠশালার শিরপড়ো বাঁটুলা চেঁচিয়ে ওঠে—

—"পোণ্শাই বলবো ?"

বাঁটলা জবাবটা দিতেই মনসা ভটচায চারিদিকে চাইতে থাকেন। পুনরায় সুরু হয় "ওহে তুমি তো ক্লাস সেভেনের ফার্ষ্টবয়—বলোতো বাইশ টাকা তের আনা মণ দরে এগারো সের সাত ছটাকের দাম কতো ?"

বিমল আমার পাশেই—প্রশ্নটা তার উদ্দেশ্যে—আর আমি ক্লাশ এইটের ফার্ষ্ট বয়, কি জানি এর পর আমার উদ্দেশ্যে মনসার তূণ থেকে কি পাশুপত অস্ত্র বেরুবে, ওদিকে সন্তর জেঠামশায় রক্তপলাশলোচনে সন্তর দিকে চেয়ে রয়েছেন অর্থাৎ সন্তর যদি পরাজয় ঘটে—তিনি অকুস্থলেই সন্তর পিঠে ঝাড়বেন বিরাশীসিক্কার একটি কিল।

কি ভেবে সন্ত স্যাঁৎকরে পাশেই মোটা থামটার আড়ালে সরে গিয়ে আমাকে ইসারা করে,— "কেটে পড়, নইলে অনর্থ বাঁধাবে।"

একদিকে রাশি রাশি সুখাদ্য—মাংস, রসগোল্লা, দরবেশ, দই, সন্দেশ, অন্যদিকে এই গ্রামশুদ্ধ লোকের সামনে এই নিদারুণ অপমান, বাবার কাণেও উঠবে। তারপর ? কি জানি ধান খড়ের হিসাব না জানার জন্য পিঠে দু চারটা কিল চড় যে না পড়বে তাই বা কোন্ ভগবান জানে ? অতএব আমিও টুক্ করে বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে চুপে চুপে বেরিয়ে এলাম।

অসময়ে বাড়ী ফিরলে ধরা পড়বো—নানা কৈফিয়ৎ দিতে হবে, তাই দুজনে নদীর ধারে এই পিঠুলিতলায় বসে নদীর হাওয়া খাচ্ছি—আর মনসা ভট্চাযের মুণ্ডপাত করছি। প্রায়ই মাঝে মাঝে মনসা এমনি করে অপদস্থ করবার চেষ্টা করে পঞ্চগ্রামী ভদ্রসমাজের মধ্যে, ওর জন্যে কোথায় কি শান্তিতে নেমতন্ন খেতে যাবারও উপায় আছে! একেবারে হাড়ির হাল করে ছাড়বে। আবার কালীপুজোর বিখ্যাত ভোজ আসছে রায়জী বাড়ীতে—সেখান থেকেও এমনি শূন্য উদরে আসতে হবে, না হয় অপমানের কালিতে মুখ কালো করে পাঁঠার হাড় চুষতে হবে।

সন্ত উঠে পড়ে—"চল, কিছু খেতে হবে তো।"

"কিন্তু মনসা ভট্চাযকে—"

আমার কথায় সন্ত ধমক দিয়ে ওঠে—'সে ব্যবস্থা মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে হবে, এখন ওঠ, উঃ···, এত বড় বড় রসগোল্লা মাইরী—ইয়া ছানাবড়া! স্রেফ ওইটার জন্যে—"

'দুঃখ করে লাভ কি, বরাতে নেই কি হবে।' সান্ত্বনা দিই সন্তকে।

শীতের প্রথম আমেজ পড়েছে। সন্তদের পুকুরের ধারে খেজুর গাছে সবে রস নামতে সুরু হয়েছে। সেদিন সকালেই ওদিকে যেতে দেখি সন্ত গাছে উঠে রসের ছোট হাঁড়িটা নামাচ্ছে, আমাকে দেখে ডাকলো।

রসের উপর লোভ আমারও যে ছিল না তা নয়, এগিয়েই গেলাম। হঠাৎ কোথা থেকে

ঝোপঝাড় ভেদ করে সামনে উদয় হলো মনসা ভট্চায—ঘাটে হাত মুখ ধুচ্ছে—হঠাৎ রসের হাঁড়ির দিকে নজর পড়তেই এগিয়ে এলো নেহাৎ ভালোমানুষের মত। কে দেখলে মনে করবে এই সেই লোক যে আমাদিগকে বঞ্চিত করেছিল রসগোল্লা পানতোয়ার ভোজ থেকে, আজকের ভোজেও যে বাদ সাধবে না তাই বা কে জানে!

"একটু রস দে দিকিনি বাবা। আহা পরিষ্কার রস। জিরেণ কাট না রে?"

রস অল্পই পড়েছে, সন্তুর কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক। সব রসটুকুই ঢেলে দিল মনসা ভট্চাযের ঘটিতে। ভট্চায মশায় খালিপেটে বেশ খানিকটা খেয়ে নিলেন ঢক ঢক করে। তারপর ঘটির দিকে নজর দিয়ে বলে ওঠে—"তাইতো, এইটুকু রস আর বাড়ী নিয়ে গিয়ে কি করবো, খেয়েই নিই। তা তুই বরং আর একদিন তোর কাকীমাকে খাওয়াবি, আহা রসটি বেশ মিষ্টি।"

ছাঁদা বাঁধবার বায়নাও করে ফেলে, আমরা দুজন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, মনসা ভট্চায রসটুকু খেয়ে ঠোঁটে জিব বুলোতে বুলোতে চলে গেল।

আমি চটেই উঠলাম সন্তুর উপর, ডেকে আনলো, অথচ আমার সামনেই রসটুকু দিলো মনসা ভট্চাযকে। দিব্যদৃষ্টিতে দেখলাম আজকের ভোজে ওর সাতখুন মাপ। যতই কাঠ খড়-বাঁশ ধানের হিসাব আসুক সন্তুর কেশাগ্র আর সে স্পর্শ করতে পারবে না। হয় তো উত্তরগুলো আগে থেকেই মুখস্থ করিয়ে দিয়ে ভোজের আসরে পঞ্চগ্রামী লোকের সামনে সম্ভ নিজের বিদ্যে জাহির করবে। আর আমি? কে জানে বরাতে ভোজই জুটবে কি না! মা কালীই জানেন।

তুপুরে তুর-তুর-বুকে নেমতন্ন খেতে বেরুলাম। বাবা যেতে পারবে না কি একটা কাযে, আমাকেই জোর করে পাঠালেন নেমতন্ন রক্ষা করতে। কিন্তু এখন আমাকে রক্ষা করে কে ?

পথে যতগুলো কালীঠাকুর দেখলাম সবারই পায়ে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে এসে হাজির হলাম। আমি পাঁঠার মাংস খাবো তা নয় আমিই যেন মনসা ভট্চাযের সামনে যাচ্ছি বলির পাঁঠার মত। অনেকেই এসে গেছেন, আজ আর সহজে আসরে ঢুকছিনা। দূর থেকেই অনুসন্ধান করতে থাকি মনসা ভট্চায তখনও এসে হাজির হননি। ওঃ! এই ফাঁকে ঝট্ করে পাতা হয়ে যায় আর আমি টুক্ করে গিয়ে এক কোণে বসে পড়ি! কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। দেখি সন্তু আসছে পরণে তার চকচকে জুতা, ফাইন ধুতি মটকার পাঞ্জাবী। চমকে উঠলাম! তাহলে মনসা ভট্চাযের সঙ্গে আগে থেকেই বোধ হয় গড়াপেটা হয়ে গেছে, এইবার সে আসছে কড়াকড়া মানসাঙ্কের ইট পাটকেল মাথায় বোঝা করে!

…ওদিকে পাতা হয়ে যাবার খবর আসতেই কাল বিলম্ব না করে ভিতরে সেঁদিয়ে গেলাম যেন তেরাত্তির উপোসী কাঙ্গালী কোনক্রমে একটা পাতা দখল করে বসতে পারলেই খিচুড়ী জুটবে। ওমা এতক্ষণে দেখি আমাদের, বন্ধুবান্ধব্ তু'একজন করে উদয় হলেন। বিমল, পটলা, গুরুপদ— সবাই-ই আমার মতই এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিল মনসার মানসাঙ্কের ভয়ে, একে একে দেখা দিচ্ছেন।

মা কালী নির্ঘাৎ জাগ্রত, এত প্রণাম, মাথা খোঁড়া তাই ব্যর্থ হয়নি। পরম তৃপ্তিভরে মায়ের প্রসাদ পাচ্ছি আর মা তুর্গা ? নবমীপুজার দিনে তু তুটো ব্রাহ্মণসন্তান স্রেফ নদীর ধারে জল খেয়েই সারাদিন কাটালাম,—মায়ের কোন টনকই নড়লো না। মা কালীকে মনে মনে কষে প্রণাম করলাম।

…ভোজনটা চরমই হয়েছে। আয়োজনও করেছিল ভূরি ভূরি। নবমীর না খাওয়ার তুঃখ আজ ভুলতে পারলাম। কিন্তু মনসা ভট্চায আজ অনুপস্থিত। এ হেন ঘটনা কোন কালেই ঘটেনি। সকলেই একটু বিস্মিত হন। কে যেন বলে—

—'তাহলে চাটুয্যেদের বাড়ীতেই নেমতন্নে গেছে।'

হবেও বা। নেমতন্ন ছেড়ে দেবার লোকই সে নয়, অন্য কোথাও গিয়ে পুষিযে নিয়েছে।

পরম আনন্দে রাস্তা দিয়ে ফিরছি। সন্তু-বিমল অনেকেই রয়েছে। মনসা ভট্চাযের বাড়ীর কাছে এসে পড়েছি। কি কৌতূহল বশে ওর খবর নিতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম।

মনসা ভট্চাযের শীর্ণ দেহটা বারান্দায় একটা মাতুরের উপর পড়ে আছে। চোখমুখ বসে গেছে, তখনও মাঝে মাঝে তুহাতে পেট চেপে ধরে কাতরাচ্ছে। সকাল থেকে বার দশেক পায়খানা গিয়ে বেচারা এলিয়ে পড়েছে, ওঠবার ক্ষমতাও নাই।

—"কেমন খাওয়ালো রে?" চিঁ চিঁ করছে ভটচায।

—"ওঃ তোফা। মাংস যে যত পারে, আর মিষ্টি চার রকম।"

—'চুঃ চুঃ', ভটচায শুকনো জিবটাকে ঠোঁটে বুলোয়, পরক্ষণেই একটা মোচরানো ব্যথায় পেটটা টিপে ধরে সামলাতে থাকে।

রাস্তায় বার হয়ে এলাম। কমবেশী খুশী যে হইনি তা নয়, তবু বেচারার জন্য দুঃখ হয়। সন্তু বলে ওঠে—"মনে নাই নবমী পুজোর দিন ঃ উঃ মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিলো রে? আজ সকালেই দিলাম 'লেঙ্গি' মেরে, বোঝ—দুঃখটা কেমন লাগে।"

—"সে কি রে? তুই কি করলি আবার?"

সন্তু জবাব দেয়—"করেছি কি আর আমি? ওর যা করবার করেছে ঈশান কবরেজের দুটি গুলি—'জয়পাল দি গ্রেট' খেজুর রসের সঙ্গে দিলাম মা কালীর নাম নিয়ে গুলে, থাক্ চিৎপটাং হয়ে আজকের দিনটা, আমরা নিরাপদে নেমতন্নটা খেয়ে নিই।"—

"এ্যা", চমকে উঠি সকলেই।

এরপর থেকে মনসা ভট্‌চায বিশেষ করে আমাদের আর মানসাঙ্ক কষাতে আসতো না। হয় তো কিছুটা টের পেয়েছিল জয়পাল বটিকার মহিমা।

১৩৬২

বেলোয়ারী

কবিতা সিংহ

কি আলো ঠিক্‌রোয় আমার এই কাঁচে
অবাক বেলোয়ারী রঙীন সোণামাছে,
যে রঙ্‌ নেই ভাই জানো সে রঙ্‌ আছে
ত্রিশিরা এই কাঁচে হাজারো আলো নাচে!

দুপুরে হীরে হয় রোদের আলোধারা
রূপোলী জ্বল জ্বলে গলিত যেন পারা
সে আলো থেকে হয় রঙিণ কত তারা,
ত্রিশিরা কাঁচে ভাঙে রঙের সাতধারা!

সকালে যে গোলাপী রোদের মিঠে আলো
কাঁচের শার্সিতে চিকিয়ে ঢাকে কালো
সহসা সে আলোতে সকলি লাগে ভালো
তেমনি রাঙারঙ কি করে কাঁচে জ্বালো!

রোদের অসিধারা সাঁঝের নভনীলে
কালের কত আভা জরদা পীতে মিলে,
গড়িয়ে পড়ে রঙ্‌ রাঙার নীল ঝিলে
সে রঙ জানো নভ, এ কাঁচ থেকে নিলে!

১৩৬৬

প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার ছিলেন আমার ঠাকুরদা। তাঁর প্রতাপে যাকে বলে বাঘে-বলদে জল খায়—তাই। কিন্তু এহেন জমিদারকেও নীচু হতে হয়েছিল সামান্য এক মুচির কাছে।

ব্যাপারটা অতি তুচ্ছ। গুইরাম আমাদের গাঁয়ের ছেলে—কিন্তু ছেলেবেলাতেই নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার বাপ-মাও মারা যায়। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তের শেষ দিকে ওদের ভিটেটা ছিল। ওতে ছিল একটা কুলগাছ আর ভেঙে যাওয়া চারটা দেওয়াল। আমরা সেই গাছটায় নারকোলি কুল খেতে যেতাম। রক্ষক কেউ নেই—নির্বিবাদেই খেতাম।

হঠাৎ একদিন গুইরাম ফিরে এলো গ্রামে এবং এসেই সেই ভাঙা দেয়ালগুলো মেরামত করে ঘর-ছাদ করলো। গাঁয়ের সকলকে জানালো, সে কলকাতায় ছিল—ভাল কাজ শিখেছে, জুতো গড়বে, গাঁয়েই থাকবে। আর যাবে না।

খুব আনন্দের কথা—সবাই খুশী হলো। ওর নাম এখন গুইরাম দাস। বেশ সভ্যভব্য হয়ে এসেছে। জুতো নাকি ভালই তৈরী করে সে। কাছের শহর দুবরাজপুর গিয়ে সেগুলো পাইকারি হারে বেচে আসে, রোজগার ভালই করছে। কিন্তু গুইরাম দাস নেশা করে।

এমনিতে অতিশয় বিনীত স্বভাবের লোক। হাত জোড় করে কথা বলে। বলে—হুজুরদের দয়ায় গাঁয়ে ফিরলাম—হুজুরদের দয়ায় বেঁচে থাকবো।

—বিয়ে টিয়ে কর গুইরাম।

—এজ্ঞে বিয়ে আর কৈ হলো, টিয়ে একটি পেলে পুষি।

এমনি বলে গুইরাম—সবাই হাসে। ওর বয়স এখন ত্রিশ পার হয়েছে। চলছে বেশ—চালাচ্ছে সে ভালই। চটি জুতোটাই ভাল গড়ে গুইরাম। বেশ নাম করে ফেলেছে এর মধ্যে এখানে।

পাশের পাঁচপুকুর গাঁয়ে ওদের স্বজাতির ঘরে নাকি একটি মেয়ে আছে—বয়স বছর ত্রিশ। শোনা গেল গুইরাম তাকেই আনবে টিয়া করে অর্থাৎ তাকে সে সাঙা করবে। সবই ঠিক, এখন কুড়িটি টাকা কনে-পণ যোগাড় হলেই হয়। টাকার ধান্দায় ফিরছে গুইরাম—যোগাড়ও কিছু করেছে হয়তো। কারণ দেখা গেল পাঁচপুকুরে যাতায়াত তার বেড়েছে। সাঙা ওদের শিগ্রিই হবে মনে হয়।

সেদিন ভোরবেলা ঠাকুরদা প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন, আমি সঙ্গে আছি। দেখলাম, গুইরাম আসছে পাঁচপুকুর থেকে গাঁয়ে। ঠাকুরদাকে দেখে হাত জোড় করে প্রণাম করলো।

—কি রে গুইরাম—ঠাকুরদা বললেন, তুই নাকি ভাল চটি গড়িস?

—আজ্ঞে বড় কত্তা, চেষ্টা তো করি—লোকে ভালই বলছে।

—আয়, মাপ নে দেখি—আমার একজোড়া চটি করে দে।

—যে আজ্ঞে হুজুর।

গুইরাম তৎক্ষণাৎ একটা কাশফুলের ডাঁটা দিয়ে মাপ নিল ঠাকুরদার পায়ের। তারপর আবার প্রণাম করলো।

—কবে পাওয়া যাবে? ঠাকুরদা শুধোলেন।

—আজ্ঞে পরশু।

—আচ্ছা যা।

বলে ঠাকুরদা চলতে লাগলেন। বাড়ী এলাম। নির্দিষ্ট দিনে গুইরাম চটি আনলো ঠাকুরদার পায়ের। তখনকার দিনের বার্নিশ চামড়ার চটি দেখতে সুন্দর। ঠাকুরদা দেখলেন পায়ে দিলেন—তারপর চটিপায়ে চলে গেলেন অন্দরে। গুইরাম ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। ঠাকুরদা তাকে পাই-পয়সাও দিলেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে গুইরাম চলে গেল বাড়ী। আমি তখন পড়ছিলাম—

"শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই—আর সবি গেছে ঋণে—"

পরদিন সকালেই এলো গুইরাম একটা মস্ত ঝুড়ি মাথায়। ঠাকুরদার চরণতলে নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করলো।

—কি আছে ওতে? ঠাকুরদা শুধোলেন।

—আজ্ঞে হুজুর, গাছে কুল পেকেছে—তাই কিছু আনলাম ভোগের জন্যে।

—ও-আচ্ছা—ওরে মানুকে ঝুড়িটা ভেতরে নিয়ে যা।

চাকর মানিক ঝুড়িটা ভেতরে নিয়ে গেল। গুইরাম দাঁড়িয়ে রইলো।

ঠাকুরদা দেখলেন। বললেন—আর কি বলছিস?

—আজ্ঞে হুজুর, চটির দামটা···

—দাম! ঠাকুরদা ধমক দিয়ে বললেন—দাম কিরে ব্যাটা! গাঁয়ে বাস করিস—খাজনা দিস? ট্যাক্স দিস? কিচ্ছু দিসনে তো। আবার দাম চাস?

গুইরাম মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ঠাকুরদা বললেন—যা ওটা তোর বাড়ীর খাজনা বাবদ উশুল হলো—যা ব্যাটা যা…

—হুজুর, ঐ চামড়াটা আমি ধার করে কিনেছি, পাঁচসিকে ধার।

—তা আমি কি জানি? ধার করেছিস, শোধ করবি—যা…

ঠাকুরদা চলে যাচ্ছেন—গুইরাম তার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে কাতরকণ্ঠে বললো—দোহাই হুজুর, ঐ পাঁচসিকে দিন।

—মানকে—ঠাকুরদা সজোরে ডাকলেন—এর কান ধরে বের করে দে তো।

মানিক পেয়াদা সত্যি এসে গুইরামকে একটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে বের করে দিল। চলে গেল গুইরাম—কিন্তু তার চোখের জলটা আমি দেখেছিলাম।

শীতকাল। অনেক রাত। লেপ চাপা দিয়ে ঘুমোচ্ছি। হঠাৎ চীৎকার উঠলো—আগুন! আগুন! মুচিপাড়ায় আগুন!

কী সর্বনাশ—আগুন! এখন তো সকলের ঘরে ধান চাল—নতুন খড় উঠেছে। এসময় আগুন খুবই বিপজ্জনক। ছুটে বেরিয়ে দেখি—আগুনের লেলিহান শিখায় গাঁয়ের পশ্চিম দিকটা আলোময় হয়ে উঠেছে। ঠাকুরদাও উঠেছেন। সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ঠাকুরদা হুকুম দিলেন, সকলে মিলে যেমন করে পার আগুন নিবিয়ে দিয়ে এসো।

তিনি অবশ্য তাঁর শোবার ঘর থেকেই হুকুমটা দিলেন। কিছুক্ষণ পরে সংবাদ পাওয়া গেল আগুন নেবানো হয়েছে।

—কার ঘরে আগুন লেগেছিল?—শুধোলেন ঠাকুরদা।

—গুইরামের ঘরে—ঐ একখানা ঘরই পুড়েছে।

—কি করে লাগলো?

—কি জানি হুজুর—গুইরামকে দেখতে পেলাম না। যা কিছু ছিল সবই পুড়ে গেছে। গুইরাম হয়তো পাঁচপুকুরে আছে।

—আচ্ছা আসুক, সকালে ওকে ডেকে আনবি। অসাবধান হওয়ার জন্য তার জরিমানা করা হবে।···বলে ঠাকুরদা ঘুমোলেন।

সকালে দাদুর পেয়াদা জলিল এসে খবর দিল, আগুনটা যতদূর মনে হয় গুইরাম নিজেই লাগিয়েছিল হুজুর। সে গাঁয়ে নেই। দেওয়ালে কি সব লিখে রেখে পালিয়ে গেছে।

আমি পড়তে বসবার যোগাড় করছি। ঠাকুরদা বললেন—কি লেখা আছে দেখে আয় তো!

তৎক্ষণাৎ গেলাম। গিয়ে দেখি—গুইরামের খড়ো ঘর তো গেছেই, আগুনের তাপে কুলগাছটাও আস্ত নেই। ঘরের দেওয়ালে লেখা রয়েছে, "কুলগাছে কুল পাকলো, যার ঘর তার থাকলো।" এই লেখা আছে বাইরের দেওয়ালে, ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলাম গাঁয়ের আরো কজন দেখছে কি যেন। হাসছে তারা, আমি যেতেই তাড়াতাড়ি হাসি থামিয়ে আমাকে পথ দিল। দেখলাম, চক্খড়ি দিয়ে লেখা রয়েছে—"জমিদারের অত্যাচারে গুইরাম যায় গাঁ ছেড়ে।"

সাংঘাতিক কথা তো! লাইনটা মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে ফিরে এলাম। ঠাকুরদা প্রশ্ন করলেন—কি লিখেছে রে?

—তোমাকে গাল দিয়েছে দাদু।

—গাল! কি গাল?

—লিখেছে, 'জমিদারের অত্যাচারে, গুইরাম যায় গাঁ ছেড়ে।'

—অ্যাঁ! আস্পর্ধা!

ঠাকুরদা তাঁর বাঁধানো দাঁতে ঠোঁট কামড়ালেন।

চারদিকে চারজন পেয়াদা পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুরদা—গুইরামকে খুঁজে আনবার জন্য। এক এক করে সবাই ফিরে এসে জানালো—এ তল্লাটে কোথাও গুইরামকে পাওয়া গেল না।

ঠাকুরদা নিজের মনেই বললেন—পাঁচসিকে পয়সার জন্য লোকটা ভিটে ছাড়া হয়ে গেল।

মাস কয়েক কাটলো। গুইরাম ফিরলো না। সেদিন সকালে ঠাকুরদা স্নান করে পুজো-মন্দিরে যাচ্ছেন—গলায় সাদা পৈতে, তার সঙ্গে সোনার শেকলে গাঁথা রুদ্রাক্ষমালা—বেশ দেখাচ্ছে তাঁকে। আমি পড়ছিলাম—"শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভূঁই···" ঐ পদ্যটা আমাকে সমস্ত বলতে হবে আবৃত্তি প্রতিযেগিতায়। ঠাকুরদা আমার দিকে করুণ চোখে তাকালেন, যেন বলছেন ওটা পড়িস নে। চলে গেলেন তিনি।

গুইরামের লেখাগুলো দেওয়ালের গায়েই আছে। ঠাকুরদা নাকি হুকুম দিয়েছেন ওগুলো অমনি থাকতে।

বছর পাঁচ-সাত পরে আমি কলকাতায় কলেজে পড়ি। বাবার টেলি পেলাম "বাবা খুব অসুস্থ—

বাড়ী এসো।" সেই দিনই বাড়ী গেলাম। বাড়ী গিয়ে দেখলাম ঠাকুরদার যাবার সময় হয়েছে। আমাকে কাছে ডেকে বললেন—সেই পদ্যটা শোনা তো!

—কোন্‌টা দাদু?

—সেই···বিঘে দুই···

—আমি আবৃত্তি করলাম—শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই···

শেষের লাইনটা জোরে বললাম—"তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ"।

এই লাইনটা শুনতে শুনতে ঠাকুরদা চোখ মুছলেন। আমাকে বললেন—গুইরামকে যদি কোথাও কখনো দেখতে পাস তো বলিস—দাদু তোমার কাছে মাফ চেয়েছে—বলবি তো?

—হ্যাঁ—জবাব দিলাম।

পরম শান্তিতে ঠাকুরদা চোখ বুঁজলেন।

—১৩৭৩

পঁচিশে ডিসেম্বর

॥ শান্তশীল দাশ ॥

এই দিনটিতে তুমি এসেছিলে,
তাই তো এ-দিন অনেক বড়ো;
সে-দিন এসেছে আবার ধরায়,
আমরা সবাই হয়েছি জড়ো।

দেব ও চরণে অর্ঘ্যের ডালি,
নেব অন্তরে আশীর্বাণী;
তোমার প্রেমের মন্ত্রটি নিয়ে,
অন্তর হতে ঘোচাব গ্লানি।

হিংসা ও দ্বেষে ভরা এ পৃথিবী,
মানুষ শুধুই অস্ত্র গড়ে;
ব্যথা-বেদনার আর্ত ধ্বনিতে
আকাশ-বাতাস গিয়েছে ভরে।

আলোর মন্ত্র, প্রেমের মন্ত্র
শোনাও আবার, ভুবন ভরো;
চরণে তোমার করি প্রার্থনা,
শুচি-সুন্দর ধরণী গড়ো।

১৩৭২

॥ আশা দেবী ॥

বাঘটা গম্ভীর গলায় বললে ঃ নেমে আসুন, কথা আছে।

মাচার ওপর থেকে আমি চমকে উঠলাম। আজ তিনদিন মাচা বেঁধে বসে আছি। বাঘের গন্ধও পাচ্ছি অথচ বাঘ আসছে না! যদি বা এলো—আমায় চমকে দিলো, ব্যাপারটা কি?

বাঘটার গলায় এবার আদেশের সুর, বললে ঃ নেমে আসুন বলছি—বিশেষ প্রয়োজন। ক'টা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই সাফ-সাফ।

ওর গায়ে ফুটবল-খেলোয়াড়দের মত ডোরাকাটা জারসি, মুখে নির্ভেজাল দারোয়ানী গোঁফ আর চশমাহীন চোখের খরদৃষ্টি আমায় স্তম্ভিত করে দিলো।

বললাম ঃ মিছামিছি অমন চোখ দিয়ে বকছেন কেন? কি করেছি আপনার? শুধু মাচান বেঁধে বসেছি বৈ তো নয়। তারপর—, ভালমানুষের মতো গলার স্বর মোলায়েম করে বললাম ঃ বন্দুক হাতে দেখলেই কি অমন চটতে আছে, ছিঃ! তা ছাড়া অমন চোখ কটমট করবারই বা কি আছে? আপনিই তো আমার সমূহ ক্ষতি করেছেন! করেন নি?—পাল্‌টা আমিই জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মারেননি ছাগলটা?

ঃ ছাগলটাকে চার দিয়েছিলেন, ওটার হার্ট-ডিজিস্ ছিল, তাই পটল তুলেছে। আমি নিমিত্ত মাত্র।

আমি প্রতিবাদ করলাম ঃ কক্ষণো না। ওটা কোবরেজ মশায়ের ছাগল। মহামাস' তেলের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি হলপ করে বলতে পারি ওর কোন অসুখ ছিল না। আপনার গায়ের বিশ্রী গন্ধেই মারা গেছে।

: বিশ্রী গন্ধ ?—বাঘটা কেমন ভড়কে গেল গন্ধের কথা তোলাতে। অনেক বার নিজের গায়ের গন্ধ শুঁকে শুঁকে খুব ভালো করে পরখ করে বললে : এই গন্ধকে আপনি খারাপ বলছেন ? আপনি কি লোক বলুন তো ?

: আমায় তো সবাই বেশ ভালো লোক বলেই জানে, আর আপনার গায়ে যে বোটকা গন্ধ সেটা কেউই পছন্দ করে না—এই কথাতেই যদি আমার সম্পর্কে আপনার মনে সন্দেহ জেগে থাকে তা হলে আমি কি করতে পারি ?

: কি করতে পারি ?—হাঃ হাঃ—বাঘটা গোঁফ নাচিয়ে নাচিয়ে বেশ খানিকটা হেসে নিলো। তারপর আমার মুখের দিকে বেড়ালের মত আড়চোখে তাকিয়ে বললে : তবে শুনুন—আমার পিসেমশায় এই বনের বহু পুরোনো বাসিন্দা। তাঁর মৃত্যু যে কি নিদারুণ ভাবে হয়েছিল তা আর আপনাকে কি বলবো! পিসেমশাইর দাঁতে পায়োরিয়া ছিল আর জঙ্গলের মশার কামড়ে মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হতো।

পিসেমশায় বাঘ খুব ভালো ছিলেন, কিন্তু ফটো তোলবার ভারি শখ ছিল। তোমাদের হাতে লাঞ্ছনার কথা আমি তাঁর মুখেই শুনেছি।—বাঘ এবার অন্তরঙ্গ হয়ে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নামলো।

: বলো না শুনি—এবার আমি মাচার ওপর একটু নড়ে চড়ে বসলাম আর খাতির করে জিজ্ঞেস করলাম বাঘকে।

বাঘটা একবার থাবাটা চেটে নিলে, তারপর তাকিয়ায় ঠেস দেবার ভঙ্গিতে গাছের গুঁড়িতে বসে বলতে আরম্ভ করলে : পিসেমশায়ের মুখে শুনেছি চিমটি সাহেব খুব ভালো শিকারী ছিল। কিন্তু লোকটা ছিল ভারি নোংরা। সব সময় নস্যি নিত আর নস্যি নিত। আমার পিসিমা খুব শৌখিন ধরনের মহিলা —মানে বাঘিনী ছিলেন—তিনি আবার নোংরা কিছু দেখলেই বমি করে ফেলতেন। একবার ওঁর বাসার কাছে দুটো বিচ্ছিরি ময়লা বনবেড়ালের ছানা খেলা করছিল। তাই দেখে পিসিমার এমন ঘেন্না পেলো যে তিনি বমি করতে করতে একেবারে কলেরার মত হয়ে তিনমাস শয্যাশায়ী। তারপর কত চিকিৎসার পর তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। সেই থেকে পিসেমশায় পিসিমাকে খুবই সাবধানে রাখতেন।

চিমটি সাহেবের ক্যাম্প পড়েছে নদীর ধারে—সেখানে বড় বড় ঘাস,—ভারি মনোরম স্থান সেটি। এবার চিমটি সাহেব কিছু ফটোও তুলবেন স্থির করে এই স্থানটি বেছে নিলেন।

একদিন বিকেলের পড়ন্ত রোদে চিমটি সাহেব ক্যামেরার তিন পায়ের ফাঁকে যখন কালো কাপড়ের তলায় বৌ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবং মাঝে মাঝে নাচের ভঙ্গিতে এধার ওধার ঘুরছেন, হঠাৎ চমকে দেখলেন আমার পিসিমা আর পিসেমশায় বেশ হাসিহাসি মুখে একেবারে ক্যামেরার সামনে। কী বলবো মশায় সাহেবের ব্যবহার! লোকটা আমাদের সঙ্গে বহু দুর্ব্যবহার করেছে, তবু যদি একটা ছবি তুলে দিতো তা হলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু সে সবের ধার দিয়েও না গিয়ে চিমটি সাহেব একটা ভীষণ চীৎকার করে একেবারে চিৎপটাং।

পিসিমার ছিল মৃগীর ব্যামো। তিনি আর কোন কথা না বলে গোঁ-গোঁ করে একেবারে মূর্ছা।

গেলেন। আর পিসেমশায় দেখলেন চিমটি সাহেবের পকেট থেকে একটা ইয়া-বড় কৌটো গড়িয়ে পড়ে খুলে গেল। বলবো কি মশায়, পিসেমশায়ের সাদা প্রাণে কাদা নেই, তিনি যেই শুঁকেছেন কি হাঁচতে হাঁচতে একেবারে সংজ্ঞাহীন—যাকে আপনাদের বাংলায় বলে সেন্সলেস্।

: কেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

: কেন? আরে আপনি কি শুধু মাচায়ই বসে থাকতে পারেন, মগজে এক ছটাকও ঘিলু নেই? কৌটোতে ছিল নস্যি। পিসে ভেবেছেন ওটা হয়তো বা ভাল কোন জিনিস হবে, কিন্তু যেই শুঁকেছেন অমনি একেবারে অজ্ঞান।

: তারপর?—বলে আমি একটু নড়ে বসলাম।

: তারপর আর কি—পিসে, পিসি আর সায়েব তিনজন পাশাপাশি শুয়ে রইলেন। ভোরের আলো ফুটছে—ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে, পিসিমা উঠতে চেষ্টা করছেন। চিমটি সাহেব একবার যেন চাইলেন, তারপর পকেট থেকে রুমাল বের করে যেই মুখ মোছা আর সঙ্গে সঙ্গে পিসিমার বমি—

: কেন—কেন?

: এটাও বুঝলে না—রুমাল ভর্তি নস্যি। পিসিমা বমি করতে করতে ঘরে ফিরলেন আর বিছানা নিলেন, সেই হলো তাঁর শেষ শোয়া। আর চিমটি সাহেব এমন জেদী লোক যে আমার পিসেমশায়কে ধরে চিড়িয়াখানায় দিলে। তবে দেবার আগে দুজনে মিলে একটা ফটো তুলেছিল। আমি পরে শুনেছি তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল বলে বাকী জীবনটা তিনি চিড়িয়াখানায় সুখেই কাটিয়েছেন।

: দূর্ এসব বাজে গল্প—সব বানানো—এ রকম কত গল্প আমরা বইএ পড়েছি—

বলতেই বাঘটা যেন কেমন ভড়কে গেল। বললে : বই তো সব বাজে কথার বাণ্ডিল। আমাদের জীবনের কথা আমার চেয়ে কে ভালো জানে?

বলতে বলতে যেন জঙ্গলের মধ্যে কেমন সড়-সড় শব্দ হতে লাগলো। আমি চমকে গেলাম। আর বাঘটাও যেন কেমন হকচকিয়ে গেলো।

আমি মাচার ওপর বসে বসে ভাবছি কি করি। একটা গুলি ছুঁড়বো কি না। কিন্তু বাঘটাও যেন একটু ভয় পেয়েছে—সে খুব গভীর ভাবে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করতে লাগলো কে ওখানে।

হঠাৎ একটা প্রবল শব্দ হতেই বাঘটা যেন কোথায় অন্তর্ধান করলো আর যেন গায়ে একটা ধূষো ওভারকোট দিয়ে একটা গণ্ডার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে দৌড়ে এলো গাছটার কাছ পর্যন্ত; এসেই দৌড়ে কোন্ দিকে চলে গেল, আর সেই-না দেখে আমার সমস্ত গায়ে ঘাম ঝরতে লাগলো—আর বুকের মধ্যে এমন কাঁপুনি ধরলো যে হাত থেকে ধপ করে বন্দুকটা পড়ে গেলো।

অমনি সূর্যসিংহের মত হাঃ হাঃ করে একটা নাটকীয় অট্টহাসিতে আকাশ বিদীর্ণ করে ফিরে এলো সেই আলাপী বাঘটা। এবার সে যেন আলেকজাণ্ডার। কিন্তু আমিও পুরুরাজের শক্তি সঞ্চয় করে বললাম : ব্যাপার কি?

: আহা ন্যাকা—যেন কিছুই বোঝো না। না বোঝো বুঝবে এক্ষুণি। আমার কাকা দক্ষিণ রায়ের ভায়রাভাই, তাকে ডাকতে পাঠিয়েছি। এবার যত দিনের যত রাগ সব শোধ তুলবো।

: এর মানে? এতক্ষণ তো বেশ গল্প করছিলে, এর মধ্যে আবার হলো কি? তোমাদের বংশে কি কোন পাগল আছে? তোমরা যেমন হঠাৎ হঠাৎ চটে যাও—

: মানে বংশ তুলে কথা?—বাঘটার গোঁফগুলো খাড়া খাড়া হয়ে গেল।

: আরে না—না।—আমি হেসে বললাম: মানে আমাদের বাড়ীতেও অমনি আধপাগলা লোক আছে কি না তাই।

এবার গলার স্বর একটু মোলায়েম করতে হলো, কি জানি যদি দেয়ই ছুঁড়ে বন্দুকটা দুম্ করে। তখন তো আর কিছু করা যাবে না মরা ছাড়া। আর বাঘটা কেমন অশিক্ষিত বিদকুটে, তাতে যে কি করবে তা বোঝা ভার। প্রথম থেকেই তো উকিলের মতো জেরা করতে আরম্ভ করছে, তাতে ওর মনের কথা বোঝা ভার। তার ওপর ওর কাকা বড় ঘরের ছেলে—জানি না তার মেজাজ আবার কেমন হবে। কিন্তু আজ যে অদৃষ্টে ভারি বিপদ ঘনিয়ে আসছে, এটা বেশ বুঝলাম।

এর মধ্যে কাকা এলেন। তাঁর যেমন ভোজপুরী গোঁফ তেমনি চেহারা। কাকাকে সে একটা ইঁট পেতে বসতে দিলে। হাতের বন্দুকটার দিকে লক্ষ্য করে কাকা বললে: ওটা কি?

: বন্দুক—

: কার?—চোখ পিট-পিট করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। ওর একটা থাবা তুলে বাঘটা ইঙ্গিতে আমায় দেখিয়ে বললে: ওর।

: অ—কাকার সংক্ষিপ্ত জবাব এলো।

কিন্তু কাকা এদের মতো অসভ্য নয়, সভ্য এবং ভদ্র, মান-সম্মান-বোধ আছে। আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন: নেমে আসুন।

এবার আমাকে নামতেই হলো। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে, কাঁদতে কাঁদতে।

: মহাশয়ের নিবাস কোথায়?

: বাঘমারী—

হঠাৎ কাকা যেন কেমন চমকে গেল এবং চারদিকে তাকাতে লাগলো। তারপর গালে হাত রেখে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগলো।

তারপর বললে: বসুন।

আমার আর উপায় কি? কাঠ হয়ে রইলাম এবং ভাবতে লাগলাম—এই ফাঁকে পালাব কি না। কিন্তু পা দুটো এমন অসাড় হয়ে গেছে যে সেটা আর চলতে চাইল না। আর চেষ্টা করতে করতেও ওরা এসে পড়লো। সেই মরা ছাগলটাকে দু'জনে টেনে টেনে এনে বললে: খাও—সারারাত তো এমনিই গেছে! আমাদের বুনিয়াদী বংশ, তুমি অতিথি। কিছু না খাইয়ে তো ছাড়বো না।

ও বাঘটাও যেন কাকার সঙ্গে কি কথা বলে কেমন কাঁচুমাচু হয়ে গেছে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম : স্যার, আমরা বৈষ্ণব ; মাংস খাওয়া গুরুর নিষেধ।

কাকা অনেকক্ষণ জজসাহেবের মত দুলে দুলে ভাবলে। তারপর আমার কানে কানে বললে : বাঘমারীর চরে আমায় তোমরা জালে আটকে যে মেরেছিলে ডাণ্ডা দিয়ে, সে কথা কিন্তু কখনও প্রকাশ করো না! তা হলেই আমার সর্বনাশ! অনেক কষ্টে সেবার পালিয়েছিলাম, গাঁয়ের বাঘেরা জানলে আর প্রেষ্টিজ থাকবে না। তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি· যদি শর্ত করো সে কথা কোনো বাঘকে কখনো গল্প করেও বলবে না।

আমি এবার আস্তে আস্তে গরম হলাম; বললাম : কাকা, আপনি কি আমার পর—সে কথা কি প্রকাশ করতে পারি?···মনে মনে বললাম, বাঘের সঙ্গে গল্প করার মধ্যে আমি নেই—কখন গল্পের ফাঁকে আমাকে মাল্‌পোর মতো চেখে বসে —কে জানে!

সত্যি কথা বলতে কি তারপর থেকে আমি আর চিড়িয়াখানাতেও যাই না। পাছে বাঘের মুখ দেখতে হয়—কারণ ওদের ওপর আমার ভীষণ অচ্ছেদ্দা জন্মে গিয়েছে ওদের ব্যবহারে। কিন্তু তাই বা বলি কি করে? সবের মধ্যেই ভালো খারাপ আছে, সব বাঘ খারাপ বলে কাকা মোটেই খারাপ নয়—এ কথা আমি হাজারবার স্বীকার করবো।

॥ সুশীলকুমার গুপ্ত ॥

আমি খোকন, মস্ত বড় বীর !
ছাদ থেকে কাক তাড়িয়ে দিতে পারি ছুঁড়ে তীর ।
এয়ারগানের গুলি খেয়ে
খেঁকী কুকুর পালায় ধেয়ে ;
ঢিলের ঘায়ে ভাঙতে পারি পাখির বাসা, চাক ;
ঘুষির বেগে দস্যি বেড়াল চোখ তুলে খায় পাক ।

আমার ভয়ে ছাগল ছোটে ;
করতে পারি লাঠির চোটে
গুবরে-পোকার দফা রফা, ব্যাঙের কান্না খতম ;
আমায় দেখে পায়রা হঠাৎ থামায় বকম-বকম ।

টেলিগ্রাফের তারে ফিঙে
ফোঁকে জোরে আমার শিঙে,
দিগ্বিজয়ের নিশান ওড়ে প্রজাপতির পাখায়,
আমার নামে শালিখ-চড়ুই কাঁপে গাছের শাখায় ।

বীর কেউ নেই আমা হেন,
ভেবে মরি—তবু কেন
বড়রা সব সময় করে বকাবকি, শাসন ;
আমায় নিয়ে হয় না কেন নতুন রামায়ণ !

মমোতারো

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু

এক পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট বাড়ি ওদের। ভোর হলেই রোজ বুড়ো চলে যায় জ্বালানী কাঠের খোঁজে; আর বুড়ী যায় কাছের নদীতে বাসন-পত্তর কাপড়-চোপড় ধোয়ার কাজে। বুড়ো শুধু জ্বালানী কাঠ নিয়েই ফেরে না, সঙ্গে কিছু কিছু কেনাকাটাও করে আনে। বুড়ী ফিরে এসে তার রান্না-বান্নার সব কিছু তৈরিই দেখতে পায়, ধরতে গেলে এক রকম রোজই।

তাদের ছোট্ট বাড়িটি কিন্তু বড্ড খালি খালি মনে হয় বুড়ো-বুড়ীর! তাই হু'জনেই ওরা ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দেয় প্রায় সারাদিন। বাড়িতে থাকে শুধু ওই খাওয়া-পরার সময়টুকু।

একটি শিশুর জন্যে কত প্রার্থনা করেছে ওরা! কিন্তু সব সাধ্য-সাধনাই ব্যর্থ হয়েছে ওদের। ভগবান কানে তোলেন নি ওদের আবেদন-নিবেদন।

তবে এখন আর ও নিয়ে ওরা ভাবে না,—বুড়োও না, বুড়ীও না। নিতান্ত একঘেয়েমীর মধ্যেই বাকি জীবনের দিনগুলো কেটে চলে। তারই মধ্যে একদিন ঘটে বসলো এক অভাবনীয় ঘটনা।

সেদিন সকালবেলায় যথারীতি বুড়ী গিয়েছে নদীতে বাসন মাজতে। হঠাৎ তার চোখে পড়লো নদীর জলে ভেসে চলেছে একটি পীচ্ ফল।

ফলটি বেশ বড়। বুড়ী সেদিকে তাকিয়েই থাকে। কেমন যেন একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করে সে। কিন্তু ফলটি তার দিকে আসছে না তো! ভেসে ভেসে আরো দূরে—অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। চলে যায় একেবারে মাঝ-দরিয়ায়।

হঠাৎ বুড়ীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে হু'টি কথা। ফলটিকে লক্ষ্য করে হাত তুলে বুড়ী বললে—

ও দিকের জল তেতো, এ দিকের জল মিঠা,
এদিক এসো এদিক এসো, পাবে মোয়া-পিঠা।

বুড়ী এ কথা বলে ফেলে নিজেই অবাক। কেন সে এ কথা বললে, কে তাকে এ কথা বলালে, কিছুই সে খুঁজে পেলো না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার পীচ্ ফলটি কিন্তু সাড়া দিল তার আহ্বানে। ভাসতে ভাসতে একেবারে তার সামনে এসেই হাজির হলো।

ফলটিকে হাতে তুলে নিয়ে সে যে কী আনন্দ বুড়ীর! ফলটি একেবারে পাকা তকতকে। বুড়ীর আরো বেশি আনন্দ বুড়ো কতই না বাহাবা দেবে ফলটি পেয়ে, এই ভেবে। সত্যি সত্যি হলোও তাই। কোনদিন তো বুড়ী এমনি কোন ভাল জিনিস হাতে করে ফেরে না নদী থেকে।

বুড়ীর হাত থেকে পাকা ফলটি তুলে নিয়ে একেবারে নাচতে শুরু করে দিলো বুড়ো। খুশির তোড়ে ছড়া কাটতে শুরু করলে :

তা ধিন্ তা ধিন্ ধিন্—এক দুই এই তিন !
সূয্যি হাসে ঐ আকাশে আজ ফলারের দিন !!

ছড়া কাটা শেষ করেই বুড়ো বুড়ীকে বললে ফলটাকে দু' ভাগ করে কেটে আনতে। তাই খেয়ে এ দিনটি কাটিয়ে দেবে ওরা।

কিন্তু এ কি ব্যাপার! ছুরি নিয়ে কাটতে যেতেই আপনা থেকে ফেটে গেলো পীচ্ ফলটি! শুধু ফেটেই গেলো না, ফলটি থেকে বেরিয়ে এলো টুকটুকে একটি সুন্দর শিশু। শিশুটি যেমন হাসি-খুশি

তেমনি মোটা-সোটা।

এ কি করে সম্ভব হলো তা ভেবেই পায় না বুড়ো-বুড়ী। তারা দু'জনেই হতবাক্। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে শেষ পর্যন্ত তারা ধরে নিলো ভগবান তাদের সারা জীবনের প্রার্থনা শেষ জীবনে পূর্ণ করলেন। আপনা থেকেই তাই ভগবানের উদ্দেশ্যে মাথা নুয়ে এলো তাদের।

বুড়ো-বুড়ীর সে যে কী আনন্দ শিশুটিকে পেয়ে! যারা সারাদিন কাটিয়ে দিতো বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে, তারা আর এখন মোটেই বেরোতে চায় না নেহাৎ দরকার ছাড়া। ঘর-আলো-করা ফুটফুটে বাচ্চাটিকে নিয়ে কেমন করে কখন যে দিন ফুরিয়ে যায় তাদের, বুড়ো-বুড়ী তা টেরই পায় না মোটে।

খোকনের কি নাম রাখা হবে? ভাবনায় পড়লো বুড়ো-বুড়ী। ঠিক হলো নাম রাখা হবে মমোতারো।

জাপানে পীচ্ ফলকে বলা হয় মমো, আর সে দেশের সবার বড় ছেলেকে বলা হয় তারো। এই দুয়ে মিলিয়ে তাই তাদের পাওয়া ছেলের এমনি নাম রাখলো বুড়ো-বুড়ী।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়।

মমোতারো বেড়ে ওঠে। তার এই বেড়ে ওঠা খানিকটা যেন অস্বাভাবিক রকমের। দেখতে দেখতে খুবই লম্বা চওড়া হয়ে উঠলো সে। আর তা নিয়ে গাঁয়ের সবার মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে

গেলো। শুধু তাই নয়, আরো আশ্চর্যের, পাহাড়ী হনুমান, বনমানুষ, ভালুক প্রভৃতি জন্তু-জানোয়ারগুলো হলো তার খেলার সাথী।

ঠিক ঐ সময়েই ঐ পাহাড়ী গাঁয়ে লুটতরাজ চলছিল কিছুকাল ধরে। সাগর খুব বেশি দূরে নয় ঐ গ্রাম থেকে। ঐ সাগরেরই একটি দ্বীপে থাকতো একদল দস্যু। দস্যুদলকে বলা হতো 'ওনি'। ওনিদের সর্দার ওই দ্বীপে থাকতো রাজার হালে। তার হুকুম মতই ডাকাতি রাহাজানি করে ঘুরে বেড়াতো ওনিরা। ওরা আশপাশের গ্রামে এসে মেয়েদের পর্যন্ত ধরে নিয়ে যেতো তাদের সর্দারের দাসী করবার জন্যে। চতুর্দিকের সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এদের অত্যাচারে।

মমোতারো একটু বড় হয়ে ভাবলে, এ তো ভারি অন্যায়। ওনিদের এ অত্যাচারের প্রতিকার করতেই হবে। মমোতারো শপথ নিলো। ওনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার একটি দিনও ঠিক করে ফেললো সে।

একাই যুদ্ধে যাবে মমোতারো। নির্দিষ্ট দিনে বাপ-মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। হাতে তার একখানি ঝক্‌ঝকে তরোয়াল, আর কাঁধে তার এক থলে-বোঝাই জোয়ারের পিঠে। সঙ্গী সাথী আর কাউকে নিলে না মমোতারো। কি দরকার? ওনিদের রাজ্যে গিয়ে ভয় পেলে তাদের দিয়েই উল্‌টো হাংগামা হবে। তার চেয়ে একাই ভাল।

পথ চলতে চলতে প্রকাণ্ডশরীর এক কুকুরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো মমোতারো। তার পিঠে-ভর্তি থলের দিকে কুকুরটার লক্ষ্য। জিভ লক্‌লক্ করছে, মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে বলছে:

ঘেউ ঘেউ ঘেউ আমারই নাম ফেউ,
দক্ষিণে মোর শ্বশুর-বাড়ী, বউএর সাথে ভীষণ আড়ি!
খাবার দিলে খেতে — সঙ্গী হবো যেতে।

মমোতারো দেখলে পথে এমন একজন সঙ্গী থাকা মন্দ নয়। কুকুরটিকে এক টুকরো পিঠে দিয়ে বললে—আরো অনেক পিঠে সে তাকে দেবে, যদি সে ওনিদের বিরুদ্ধে তার অভিযানে তাকে সাহায্য করে। এক কথাতেই কুকুর রাজী। তার লেজ নাড়া দেখে কে! পিঠে খেতে খেতে সে সঙ্গে চললো মমোতারোর।

কিছু দূর যেতে না যেতেই গাছের ওপর থেকে ঝুপ করে লাফ দিয়ে পড়লো এক হনুমান। পড়বি তো পড় একেবারে পিঠের থলের ওপর। মমোতারো তাকে ধমক দিতেই হনুমান কিচি-মিচি কাঁই-কুঁই করতে করতে বললে:

থলে খুলে পিঠে দাও, তা নইলে ছাড়বো না;
লড়তে চাও লড়তে পার, পিঠে পেলে মারবো না!

মমোতারো দেখলে ওনিদের সঙ্গে যুদ্ধে এই হনুমানটি সঙ্গে থাকলে খুব সুবিধে হবে। অনেক ভেবে. তাই তাকেও দিলে একটুকরো পিঠে। লোভ দেখালে, বললে—আরো পিঠে দেবো আমার সঙ্গী হলে। যেই বলা অমনি হনুমান বললে—বেশ আমিও সঙ্গে যাবো তাতে আর এমন কি!

দুই সঙ্গী নিয়ে চলতে চলতে মমোতারো যেই সাগরপাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আর অমনি একটা হাঙরমুখো পাখি কোথেকে এসে রাম-ঠোক্কর মারলো কাঁধের থলেতে। আর একটু হলেই থলে নিয়ে পগার পার হয়েছিল আর কি! মমোতারো তড়াক্ করে তার একখানা ঠ্যাঙ ধরে ফেললে। পাখিটা চীৎকার করে বলে উঠলো :

ছাড়ো, নইলে ঠোক্কর মেরে
উপড়ে নেবো চোখ,
খাবার জিনিস একাই খাবে,
কেমন তুমি লোক?
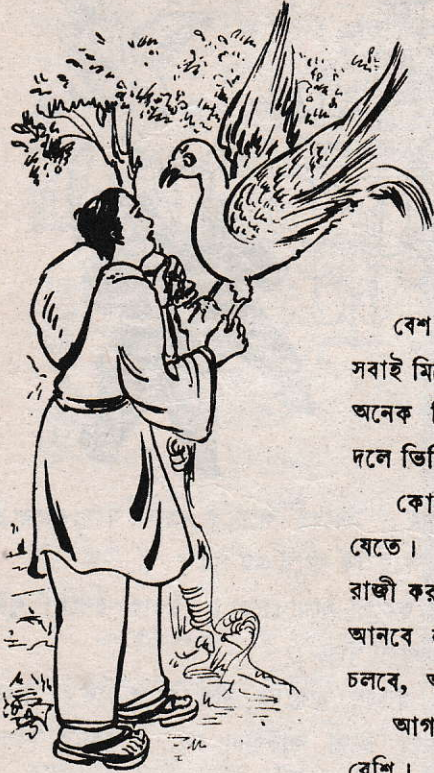
বেশ তো, তুমিও চলো তা'হলে আমাদের সঙ্গে! আমরা সবাই মিলে ওনি দস্যুদের যদি হারিয়ে দিতে পারি, তা'হলে আরো অনেক পিঠে খেতে পাবে।—মমোতারো এই বলে পাখিটাকেও দলে ভিড়িয়ে নিলে।

কোন মাঝি-মাল্লাই সাহস করে না ওনিদের দ্বীপের দিকে যেতে। অনেক কষ্টে একজন মাঝিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোনমতে রাজী করালো ওই দ্বীপে নিয়ে যেতে। নিয়ে যাবে কিন্তু ফিরিয়ে আনবে না! মমোতারো কথা দিলো দ্বীপে পৌঁছে দিলেই চলবে, আবার নিয়ে আসতে হবে না।

আগাম ভাড়া বুঝে নিয়ে নৌকো ছাড়লো। ভাড়াও বড্ড বেশি। তিন ডবল ভাড়া দিতে হলো মমোতারোকে। তা হোক, মমোতারো ও তার সঙ্গীদের দ্বীপে নামিয়ে দিয়েই টুক করে সরে পড়লো মাঝি, ভয়ে তার হাত কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে যে এরই মধ্যে!

বেশ দূর থেকেই চোখে পড়ে ওনি সর্দারের বিরাট প্রাসাদ। এই প্রাসাদ আক্রমণের একটা ছক তৈরী করে ফেলেছে মমোতারো তার মনে মনে।

অপূর্ব মমোতারোর সেই ছক। সেই ছক অনুযায়ী তার সঙ্গী বিরাট পাখিটা উড়ে বেড়াতে থাকে প্রাসাদ-দুর্গের চারদিকে। আর উড়তে উড়তে ওনি দস্যুদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে সে কি

গালাগাল! সেই গালাগাল শুনে দুর্গ-দুয়ারের দারোয়ানরা গেলো ক্ষেপে! পাখিটা মাঝে মাঝে উড়তে উড়তে নেমে আসছিল নীচের দিকে। সেই সময় তাকে ধরার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনলো দারোয়ানরা। আগে থেকেই দেয়ালের ওপর চুপটি করে বসেছিল হনুমান। দারোয়ানরা পাখিটিকে ধরতে দূরে সরে যেতেই ঝুপ করে সে লাফিয়ে পড়লো দুর্গের ভেতর এবং সঙ্গে সঙ্গে খিল খুলে দিলো দুর্গের বন্ধ দরজার।

এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলো মমোতারো। দরজা খোলা হতেই সে তার প্রকাণ্ড তরবারি ঘোরাতে ঘোরাতে ঢুকে পড়লো সেই দুর্গের মধ্যে। তার পিছনে পিছনে ঢুকলো ভয়ঙ্কর সেই কুকুর। মমোতারোর এই আকস্মিক আক্রমণে ওনি দুস্যুরা একেবারে হতচকিত। হনুমানের লম্ফঝম্পে ও নখের আঁচড়ে, পাখির বিকট চীৎকারে এবং ঠোঁটের ঠোক্করে, আর কুকুরের মাংস-তুলে-আনা কামড়ে ওনি দস্যুরা কাবু হয়ে পড়লো সহজেই। তাদের অনেকে মরলো মমোতারোর তলোয়ারের ঘায়ে। ওনিদের সর্দার আর আত্মসমর্পণ না করে কি পারে এর পর?

পরদিন তার গাঁয়ের চুরিকরা মেয়েগুলোকে উদ্ধার করলো মমোতারো। উদ্ধার করলো লুট করে নেওয়া সমস্ত সম্পত্তি। মমো সবাইকে নিয়ে ফিরে এলো গাঁয়ে।

হারানো মেয়ে, হারানো সম্পত্তি ফিরে পেয়ে গাঁয়ের মানুষের খুশি দেখে কে! আর বুড়ো-বুড়ী? তাদের ছেলের বিজয়-গৌরবে আহ্লাদে তারা আটখানা নয়, একেবারে বিশ-চব্বিশখানা!

একটি জাপানী রূপকথা অবলম্বনে।

বন্ধু

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

—১—

কুক্ষণেই জমিদারের একমাত্র ছেলে চারুপ্রকাশের সঙ্গে পরাণ বাগ্দীর ছেলে রূপলালের চোখাচোখি হয়েছিল। চারু, দারোয়ান কানু সিংএর সঙ্গে নদীর ধারে বেড়াতে এসেছিল।

এই অল্পক্ষণ হয় সূর্য্য অস্ত গেছে। নদীর বুকে ও আকাশের গায়ে তখনও অস্তমিত সূর্য্যের শেষ আলোর আবছা আভাসটুকু একটা মধুর স্বপ্নের মতই ভেসে বেড়াচ্ছে। নদীর ওপারের গাছপালাগুলি ধূসর হ'য়ে আস্‌ছে। মাঝে মাঝে দু'একটা পাখী নদীর উপর দিয়ে ডাক্‌তে ডাক্‌তে বাসায় ফির্‌ছে। সহসা একটা সুমধুর বাঁশীর সুর চারুর কানে এসে বাজ্‌ল।

চারু কানু সিংকে শুধালে—'খেয়াঘাটের দিক হ'তে বাঁশীর আওয়াজ পাচ্ছ কানু সিং?'

দারোয়ান বল্‌লে—'হাঁ বাবু, 'খেয়াঘাটের মাঝি পরাণ বাগ্দীর ছেলে রূপলাল বাঁশী বাজাচ্ছে।'

—'ভারী সুন্দর বাঁশী বাজায় ত! চল না একবার বাঁশী শুনে আসি।'

দারোয়ানের পিছু পিছু চারু এসে দেখ্‌লে—আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোয়, প্রকাণ্ড খেয়া-নৌকাটার গলুইয়ের উপর ব'সে একটি ছেলে আপন খেয়ালে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। বয়স হয়ত তারই মত হবে—বছর বার কি তের। গোলগাল চেহারা, মাথায় একরাশ ঝাঁক্‌রা ঝাঁক্‌রা চুল দু'পাশ দিয়ে ঘাড়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে; খালি গা।

ঢেউয়ের তালে তালে নৌকাটি দুল্‌ছে, রূপলালও নৌকার সাথে সাথে দুল্‌ছে। সেই

নিস্তব্ধ নদীকূলে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আঁধারে বাঁশীর মধুর সুরলহরী কেঁপে কেঁপে বাতাসের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়্‌ছে।

চারু মুগ্ধ, বিস্মিত! সহসা পরাণের ডাকে চারুর খেয়াল হ'ল। 'প্রণাম হই দাদাবাবু, এই আঁধারে দাঁড়িয়ে যে?'—পরাণ বল্‌লে।

জবাবটা কানু সিংই দিল—'মাঝি, দাদাবাবু তোমার ছেলের বাঁশী বাজান শুন্‌ছেন।'

পরাণ কানু সিংএর কথা শুনে ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল—'সে কি দাদাবাবু! এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে আপনি শুন্‌বেন? যখনই হুকুম কর্‌বেন রূপলাল রাজবাড়ীতে গিয়ে আপনাকে বাঁশী শুনিয়ে আস্‌বে।' পরক্ষণেই ছেলের নাম ধ'রে পরাণ ডাক্‌তে লাগ্‌ল—'ওরে, ও রূপি! শীগ্‌গির ছুটে আয়, রাজাবাবুর ছেলে এয়েছেন, প্রণাম কর।'

বাপের ডাকে রূপলাল বাঁশী বাজান থামিয়ে ছুটে এল; এগিয়ে এসে আভূমি নত হ'য়ে চারুকে প্রণাম কর্‌ল। চারু কিন্তু ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌ল—'ওকি—ওকি? আমায় তুমি প্রণাম কর্‌ছ কেন? আমি ত তোমার চাইতে বয়সে বড় নই রূপলাল, বরং সমানই হয়ত হ'ব! কি বল মাঝি?'

রূপলাল দেখ্‌লে—রাজার ছেলেই বটে। এ-যেন সেই বাপের বুকে শুয়ে গল্পে শোনা রূপকথার রাজার কুমার! চারু দেখ্‌তে সত্যই সুন্দর!

এর মধ্যে পরাণ এক সময় গিয়ে একটা ভাঙ্গা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে এনেছে এবং তার সাথে বস্‌বার জন্য একটা বেতের মোড়া আন্‌তেও ভুলে নি। হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় ফর্সা জামা-কাপড়ে সজ্জিত ফিট্‌ফাট্ চারুর দিকে তাকিয়ে রূপলাল একেবারে মুগ্ধ ও বিস্মিত!

'তুমি সুন্দর বাঁশী বাজাও রূপলাল?'—চারু বল্‌লে।

রূপলাল একটু মৃদু হাস্‌ল মাত্র। কি-ই বা জবাব দেবে?

'তুমি কাল আমাদের ওখানে যাবে রূপলাল? তোমার বাঁশী শুন্‌ব।'—চারু শুধালে।

রূপলাল ঘাড় হেলিয়ে জবাব দিল—'যা'ব—'

সে-রাত্রে রূপলাল স্বপ্ন দেখ্‌লে—ভিন্ দেশী এক রাজার কুমার যেন তার ছোট্ট ভাঙ্গা কুড়েঘরখানির দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে! সে যেন বল্‌ছে—'তুমি ভারী সুন্দর বাঁশী বাজাও রূপলাল!'

—২—

পরের দিন কানু সিং এল রূপলালকে ডাক্‌তে। এর আগে রূপলাল দু'একবার দূর থেকে জমিদার-বাড়ীটা দেখেছিল বটে, কিন্তু ভিতরে ঢুক্‌তে ত পায় নি! এককালে জমিদারদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল, এখন যদিও তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই; তথাপি সেই অতীত দিনের নীরব সাক্ষী হ'য়ে বৃহৎ অট্টালিকার বড় বড় থাম ও খিলানগুলি যেন সগর্ব্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে

আছে। সংস্কারের অভাবে প্রাচীরের গায়ে বড় বড় ফাটল ধরেছে, স্থানে স্থানে বট-অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছ শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। দালানে দালানে সব দামী তৈলচিত্র, বড় বড় ঝাড়-লণ্ঠন—এ যেন সে অতীত দিনের এক পাষাণ-পুরী!

রূপলাল কান্থু সিংএর পিছু পিছু কাছারী-ঘরের ছাতে এসে উঠ্‌ল।

একটা ক্যাম্বিসের চেয়ারের উপর কাৎ হ'য়ে শুয়ে চারু একমনে কি একটা বই পড়ছিল। পায়ের কাছেই একটা ছোট টেবিলের উপর রূপার ফুলদানীতে ছিল এক থোকা রজনীগন্ধা—বাতাসে ভেসে আস্‌ছিল তার মৃদু মিষ্ট গন্ধ। এমনই সময়ে কান্থু সিং এসে ডাক্‌লে—'দাদাবাবু!'

চারু বই হ'তে মুখ তুলে চাইল, তারপর রূপলালের সাথে চোখাচোখি হ'তেই হেসে ফেল্‌লে; বল্‌লে—'এই যে তুমি এসেছ!...আচ্ছা কান্থু সিং, তুমি এখন যেতে পার।'

কান্থু সিং সেলাম দিয়ে চ'লে গেল।

কাল সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে যা ছিল অস্পষ্ট, আজ পরিষ্কার দিনের আলোয় তা'কে আরও স্পষ্ট ও সুন্দর ব'লে মনে হ'ল রূপলালের। চারুর মাথাভর্ত্তি একরাশ পশমের মত নরম চুল, টানা টানা দুটি চোখ, গৌরবর্ণ গায়ের রং; গায়ে একটা ঘন সবুজ রঙের সার্ট।—রূপলালের চোখ যেন আর ফেরে না।

—'কি দেখ্‌ছ অমন ক'রে রূপলাল?'

—'সত্যি কি সুন্দর তু...আপনি!'

চারু খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসে ফেল্‌লে; বল্‌লে—'তুমি ত বেশ মজার লোক—একবার "তুমি" আবার "আপনি"! কিন্তু একি তুমি যে দাঁড়িয়েই রইলে? চল ওই কার্ণিসটার উপরে গিয়ে বসি। দেখ ভাই, এখানে আমি থাকি না। আমি কল্‌কাতার স্কুলে পড়ি—ছুটিতে আসি, আবার ছুটি ফুরুলেই চ'লে যাই। এই গাঁয়ের ছেলেরা কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমি বড়লোকের ছেলে ব'লে আমার নাকি বড় অহঙ্কার! ওরা কি কখনও আমার সঙ্গে কথা ব'লে দেখেছে যে আমার সত্যি অহঙ্কার আছে কিনা? আমার বাবাই না হয় বড়লোক, তা'তে আমার কি? তাই ব'লে ওরা আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে না? আচ্ছা তুমিই দেখ ত আমার গায়ে কোথাও "বড়লোক" ব'লে ছাপ মারা আছে কিনা।' বল্‌তে বল্‌তে সুন্দর নিটোল গৌরবর্ণ হাতখানি চারু রূপলালের দিকে এগিয়ে দিল। রূপলাল কি জবাব দেবে? বিস্ময়ে সে একেবারে হতভম্ব! সে নীরবে বড় বড় চোখ মেলে চারুর মুখের দিকে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে তাকিয়ে রইল।

—'তুমি কিন্তু আজ হ'তে আমার বন্ধু হ'লে রূপলাল! কি বল?'

রূপলাল নীরবে চারুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—'কি ভাই, তুমি যে আমার কথার জবাব দিচ্ছ না?—বল...'

—'কি বল্‌ব, বলুন?'

—'ফের "বলুন" ? বন্ধুকে আবার কোন বন্ধু "আপনি" ক'রে ডাকে নাকি, হ্যাঁ ?' চারুর কণ্ঠে স্পষ্ট অভিমানের সুর। সে আবার বল্লে—'বল—"বন্ধু" !'

ধীরে ধীরে জড়িয়ে জড়িয়ে অতি সঙ্কোচে রূপলাল ডাক্‌লে—'বন্ধু !'

'বন্ধু !—বন্ধু !—ওগো আমার বাঁশী-বাজান বন্ধু'—বল্‌তে বল্‌তে চারু গভীর আগ্রহে রূপলালের একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধর্‌ল। রূপলালের চোখের কোল দুটো জলে ভিজে উঠ্‌ল।

—'এইবার তোমার বাঁশী বাজিয়ে শোনাও বন্ধু !'

রূপলাল বাঁশীতে ফুঁ দিল ; কিন্তু গত সন্ধ্যায় নির্জ্জন নদীকূলে বাঁশের বাঁশীর বুকে যে সুর-নির্ঝর জেগেছিল, আজ এই রাজপ্রাসাদের উপর ব'সে সে সুর যেন কিছুতেই রূপলালের বাঁশীতে আস্‌তে চাইলে না। চারু বল্‌লে—'না বন্ধু ! আজ কিন্তু তোমার বাঁশী তেমনি জম্‌ছে না—তার চাইতে এস গল্প করি।'

চারু গল্প বল্‌তে লাগ্‌ল। কত গল্প—তার স্কুলের কথা, তার মাষ্টার ও সেখানকার বন্ধু-বান্ধবদের কথা এবং তার বইয়ের কথা, আরও কত কি ! অনেক রাত্রে চারু রূপলালকে ছেড়ে দিল এবং যাবার সময় বল্‌লে, আবার যেন কাল বিকালে আসে—তা'রা গল্প কর্‌বে। ফের্‌বার সময় চারু কানু সিংকে রূপলালের সঙ্গে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রূপলাল কিছুতেই রাজী হ'ল না। একা একা যেতে তার একটুও ভয় করে না।

এখন রোজই রূপলাল জমিদার-বাড়ী আসে। এমনি ক'রেই জমিদারের ছেলের বন্ধু হ'য়ে উঠ্‌ল একজন সামান্য ছোটজাতের ছেলে রূপলাল ! একদিন যদি কোন কারণে দু'জনের দেখা-শোনা না হ'ত দু'জনের কেউই সে রাত্রে ঘুমাতে পার্‌ত না। পরের দিন যখন আবার দেখা হ'ত তখন একজন অন্য জনকে বল্‌ত—'বন্ধু, কাল রাত্রে ঘুমিয়ে ছিলে ?' অন্য জন শুধু মুখ টিপে হাস্‌ত।

এদের এই মেলামেশা কিন্তু জমিদার-জননী কাত্যায়নী দেবীর চক্ষে একান্ত পীড়াদায়ক হ'য়ে দেখা দিল এবং গোলমাল বাঁধ্‌ল এইখানেই। ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়ে কি-না দিন-রাত একটা অজাত-কুজাতের ছেলের সঙ্গে এমনি ভাবে মেশা-মেশি ! একদিন ত তিনি চারুকে স্পষ্টই বল্‌লেন—'হাঁরে চারু, দিন নেই রাত নেই, ঐ একটা বাগ্দীর ছেলের সঙ্গে ফ্যাঁ ফ্যাঁ ক'রে বেড়াস্ কেন ?'

চারু বিস্মিত হ'য়ে ঠাকুর-মাকে বল্‌লে—'কেন ঠাকুর-মা, তা'তে কি দোষ হয়েছে ?'

ঠাকুর-মা গালে হাত দিয়ে বল্‌লেন—'বলিস্ কি তুই চারু ! ব্রাহ্মণের ছেলে হ'য়ে বাগ্দীকে নিয়ে ছোঁওয়া-ছুঁই করিস্ ! ঘেন্না করে না তোর ?'

—'ওরা ছোটজাত, তা'তে কি হয়েছে ঠাকুর-মা ? তুমিই ত গল্প করেছ, রামায়ণে লেখা আছে—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র গুহক চণ্ডালকে বন্ধু ব'লে কোল দিয়েছিলেন ! ভগবানই যদি চণ্ডালকে বন্ধু ব'লে কোল দিতে পেরে থাকেন, তবে আমার বেলাই বা দোষ হবে কেন ?'

—'তুই আমায় অবাক্ কর্‌লি চারু! জানিস্ শাস্ত্রে আছে—বাগ্‌দীর ছায়া মাড়ালে পর্য্যন্ত নাইতে হয়?'

চারু ঠাকুর-মার কথায় খিল-খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল, বল্‌লে—'তুমি পাগল হয়েছ নিশ্চয়ই ঠাকুর-মা, নইলে মানুষের ছায়া মাড়িয়ে মানুষকে নাইতে হয়, এমন কথা বল্‌ছ কি ক'রে? আমাদের স্কুলের মাষ্টার যতীনবাবু বলেন—সব মানুষই ভগবানের সৃষ্টি; কেউ কারও চাইতে ছোট নয়। ছোট-ঘরে জন্মালেই মানুষ ছোট হয় না বা অস্পৃশ্য হয় না; অস্পৃশ্য বা ছোট হয় মানুষ তার ব্যবহারে, তার আচরণে। একজন বাগ্‌দী বা ছোটজাতের ছেলে চুরি কর্‌লে যেমন তা'কে সাজা পেতে হয়, তেমনি একজন ব্রাহ্মণের ছেলে চুরি করলেও সেই একই সাজা পেয়ে থাকে।'

ঠাকুর-মা বিরক্তির সুরে বল্‌লেন—'কি-জানি বাপু, তোদের আজ-কালকার শিক্ষা!'

কাত্যায়নী দেবী পুত্রের কাছে অর্থাৎ চারুর বাবা প্রকাশবাবুর কাছে কথাটা পাড়লেন। প্রকাশবাবু মা'র কথা শুনে গম্ভীরভাবে বল্‌লেন—'হুঁ!' মা-হারা একমাত্র পুত্র চারুকে প্রকাশবাবু সত্যি একটু বেশী মাত্রায়ই ভালবাস্‌তেন। চারু ছিল তাঁর নয়নের মণি। কিন্তু তাঁর আভিজাত্যের গর্ব্বটাও ছিল অত্যন্ত বেশী। প্রবলপ্রতাপান্বিত অর্থশালী জমিদারের ছেলের সাথে সামান্য একটা বাগ্‌দীর ছেলের এতটা মেশামেশি সত্যিই তাঁর পছন্দ হ'ল না। কিন্তু এতদিন ছেলের মুখের দিকে চেয়েই কিছু বল্‌তে মন সরে নি; আজ মা'র অভিযোগ শুনে তিনি ভাব্‌লেন—না, এর একটা বিহিত করতেই হবে। সেই দিনই তিনি দুপুরের দিকে নায়েব শম্ভুচরণকে ডেকে কড়া হুকুম দিয়ে দিলেন—'রূপলাল যেন এবাড়ীর ছায়াও আর মাড়াতে না পারে।'

সেইদিন বিকালের দিকে চারু যখন একাকী ছাতে ব'সে গভীর আগ্রহে বন্ধুর পথের পানে চেয়ে আছে, এমন সময় নীচে সদর দেউড়ীতে রূপলালকে ঢুক্‌তে দেখে, শম্ভুচরণ তীক্ষ্ণ-স্বরে বল্‌লেন—'এই ছোক্‌রা, তুই রোজ রোজ এখানে আসিস্ কি করতে? ফের এ বাড়ীতে ঢুক্‌বি ত ঠেঙ্গিয়ে পা গুঁড়ো ক'রে দেবো।'

রূপলালের গতিশীল পা দুটো মাঝপথেই সহসা থেমে গেল।

—'যা! যা! ভাগ্ এখান থেকে। আবার দাঁড়িয়ে রয়েছিস্?···দেখ, ছোড়ার কানে যেন কথা যাচ্ছে না?—'

রূপলাল একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরে গেল।

চারুর কানে যখন বন্ধুর লাঞ্ছনার কথা পৌঁছাল, ক্রোধে ক্ষোভে তার সমস্ত দেহটা ফুলে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু যখন সে নায়েবের মুখে শুন্‌ল রূপলালকে তার বাবার কথা মতই তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন বিরাট একটা অভিমানে তার সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। সে-রাত্রে বাড়ীর সমস্ত লোক সাধ্য-সাধনা ক'রেও চারুর মুখে কিছু দিতে পার্‌ল না। রূপলাল সমস্তটা রাত শুধু কেঁদে কেঁদেই কাটিয়ে দিল।

পরের দিন বিকালের দিকে রূপলাল বাঁশী হাতে ক'রে ঘর হ'তে বেরিয়ে পড়্‌ল। জমিদার-বাড়ীর ঠিক পিছনে প্রকাণ্ড আম-কাঁঠালের বাগান। সেই বাগানের মধ্যে ঢুকে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুড়িতে ঠেস্ দিয়ে ব'সে সে বাঁশীতে ফুঁ দিল। সেই বাঁশীর কান্নাভরা সুর চারুর কানে এসে বাজ্‌ল—দু' চোখের কোল তার জলে ভ'রে উঠ্‌ল। এমনি ক'রেই দিনের পর দিন রূপলাল বাগানে এসে বাঁশী বাজাত, আর জমিদার-বাড়ীর এক কোণে বন্ধু-বিরহে কাতর চারুর সমস্ত মন কান্নায় দুলে দুলে উঠ্‌ত। সমস্ত দিনটা যে চারুর কোথা দিয়ে কেমন ক'রে কেটে যেত—তা' কেউ জান্‌ত না। সে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দু' কান পেতে থাক্‌ত কখন বন্ধুর বাঁশীর সুর বাতাসে ভেসে আস্‌বে।

চারুর কেবলই মনে হ'ত, আহা সেও যদি অমনি বন্ধুর মত বাঁশী বাজাতে জান্‌ত, তবে সেও আজ এমনি ক'রেই তার প্রিয়তম বন্ধুকে জানিয়ে দিত—'হে বন্ধু আমার! ভুলি নাই। ওগো, তোমায় আমি ভুলি নাই।' কিন্তু হায়রে, সে যে নিরুপায়—একান্তই নিরুপায়।

দিবারাত্র চারুর কেবল রূপলালকে মনে পড়ে। সে ভেবে পায় না, রূপলাল বাগ্দীর ছেলে ব'লে কেন তার সঙ্গে মেশা যাবে না। তার টাকা নেই, সে গরীব। তা'তে তার দোষ কি? ভগবান তা'কে বাগ্দীর ঘরে জন্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন ব'লেই ত সে আজ বাগ্দীর ছেলে। যদি এর জন্য দোষী কেউ হয় তবে সেই ভগবান। আহা ভগবান কেন তা'কে চারুর ভাই ক'রে পাঠালেন না! তবে ত তার চারুর সঙ্গে মিশ্‌বার কোন বাধাই থাক্‌ত না।

চারুর মুখে আজকাল আর কেউ হাসি দেখ্‌তে পায় না। মুখটি ভার ক'রে সে নিজের ঘরে চুপটি ক'রে ব'সে থাকে—কোথাও বের হয় না। প্রকাশবাবু ছেলের এই বিষণ্ণ ভাব দেখে মনে মনে বেশ চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। একদিন তিনি বিকালের দিকে ছেলেকে ডেকে বল্‌লেন—'চারু, কি হয়েছে তোমার?'

বাবার মুখের দিকে চেয়ে চারু বল্‌লে—'কই কিছু ত হয় নি।'

—'তবে সব সময় অমন মুখ শুক্‌নো ক'রে থাক কেন?'

সহসা বাতাসে রূপলালের বাঁশীর স্বর ভেসে এল। চারুর দৃষ্টি প্রখর হ'য়ে উঠ্‌ল। সে ব্যস্ত হ'য়ে যেন কতকটা আপন মনেই ব'লে উঠ্‌ল—'ঐ, ঐ! রূপলাল এসেছে। আমি যাই—'

প্রকাশবাবু বিস্মিত হ'য়ে শুধালেন—'কে এসেছে? কোথায় যাবে?'

চারু বাবার কথায় যেন একটু থতমত খেয়ে গেল, একটু লজ্জিতও হ'ল। সে মুখটা নীচু ক'রে দাঁড়ালো। রূপলালের কান্নাঝরা বাঁশীর সুর তখন সমস্ত আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলেছে!

প্রকাশবাবুর মুখটা গম্ভীর হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি আর কিছু না ব'লে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। চারুর ছুটির তখন দিন কুড়ি বাকী। প্রকাশবাবু মনস্থ কর্‌লেন দু'-এক দিনের মধ্যেই ছেলেকে কল্‌কাতায় পাঠিয়ে দেবেন। দূরে গেলেই সে ছোটলোকের ছেলেটাকে ভুলে যেতে পারে।

—৩—

রূপলাল কিন্তু বন্ধুকে না দেখে থাক্‌তে পারলে না। একদিন সে চুপি চুপি জমিদার-বাড়ীর দিকে পা বাড়ালে। কিন্তু নায়েবের কুটিল দৃষ্টিকে সে ফাঁকি দিতে পার্‌লে না। সে যখন পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌ছে, তখন নায়েব দেখে ফেল্‌লে। আর যায় কোথা,—বেগে ছুটে এসে নায়েব তা'কে চেপে ধ'রে বল্‌লেন—'তবে রে ছোক্‌রা!—ফের এ বাড়ীতে পা দিয়েছিস্?'

রূপলাল আজ মরিয়া হ'য়েই এবাড়ীতে পা দিয়েছিল। সে মুহূর্ত্তে নায়েবের হাতে তীক্ষ্ণ এক কামড় বসিয়ে দিয়ে এক দৌড়ে ছুটে উপরে পালিয়ে গেল।

'ওরে বাবারে খুন কর্‌লে রে'—ব'লে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে নায়েব ছুটে গিয়ে একেবারে জমিদারের কাছে হাজির।

প্রকাশবাবু নায়েবের রক্তাক্ত হাতখানা দেখে ক্ষোভে অপমানে একেবারে আগুনের মত হ'য়ে উঠ্‌লেন। 'ফের আবার সেই হারামজাদা ছেলে এবাড়ীতে এসেছে! ছোটলোক ছোড়াটাকে আজ একেবারে খুনই কর্‌ব!'—বল্‌তে বল্‌তে তিনি একটা ছড়ি হাতে উপরে চল্‌লেন।

চারুর সঙ্গে দেখা ক'রে রূপলাল তখন চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে পালাচ্ছিল চারুরই পরামর্শে। ঠিক তখনই প্রকাশবাবু তার হাত চেপে ধর্‌লেন; তারপর কি নির্ম্মম ভাবেই অতটুকু একটা ছেলের উপর বেত্রাঘাত কর্‌তে লাগ্‌লেন!...বেতের আঘাতে জর্জ্জরিত রূপলাল চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগ্‌ল। আর বিস্মিত হতবাক্ চারু উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সমস্তই দেখ্‌লে—বেদনায় আত্মগ্লানিতে বুকটা তখন তার কান্নায় ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে।... ...

হতভাগ্য পরাণ লোকমুখে সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি জমিদার-বাড়ী এল এবং মুখে একটি কথাও না ব'লে, শুধু একটিবার মাত্র প্রকাশবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে, তার জ্ঞানহীন পুত্রকে বুকে ক'রে তুলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী ফিরে গেল।

সন্ধ্যার অল্প পরেই রূপলালের কম্প দিয়ে জ্বর এল। তার সমস্ত শরীর থর্‌-থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল এবং সে ভুল বক্‌তে সুরু কর্‌লে—'মেরো না! ওগো আর মেরো না! কত দিন—কত দিন তোমায় বাঁশী বাজিয়ে শোনাই নি বল ত বন্ধু! ভাল আছ ত ভাই?—'

বৃদ্ধ নিরুপায় হতভাগ্য পিতা, পুত্রের মাথার কাছে ব'সে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌তে লাগ্‌ল।

এদিকে পরাণ নীরবে তার জ্ঞানহীন পুত্রকে বুকে ক'রে তুলে নিয়ে যাবার পর, প্রকাশ-বাবুর মনের মাঝে কেমন যেন লজ্জা ও কুণ্ঠা দোলা দিয়ে গেল এবং ক্রমে সেই লজ্জা ও দ্বিধা অনুশোচনায় রূপান্তরিত হ'য়ে তাঁর সমস্ত মনটাই তোলপাড় ক'রে ফির্‌তে লাগ্‌ল।—পরে যখন তিনি শুন্‌লেন কিছু না খেয়ে চারু বিছানায় গিয়ে শুয়েছে, তখন একটা বিরাট ধিক্কারে তাঁর সমস্ত মনটা হু হু ক'রে উঠ্‌ল। তিনিও আর আহারে বস্‌তে পার্‌লেন না— চুপি চুপি এক সময় এসে শয্যায় শুয়ে পড়্‌লেন। পাশেই চারুর শয্যা। সে তখন ঘুমিয়ে।

গভীর রাত্রে একটা খস্-খস্ শব্দে প্রকাশবাবুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখেন, চারু পা টিপে টিপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি বিস্মিত হ'লেন, এত রাত্রে চারু একাকী কোথায় যায়!—একবার ভাবলেন, ছেলেকে ডেকে ফিরান, কিন্তু পরক্ষণেই একটা কৌতূহল সে ইচ্ছা হ'তে তাঁ'কে দমন কর্‌ল। তিনিও আস্তে আস্তে শয্যা ছেড়ে উঠ্‌লেন। চারু গুটি-গুটি পা ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌ল; তারপর সদর দেউড়ী পেরিয়ে অন্ধকারে নদীর ঘাটের রাস্তা ধ'রে চল্‌তে সুরু কর্‌লে। প্রকাশবাবুও নিঃশব্দে ছেলেকে অনুসরণ ক'রে চল্‌লেন।... ...

গভীর রাত্রি। পরাণের ঘরের এক কোণে কম্পমান ক্ষীণ দীপশিখাটি মিটি-মিটি জ্বল্‌ছে। রূপলাল তখন জ্বরের ঘোরে ভুল ব'কে চলেছে—'বন্ধু, তুমি কোথায়? বেশ্,—তুমি আস্‌ছ না! এস ভাই! আমি ত তোমায় ভুলি নি গো! উঃ বন্ধু, বড় ব্যথা লেগেছে।'—অজ্ঞান অবস্থাতেই রূপলাল ফুলে ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।

চারু চুপি চুপি এসে নিঃশব্দে রূপলালের শয্যার কাছটিতে দাঁড়ালে। তারপর সহসা রূপলালকে দু' হাতে জড়িয়ে ধ'রে অশ্রুপূর্ণ সুরে বল্‌লে—'বন্ধু! আমি এসেছি, দেখ। চেয়ে দেখ।'

হঠাৎ এত রাত্রে চারুকে দেখে পরাণ হাঁ ক'রে চারুর দিকে চেয়ে রইল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখ্‌ছে নাকি! চারুর আকুল আহ্বান শুনে জ্বরের ঘোরেই রূপলাল চোখ মেলে চাইল।

চারু চীৎকার ক'রে বল্‌লে—'আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না ভাই! আমি চারু—আমি চারু! বন্ধু!'

অস্পষ্টকণ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে রূপলাল বল্‌লে—'বন্ধু, এসেছ?'

চারু বল্‌লে—'হাঁ, এই দেখ।'

আর তখন ওদিকে দরজার গোড়ায় দণ্ডায়মান প্রকাশবাবুর দুটি চোখের কোল অশ্রুভারে টল্‌মল্ ক'রে উঠ্‌ল!—তিনি আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে রূপলালের শয্যার কাছটিতে এসে দাঁড়ালেন।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অনেকদিন আগেকার কথা বলছি। এই বাংলাদেশে তখন ইলিয়াস শাহী সুলতানরা রাজত্ব করছেন। ইলিয়াস শাহী বংশের একটা শাখা রাজত্ব করার পর ভাতুড়িয়ার (দিনাজপুর) জমিদার রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন—তাঁর বংশের কয়েকজন রাজত্ব করার পর আবার নতুন ক'রে ইলিয়াস শাহের এক পৌত্র নাসিরুদ্দীন মামুদকে এনে তখ্ত্-এ বসানো হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এই মামুদের ছেলে রুকনুদ্দীন বারবাক গৌড়ের সুলতান।

রুকনুদ্দীনের ইস্মাইল নামে এক সেনাপতি ছিলেন। তিনি শুধু যে দুর্ধর্ষ বীর এবং রণকুশলী ছিলেন তাই নয়—ধার্মিক এবং ন্যায়নিষ্ঠ বলেও তাঁর খুব সুনাম ছিল। সেজন্য সবাই তাঁকে সমীহ ক'রে চল্‌ত। প্রজা-সাধারণের কাছে খাতির ত ছিলই—স্বয়ং সুলতানও তাঁকে একটু বিশেষ খাতির করতেন। তখনকার দিনে—(শুধু তখনকার দিনে কেন, এখনও) সত্যবাদী, নির্লোভ এবং ধার্মিক রাজকর্মচারী খুব দুর্লভ ছিল। কাজেই সুলতান যে তাঁকে খাতির করবেন, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

এখন—ইস্মাইলের এই খাতির দেখে অন্য যে সব সভাসদ্ এবং রাজকর্মচারী, তাঁরা যে একটু ঈর্ষিত হবেন—এটাও স্বাভাবিক! তাঁরা সুযোগ খুঁজতে লাগলেন কী ক'রে ওঁকে জব্দ করবেন। কিন্তু সে সুযোগ আর আসে না। কলিকে যেমন নলরাজার দেহে প্রবেশ করার জন্য বহুদিন থেকে ছিদ্র খুঁজতে হয়েছিল—এঁদেরও তেমনি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হ'ল।

অবশেষে একটা সুযোগ এল।

গৌড়েশ্বরের রাজ্য-সীমানায় উত্তর-পূর্ব কোণে কাম্‌তাপুর। বর্তমান আসামের দেরাং,

কামরূপ আর বাংলার কুচবিহার—মোটামুটি এইটেই ছিল কাম্‌তাপুর রাজ্য। তার রাজা কামেশ্বর দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছেন। এখন থেকে যদি ওঁকে দমন করা না যায় ত একদিন তিনি হয়ত গৌড়ের সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াবেন। রুকন্‌উদ্দীনও এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠলেন।

কে যাবে কামেশ্বরকে দমন করতে ?

সবাই বলেন, 'কেন হুজুর, স্বয়ং সিপাহ শালার ইসমাইল ত রয়েছেন! ওঁর চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কে আছে!'

রুক্‌নউদ্দীনও তাই বুঝলেন। হুকুম হ'ল—ইস্‌মাইল যত শীঘ্র সম্ভব যাত্রা করবেন কাম্‌তাপুরকে সায়েস্তা করতে।

ইস্‌মাইল বীর ছিলেন কিন্তু কামেশ্বরও কম যান না। বিশেষত দুর্ধর্ষ নাগা সৈন্যরা তাঁর সহায়। তখন ত আর কামান বন্দুক ওঠেনি। তীর ধনুক, বর্শা বল্লম আর তলোয়ার—যা করে। আর পাহাড়ী সেনারা এসবে ওস্তাদ। বিশেষ ক'রে তীর আর বর্শা ছুঁড়তে তারা অদ্বিতীয়।

ইস্‌মাইল ধীরে ধীরে সাবধানে এগোতে লাগলেন। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠলেন না! এখন যেটাকে সন্তোষ বলে ঐখানে দু'দলে দেখা এবং লড়াই হ'ল। ইস্‌মাইল যতটা সম্ভব বিচক্ষণতার সঙ্গেই যুদ্ধ করলেন কিন্তু কামেশ্বরের কূটবুদ্ধি ও যুদ্ধপরিচালনা-পদ্ধতিই শেষ অবধি জিতল। ইস্‌মাইল হেরে গেলেন।

হেরে গেলেন ঠিকই—কিন্তু এই সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘট্‌ল।

ইস্‌মাইলের খ্যাতি কামেশ্বরও শুনেছিলেন। তাঁর ভগবৎভীরুতা, তাঁর উপবাস, উপাসনা প্রভৃতির কড়াকড়ি—তাঁর দান ধ্যান সত্যনিষ্ঠার বহু কাহিনী দীর্ঘদিন ধরে কানে এসে পৌঁচেছিল। এখন যুদ্ধ করার সময়ও লক্ষ্য করলেন তাঁর ন্যায়পরায়ণতা। একটুখানি অন্যায় যুদ্ধ করলেই ইস্‌মাইল জিতে যেতেন, কিন্তু সেটুকু অন্যায় করতেও তিনি রাজী হলেন না। নিজের পথে অবিচল রইলেন। যুদ্ধের যে কতকগুলি অলিখিত আইন আছে তা তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চল্‌তেন। এখানেও তার অন্যথা হয়নি!

কামেশ্বর দেখে শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাই জয়ী হয়েও বিজিতের মত বিনীত দীনভাবে এলেন ইস্‌মাইলের সঙ্গে দেখা করতে। দেখা ক'রে কথা কয়ে শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল তাঁর। সৌম্যমূর্তি, দীপ্ত মুখশ্রী, সংযত ভদ্র কথাবার্তা এবং ঈশ্বরবিশ্বাস—সবটা জড়িয়ে অভিভূত হয়ে গেলেন কামেশ্বর।

তিনি ইস্‌মাইলের হাত দুটো ধরে বললেন, 'আপনি যাঁর সেনাপতি তাঁর কাছে অধীনতা স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই। আমি আপনার কাছে স্বেচ্ছায় হার মান্‌ছি—আর আপনার ভগবৎপ্রেম দেখে মনে হচ্ছে আপনার ধর্মেও কিছু আছে। আপনি যদি নিজে আমাকে দীক্ষা দেন ত আমি এমন কি মুসলমান হ'তেও রাজী আছি।'

প্রীতিতে কৃতজ্ঞতায় চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠল ইস্মাইলের—তিনি উঠে দাঁড়িয়ে কামেশ্বরকে দু'হাতে জড়িয়ে বুকে চেপে ধরলেন। সেইদিন থেকে তাঁরা হলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু! ইস্মাইল কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে কাঁটাদুয়ারে তাঁবু ফেললেন।···কামেশ্বরই বলতে গেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন।

ইস্মাইলকে যাঁরা দু'চোখে দেখ্‌তে পারতেন না তাদের মধ্যে ভাঁদসী রায়ও একজন। যখন সন্তোষে লড়াই চলছে তখন ভাঁদসী রায় ছিলেন ঘোড়াঘাটের শাসনকর্তা।

তিনি গোপনে রুকনুদ্দীনের কাছে লোক পাঠালেন, তার হাতে গেল চিঠি :

"জাহাঁপনা, বড় বিপদ্। ইস্মাইলকে আপনি এতদিন অন্ধভাবে বিশ্বাস করে এসেছেন, এইবার তার ফলভোগ করুন। ইস্মাইলের সঙ্গে কামেশ্বরের সড় হয়েছে। ইস্মাইল তাই ইচ্ছে

ক'রেই হেরেছেন। নইলে পাহাড়ী কামেশ্বরের জংলী বাহিনী কখনও গৌড়ের এত বড় সুশিক্ষিত ফৌজের কাছে দাঁড়াতে পারে? এখন ত প্রকাশ্যেই দুজনের মিতালী হয়েছে। ইস্‌মাইল লোকদেখানোভাবে কামতাপুরে দখল নিতে গেছেন। আসলে উনি জংলী সেনাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন। তারপর দু' দল হঠাৎ গৌড়ে হানা দেবেন এবং আপনাকে মেরে ইস্‌মাইল গৌড়ের মসনদে বসবেন এই ওঁর ইচ্ছা। ঠিক হয়েছে কামেশ্বরকে উনি আরও খানিকটা জমি ছেড়ে দেবেন, তার বদলে কামেশ্বর ওঁর হয়ে লড়বে।"

চিঠি পেয়ে রুকন্‌উদ্দীন চোখে অন্ধকার দেখলেন। এতদিনের বিশ্বস্ত কর্মচারী তাঁর—কিন্তু সে কথা তাঁর মনেই এল না। একে ইস্‌মাইল তায় কামেশ্বর। 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর!' মৃত্যু ত প্রায় শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে!

তিনি কিছুমাত্র অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবেই ভয়ে দিশাহারা হয়ে একদল লোক পাঠালেন। নিজের বিশ্বাসী দেহরক্ষী সেনা। তাদের হাতে গেল ইস্‌মাইলের মৃত্যুদণ্ডাদেশ! বলে দিলেন—গোপনে গিয়ে ওরা কাজ সারে যেন—একবার ইস্‌মাইল গেলে সেনারা সহজেই বশে আসবে।

ওরা যখন গিয়ে পৌঁছল ইস্‌মাইল তখন বিশ্বস্ত বন্ধুদের ভেতরই রয়েছেন। গোপনে কাজ সারবার আগেই তারা ধরা পড়ে গেল—সুলতানের সই করা পরোয়ানাও বেরিয়ে পড়ল।

সবাই বললে—এমন মনিবের ওপর আর কোন কর্তব্য নেই। ওরা যা ভেবেছে তাই করা যাক।

কেউ কেউ বললে, 'অন্ততঃ এ কটাকে ত এখানেই সাবাড় করা যাক্।'

ইস্‌মাইল বললেন, 'ছি! ওরা যা ভেবেছে তাই যদি করি ত ওদের সন্দেহটাই ত ঠিক হয়ে যাবে। লোকেও জানবে যে এই মতলবই আমার বরাবর ছিল।...তাছাড়া, তিনি আমার মনিব, আমার রাজা—তিনিই মালিক। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যেতে পারি না। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।'

তিনি ডেকে পাঠালেন, তাঁরই সঙ্গে যে সরকারী জল্লাদ আছে—তাকে। তার হাতে নিজে তলোয়ার তুলে দিয়ে স্বেচ্ছায় হাসিমুখে গলা পেতে দিলেন। বল্লেন, 'সুলতানের আদেশ পালন করতে—তুমি আমি দুজনেই বাধ্য। আর দেরী করোনা। খুদা তোমাদের মঙ্গল করুন!'

এ হ'ল ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ঘটনা। যে রাজ্য হারাবার ভয়ে রুকন্‌উদ্দীন এমন অন্যায় কাজ করলেন—এর মাত্র কয়েক মাস পরেই সেই রাজ্য ছেড়ে তাঁকে পরলোকে যাত্রা করতে হ'ল। ঐ বছরেরই মাঝামাঝি তাঁর জীবনাবসান হ'ল।

কে জানে পরলোকে দেখা হওয়া সম্ভব কি না এবং এই দুজনায় দেখা হয়েছিল কি না। তা যদি হয়ে থাকে এবং পৃথিবীর লজ্জা নামক বস্তু যদি সেখানেও থাকে ত রুকন্‌উদ্দীন কি করেছিলেন—তাই ভাবছি!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিকেল গুলো হলুদরঙা ফুলের মত যেন
বাড়ি ফেরার পথের ধারে ঝলমলিয়ে ফোটে
এক-একদিন ছুটির ঘণ্টা দেরীতে বাজে কেন ?
বিকেল-ফুলের গন্ধে মন ছটফটিয়ে ওঠে।

খেলার মাঠ হাত বাড়িয়ে সবার নামে ডাকে
মেঘেরা খেলে অনেক খেলা আকাশ জোড়া মাঠে
হঠাৎ যেন আঁধার আসে পশ্চিমের বাঁকে,
নানান্ রঙ কুড়িয়ে নিয়ে সূর্য যান পাটে।

কি নিষ্ঠুর অন্ধকার, বাজপাখির মত
বিকেলটাকে এক নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে যায় ;
সন্ধে নামে গাছের ফাঁকে পাখিরা ক্রমাগত
একই সুরে সকলে মিলে ঘুমের গান গায়।

বিকেল ফুল, হলুদ ফুল, আজ ঘুমোও তুমি
এবার আমি বাড়িতে ফিরে যাবো বইএর দেশে
কোথায় আছে পাহাড় নদী সাগর মরুভূমি
আবার যেন দেখি তোমায় কাল ছুটির শেষে।

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

খুকী হবে গোলাপী পারুল,
ফুটন্ত পাপড়িতে মিঠে নতুন সকালে
ঘরে ঘরে থরে থরে ফুল।
সেদিনের খুকীর চেহারা ফুটফুটে,
বলাবলি করবে লোকেরা,
যে-বাংলা দুঃখিনী ছিল আগে
আজকাল খুশি তাকে লাগে।

সব খুকী গোলাপী পারুল,
আমরা বানিয়ে দেব খেলাঘর,
সাতনরী হার নয়, দেব পাঠাগার,
মাঠ, পার্ক, সাগরের কূল।
ঢেউয়ে ডিঙি ভাসাবে খুকীরা,
হাসাহাসি করবে লোকেরা,
মেয়েরা কি দস্যি হবে তবে ?

খুশি হবে রাঙানো পারুল,
চাঁদ থেকে ঘুরে এসে হয়ত' বলবে,
কালো ক'রে দেব পাকা চুল,
আমাকে বলবে ওরা হেসে,
গিয়েছে পুরনো যুগ ভেসে,
এসো দাদু খেলব আমরা,
তুমি হও অমর পুতুল।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন পারস্যের শাহ ছিলেন আব্বাস। তাঁর একবার ইচ্ছা হলো, একাকী ছদ্মবেশে ঘুরে দেখবেন দেশের ইতরসাধারণ কেমন ভাবে বাস করে, তারা সুখে আছে কিনা! তিনি জানতেন যে, তারাই হলো যথার্থ জাতির প্রাণ, সমাজের ভিত্তি!

সব সময় পাত্রমিত্র ও সভাসদগণের চাটুবাক্য শুনে শুনে তিনি যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই একদিন তিনি চুপি চুপি কাউকে কিছু না বলে, কেবলমাত্র একজন সভাসদকে নিয়ে সহর ছেড়ে গ্রামের দিকে রওনা হলেন। চাষী, মেষপালক ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে দিনকতক আত্মগোপন করে থাকবেন—এই তাঁর ইচ্ছা।

গাঁয়ের পর গাঁ ছেড়ে তিনি চলেন। যেখানেই যান, দেখেন, সেখানকার লোকেরা মোটা ভাত খায়, মোটা কাপড় পরে, কিন্তু তবু এদের মনে কোন দুঃখ নেই! তাদের দলে ভিড়ে, তাদের

সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব করে আব্বাস মনে বড় শান্তিলাভ করলেন। এরা এত দরিদ্র, দিন আনে দিন খায়, তবু এদের মনে কত আনন্দ! এরা কিসে এত সুখী?—এই কথাই বার বার চিন্তা করতে থাকেন তিনি।

একদিন একটা নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছেন, দেখেন একটা ছোকরা তন্ময় হয়ে বাঁশী বাজাচ্ছে একটা গাছের তলায়, আর তার পাশেই শ্যামল বনভূমিতে একদল ভেড়া চরছে।

ছেলেটিকে দেখে আব্বাসের ভারী ভাল লাগল। তার কাছে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলেন তিনি। যা জিজ্ঞেস করেন, তার এমন সরল ও স্পষ্ট উত্তর দেয় ছেলেটি যে, তাঁর মনে হলো, যে কোন রাজার ছেলের চেয়ে এর মনের সম্পদ অনেক বেশী, অনেক বেশী ভদ্র ও উন্নত এ। কি জানি আব্বাসের কেন মনে হলো, একে যদি ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় ত একদিন মহৎলোক বলে এর খ্যাতি রটবে। ছেলেটির নাম এলিবিয়া।

তিনি এলিবিয়ার বাপ-মায়ের কাছ থেকে তাকে নিয়ে এলেন ভাল চাকরির লোভ দেখিয়ে। তারা কেউ কিন্তু চিনতে পারেনি আব্বাসকে। রাজসভায় গিয়ে তখন চৈতন্য হলো ছেলেটির। পারস্যের মহামান্য শাহের সঙ্গে যে এইভাবে সে কথা বলেছে, এই মনে করে লজ্জিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল সে।

সম্রাট্ তাকে এনে ভাল করে লেখাপড়া শেখালেন। রাজসভার জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিতে প্রথম প্রথম এলিবিয়ার চোখ ঝলসে গেল। মেষপালকের ছেঁড়া কম্বল ও বাঁশীর পরিবর্ত্তে বহুমূল্য পোষাক তার অঙ্গে ঝলমল করে।

ক্রমে এলিবিয়ার সৌন্দর্য্যে ও গুণে ম্লান হয়ে যেতে থাকে অন্যান্য রাজপুরুষরা। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে সে সকলের শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে। রাজ্যের যত কিছু জটিল ও সূক্ষ্ম কাজ এলিবিয়া এমন সুকৌশলে সম্পন্ন করতে লাগল যে, সম্রাট্ খুশী হয়ে তার ওপর পারস্যের সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তুলে দিলেন। রাজ্যের যত কিছু হীরা মুক্তা মাণিক্য তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন এলিবিয়ার ওপর।

এইভাবে কেটে যায় দিনের পর দিন—বছরের পর বছর।

কিন্তু বিপদ হলো, যখন এই সদাশয় ও মহাপ্রাণ আব্বাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহ সোফি সিংহাসনে বসলেন।

অল্পবয়সে এলিবিয়ার এই দ্রুত উন্নতি দেখে রাজসভার যে জন কয়েক পুরানো কর্ম্মচারী মনে মনে তাকে ঈর্ষা করত, তারা ওর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করে শাহ সোফিকে বললে, এলিবিয়া বিশ্বাসঘাতক, আপনার পিতার চোখে ধুলো দিয়ে রাজকোষ থেকে ধনরত্ন চুরি করেছে এবং এখনো করছে।

শাহ সোফি একে তরুণ যুবক, তাতে রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা এই অল্পবয়সে হাতে পেয়ে যেন

অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ছিল না। এলিবিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ যেমন কানে শোনা অমনি শাহ এলিবিয়াকে তলব করলেন রাজসভায়।

এলিবিয়া এসে শাহকে প্রণাম করে দাঁড়াতে শাহ বললেন, তুমি আমার পিতামহের হীরামুক্তা-খচিত তরবারি থেকে হীরামুক্তা খুলে নিয়েছ বলে শুনেছি—এই মুহূর্ত্তে সেই তরবারি এনে আমাকে দেখাও—এটা সত্যি কিনা আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।

এলিবিয়া তখনি সেই তরবারিটা রাজকোষ থেকে এনে সোফির সামনে ধরলে এবং তার পিতা শাহ আব্বাস যে এক সময়ে সেই হীরামুক্তাগুলো খুলে নিয়েছিলেন তার প্রমাণ স্বরূপ যে যে লোক সাক্ষী ছিল তাদেরও এনে সেই সঙ্গে হাজির করলে। সাক্ষ্য-প্রমাণ পেয়ে শাহ সোফি বুঝলেন, এলিবিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা।

এলিবিয়ার শত্রুরা এইভাবে পরাজিত হয়ে আবার একটা মতলব আঁটলে এবং কিছু দিন পরে শাহ সোফিকে পরামর্শ দিলে—এলিবিয়ার কাছ থেকে রাজকোষের সমস্ত হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের হিসাব নিতে।

এবারও এলিবিয়ার জয় হলো। সে শাহকে ও তাঁর পাত্রমিত্র সকলকে এনে রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলে। তাঁরা সকলেই দেখে খুশী হলেন যে, কোন জিনিসেরই এতটুকু নড়চড় হয়নি। সমস্তই সে যথাস্থানে সাজিয়ে রেখেছে।

বিপক্ষ দল তখন পাশের একটা সিন্ধুক তালাবন্ধ দেখে সোফির কানে কানে বললে, ওইটার মধ্যে নিশ্চয়ই এলিবিয়া ধনরত্ন চুরি করে রেখেছে, ওটা একবার ওকে খুলতে বলুন।

সম্রাট্ চীৎকার করে এলিবিয়াকে বললেন, ওই সিন্ধুকটির দরজা খোল শিগ্ গির! ওর মধ্যে কি লুকিয়ে রেখেছ আমি দেখতে চাই!

এলিবিয়া এবার নতজানু হয়ে শাহের পা দুটি জড়িয়ে ধরলে। বহু মিনতি করে ঈশ্বরের নামে শপথ করে বললে, ওর মধ্যে রাজকোষের কোন ধনরত্ন নেই, আছে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন—অনুগ্রহ করে, কেড়ে নেবেন না! আমি এতদিন আপনার বাবার কাছে কাজ করে যা কিছু সঞ্চয় করেছি, সবই রেখেছি ওই সিন্ধুকের মধ্যে।

এই কথা শুনে শাহের মনে সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। নিশ্চয়ই অসদুপায়ে ধনরত্ন সংগ্রহ করে ওর মধ্যে সে লুকিয়ে রেখেছে। এই ভেবে তিনি তৎক্ষণাৎ সেটা ভাঙবার হুকুম দিলেন একজনকে।

এলিবিয়া যখন দেখলে তার অনুরোধ বৃথা, তখন সে নিজে গিয়ে সেই সিন্ধুকটার তালা খুলে দিলে।

সকলে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল, তার মধ্যে সযত্নে সাজানো রয়েছে সেই বাঁশীটা ও সেই ছেঁড়া ময়লা কম্বল যা পরে সে মেষ চরাত।

এলিবিয়া তখন বললে, এই দেখুন সম্রাট্, এই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—আমার অতীত সুখের শেষ সম্বল। এর কাছে তুচ্ছ আপনার রাজ-ঐশ্বর্য্য, তুচ্ছ আপনার প্রবল প্রতাপ। আপনার রাজকোষ ম্লান হয়ে যায় এর দীপ্তির কাছে। পাছে নতুন অবস্থায় পড়ে ভুলে যাই যে, আমি চাষার ছেলে তাই সযত্নে এগুলিকে সিন্ধুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

এই বলে একটু থেমে শাহের পা দুটো জড়িয়ে ধরে এলিবিয়া মিনতি করলে, ফিরিয়ে দিন্ এই সামান্য জিনিস দুটি—আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ শান্তি ও স্বাধীনতা। আমি আর কিছু চাই না এছাড়া, আর যা-কিছু আমার আছে সব নিন্, আমি কিছু বলব না।

এতদিনে শাহ সোফির চোখ খুলল। তিনি বুঝতে পারলেন, কত মহৎ ও কত সরল অন্তঃকরণ এলিবিয়ার। তাই তিনি সেই সব ষড়যন্ত্রকারীকে তখনি রাজ্য থেকে দূর করে দিলেন এবং এলিবিয়ার কাছে মাপ চাইলেন।

এত কাজের মধ্যেও এলিবিয়া প্রত্যহ এসে একবার করে তার সেই ছিন্ন কম্বল ও বাঁশীটিকে দেখে যেত, কখনো ভুলত না যে সে চাষার ছেলে!

শাহ সোফি সেইদিন থেকে এলিবিয়াকে তাঁর রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা প্রধান মন্ত্রী করে দিলেন।

১৩৬০

"ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই সর্বপ্রকার অবনতি আসিয়া থাকে।" —স্বামী বিবেকানন্দ

পাখীর বাসা

সুখলতা রাও

এই সকালে, গাছের ডালে পাতার জালে, হাওয়ার তালে
দুলছে খাসা টুনির বাসা ছানায় ঠাসা। জাগল আশা
দেখতে পেয়ে, বেড়াল-মেয়ে আসল ধেয়ে, বলল চেয়ে,—
পড়ুক ছানা, ধরব ডানা, মিলবে খানা, আছেই জানা।
কাঠ-বিড়ালী হাসছে খালি, ভাবছে খালি, সে গুড়ে বালি;
পাবি না খানা, শিখল ছানা উড়তে জানা, মেলল ডানা;
মা-টাও ওরে যায়নি স'রে, দেখছে তোরে নজর ক'রে;
এল এগিয়ে, ঠোঁট বাগিয়ে, যা-পালিয়ে মান বাঁচিয়ে।

১৩৬৬

আলোকঝারির চিতাবাঘ

শ্রীবুদ্ধদেব গুহ

আসামের এদিকটাতে আগে আসিনি। বেশ লাগছে জায়গাটা। এক পাশে আলোকঝারি পাহাড়শ্রেণী আর এক পাশে লালমাটি পাহাড়ের লাক্ষ-রক্তিম হাতছানি। আর আরো দূরে আছে পর্ব্বতজুয়ার। বাংলো থেকে আট মাইল হাঁটতে হয়, পথে সাঁওতাল সর্দ্দারের বাড়ী পড়ে। আরো এগিয়ে আমঝোরা, সবুজ শালবনে ঘেরা পাহাড়ে পাহাড়ে সাঁওতালদের গাঁ, সবজি বাগান, ছবির মতো চোখে পড়ে আসা-যাওয়ার পথে।

অনিমেষ সঙ্গে এসেছিল। শিকার করবার চেয়ে ওর শিকার দেখবার সখ বেশী। দিন কয়েক সঙ্গে থেকে ও কোলকাতায় চলে গেছে। আমায় থাকতে হয়েছে গ্রামবাসীদের অনুরোধে, আলোকঝারির চিতাটির ঝামেলা সইতে। দিনে দিনে অত্যাচারী হয়ে উঠছে চিতাটা। আজ এর ঘর থেকে ছাগল নিয়ে যায়, কাল গোয়ালে ঢুকে গরু মারে, পরশু হাট ফিরতি গাঁএর লোকদের থাবা বসায়। এমনি উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল লোকজনেরা তাদেরই অনুরোধে আমায় প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে যে, তাদের শত্রু দমনে যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

দিন দশেক আছি এখানে। লালমাটিতে তিনটে চিতল হরিণ পেয়েছি, আর বনশূয়োর গোটা পাঁচেক পর্ব্বতজুয়ারে। সাঁওতালেরা ভারী আমোদে খাওয়া-দাওয়া করেছে, অনিমেষের সঙ্গেও কিছু মাংস রওয়ানা হয়েছে কোলকাতায় প্লেনে চড়ে।

চিতাটির খোঁজ-খবর করছি। ঢোল দিয়েছি, যদি কোনো জানোয়ার মারা পড়ে চিতার হাতে, সঙ্গে সঙ্গে যেন খবর আসে আমার কাছে, পাঁচ টাকা বকশিশ মিলবে তবে। এখানকার লোক এমন দু' মাইল হাঁটাকে একটা বিষম দায় মনে করে, তাদের গরু-ছাগল মারা পড়লেও খুব কম লোকই এসে খবর দেবার কষ্টটুকু স্বীকার করতে চায়।

ধূর্ত্ত চিতাটার নাগাল মেলা ভার। তাই খবরের আশায় থাকি, সকাল বিকেল বন্দুক কাঁধে করে তিতির আর বনমুরগী মেরে বেড়াই, আর দুপুরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়ি।

সেদিন আলোকঝারির মেলা। পাহাড়ের বুকে মহামায়ার পীঠ। দলে দলে পাহাড়ী লোক আসে পূজো দিতে—অসংখ্য বলি পড়ে। অনেক ছাগল আর আরো অনেক কবুতর। নির্জ্জন পাহাড়টার বুকের মাঝে আলোড়ন ওঠে একটা, দূর থেকে শোনা যায় চেঁচামেচি, হৈ-চৈ, সাঁওতালী বেদের কবুতর ফেরি করার চীৎকার। মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। বস্তুমাতারীর দোকানে হঠাৎ ঝুমরুর সঙ্গে দেখা। ও বললে, সাহেব, এখুনি আপনার কাছে যাচ্ছিলাম। আজ শেষ রাতে মোদের গাঁয়ে পাস্তিয়ার বাড়ী গরু মেরেছে একটা সেই দুশমন চিতাটা। জিগ্‌গেস করলাম, বাঘে খাওয়া গরুটাকে পাতাটাতা চাপা দিয়ে রেখেছো তো? শকুন পড়লে কিন্তু বাঘ আর আসবে না। ও ঘাড় নাড়লে। তখন দশটা বাজে। ওকে বললাম, চল আমার সঙ্গে বাংলোতে। সেখানে বসে যা যা করা দরকার সেগুলো ভাল করে বুঝিয়ে দিলাম ওকে আর বললাম গরুটা থেকে হাত পনেরো দূরে একটা ভাল গাছ দেখে মাচা বাঁধতে। আমি তিনটের সময় যাব। নমস্কার করে ঝুমরু চলে গেল, আমি আমার আদরের ৩৭৫ ম্যানলিকারটাতে তেল দিতে বসলাম। চান-খাওয়া সেরে, ইজি-চেয়ারে গড়িয়ে নিলাম একটু, তারপর কফির পাট সেরে দুটোর সময় বেরিয়ে পড়লাম রাইফেল আর হেডলাইটটা নিয়ে।

ঝুমরুর গাঁএর নাম তিনতিরা। মাইল পাঁচেক পথ বাংলো থেকে। বৈশাখের খর রৌদ্রে রুদ্র প্রকৃতিকে ভারী নিষ্ঠুরা মনে হয়, মনে হয় তার দেহে কিংবা মনে কোথাও নেই একটু কোমলতা।

তিন্‌তিরা পৌঁছলাম যখন তখন তিনটে পাঁচ মিনিট। ঝুমরু, গাস্তিয়া ও গাঁয়ের আরো লোকজন গরুটা দেখিয়ে দিলে আমায়। পাহাড় থেকে পাঁচশ' গজ দূরে পড়ে রয়েছে গরুটা, ওর পিছনদিক থেকে কিছু মাংস খাওয়া। গাস্তিয়ার ঘর সেখান থেকে শ' দুয়েক গজ হবে। বাঘ এসে গরু ধরতে ওরা সোরগোল তোলে, তাতেই শেষ অবধি জংগলে আর নিতে পারেনি গরুটাকে। ওরা মাচা বেঁধেছে একটা শিমূল গাছে। গাছটা একেবারেই ফ্যাড়া। শুক্লপক্ষের রাত, পূর্ণিমার কাছাকাছি, সন্ধ্যে হতেই ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠবে চারদিকে। অমন জ্যোৎস্নায় ওই ফ্যাড়া গাছে বসে আর যারই হোক, চিতার দৃষ্টি এড়ানো অসম্ভব।

চারদিক ঘুরে দেখলাম। গাস্তিয়ার ঘরের পিছন দিয়ে যে পাহাড়ী নালাটি গেছে তার পাশে একটি শিশুগাছ চোখে পড়ল, নীচটা ঝোপঝাড়ে ভরা। ঠিক করলাম, এ গাছের নীচেই বসব মাটিতে, ঝোপের আড়ালে। আমার অলিভ গ্রীন রংএর পোশাক মিশে যাবে পাতার রংএর সঙ্গে, চিতার চোখ এড়ানো যেতেও পারে হয়তো। গাছটাতে বসবার সুবিধে থাকলে গাছেই বসা যেত। কিন্তু সে গাছটি বড় ঝুপসী, তাতে বসে গুলী ছোঁড়ার সুবিধে হবে না। এদিকে অসুবিধে দাঁড়াল দু'টো। গরুটি থেকে শিশুগাছটি প্রায় শ' খানেক হাত দূরে। রাতের বেলা অতদূর থেকে নির্ভুল এইম করা বেশ কঠিন হবে। তার উপর বাঘ যদি পাহাড় থেকে এ নালা দিয়েই নেমে আসে তবে একেবারে আমার ঘাড়ে এসে উঠবে। জানবার আগেই আমার অবস্থা ঐ গরুটার মতোই হবে। কিন্তু আর কোনই উপায় নেই, ঝুঁকি একটু নিতেই হবে। ওখানে বসাই ঠিক করলাম।

ততক্ষণে চারটে বেজে গেছে। আগুন রোদে কোমল লালিমা লেগেছে, সে লালিমা ছড়িয়ে পড়েছে আলোকঝারির বনে বনে আর পাহাড়ের মাথায়। ঝুমরুকে মাচাটা খুলে ফেলতে বলে, গাস্তিয়ার বাড়ী চিড়েভাজা আর চা দিয়ে বৈকালিক পর্ব্ব সমাধা করলাম

তখন বেলা যায় যায়। গাঁয়ের লোকদের সন্ধ্যের পর বাইরে বেরুতে, কথাবার্ত্তা কইতে এবং আলো জ্বালাতে মানা করে দিয়ে বসলাম গিয়ে ঝোপের মধ্যে। নিজেকে লুকিয়ে রেখেও এইম নেবার সুবিধে পাচ্ছিলাম। সামনেটা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হেড লাইট সঙ্গে এনেছি, কিন্তু দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে না। কাকজ্যোৎস্নায় চারদিক হেসে উঠেছে। চাঁদের মা বুড়ী সাদা ধব্‌ধবে চুল নিয়ে, তার চেয়েও সাদা তুলো পিঁজে চলেছে, আর সেই তুলো আলো হয়ে ঝরে পড়ছে রহস্যময়ী আলোকঝারি পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে, পথে পথে। কেমন আমেজ লাগে এই মৃদুশীতল আলোর ঝরণাতে।

রাত এগিয়ে চলেছে, চিতার চিহ্ন নেই। তখন সাতটা। 'বৌ কথা কও' আর সেই নাম-না-জানা খয়েরি রংএর পাখীটা একটানা ডেকে চলেছে, আর পিছনের নালায় ঝিঁঝিদের কলস্বর। মাঝে মাঝে ভয় করছে বাঘ যদি পিছনের নালা দিয়ে আসে তবে করবার কিছু থাকবে না। নিরুপায়

ভাবে করতে হবে আত্মসমর্পণ হিংস্র জন্তুর কাছে। হঠাৎ মনে হলো গরুটার কাছে কি একটা জানোয়ার দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে আছে। সজাগ চোখে তাকালাম—একটা শিয়াল সুযোগের অপেক্ষা করছে। নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে দিলাম ছুঁড়ে—একলাফে সরে গেল শিয়ালটা। কেটে গেল আরো আধ ঘণ্টা। চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা করে। এক এক মুহূর্ত্ত মনে হয় যেন কতদিন। এমন সময় পেছনের নালা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ পেলাম। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম শব্দটার জন্যে—আবার সেই শব্দ। শূয়োরের শব্দ। নালার শটী গাছের ঝাড়ে এসেছে লোভে লোভে। একটি নুড়ি গড়িয়ে দিলাম নালার গা দিয়ে। দ্রুত আওয়াজ তুলে শূয়োরটা ছুটে গেল পাহাড়ের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের গুরু গম্ভীর ডাকে বন-পাহাড় চমকিত হয়ে উঠল। সর্ব্বনাশ বাঘ তা'হলে নালা ধরেই এগিয়ে আসছিল, ভাগ্যে শূয়োরটা এসেছিল, নইলে—। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল। রাইফেলটাতে একবার হাত বুলিয়ে সামনে তাকালাম। ঐ তো পাহাড় থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে—যার জন্যে আমার অপেক্ষা। একটু এগিয়ে আসে, আর দাঁড়িয়ে চারদিকে চায়—সন্দিগ্ধ চোখে, ঘর্ ঘর্ ঘর্ আওয়াজ করে একটা —সে আওয়াজে বিরক্তি পরিস্ফুট। নিঃশব্দে বসে আছি সামান্যতম নড়াচড়াও না করে, আমায় ওভাবে মাটিতে দেখতে পেলে কি করে বলা যায় না। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল চিতা, ধূর্ত্ত চিতা, গায়ে চাকা চাকা দাগওয়ালা সেই ভয়ঙ্কর চিতা। গরুটার কাছে এসে চারপাশ একবার ঘুরলে, তারপর বাঘটা ঘাড়ের কাছ থেকে আরম্ভ করল খাওয়া। কিছুটা খায় আর চোখ তুলে চায়। দুর্গন্ধে বাতাস ভরে গেল। একটা চক্‌চক্ শব্দ হলো। মট্ করে হাড় ভাঙ্গার শব্দ হলো একবার। চাঁদের আলোয় রাইফেলের ফোরসাইট চিক্‌চিক্ করছে। খুব সাবধানে রাইফেল তুলে যথাসম্ভব কম শব্দ করে আনসেফ করলাম রাইফেল। অতটুকু শব্দেই চিতা খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর হঠাৎ একলাফে সরে গেল পিছনের ঝোপে। বোকার মতো বসে রইলাম কিছুক্ষণ—মিনিট দশেক হবে—আবার সেই ঘর্‌ঘরানি শব্দ, আবার এদিক ওদিক তাকিয়ে অতি সাবধানে এসে খাওয়া সুরু করলে চিতাটা—এবার পেটের কাছ থেকে। আবার রাইফেল তুললাম, নিঃশ্বাস বন্ধ করে ঘাড়ে এইম নিয়ে, নিঃশব্দে ট্রিগার চাপলাম। রাইফেলের বজ্রনির্ঘোষ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে, গাঁয়ের লোকের মনে মনে। আলোকঝারির চিতা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, আর উঠল না। একবার ডাকবারও সুযোগ পেল না সে।

তারপর নানান লোকের গলা, বাঁশ কাটার শব্দ, চাএর পেয়ালার ঠুনঠুন, অন্দরে নারীকণ্ঠের হাস্যরোল, অবশেষে দীর্ঘ শোভাযাত্রা। চিতাটি লম্বায় সাড়ে সাত ফুট ছিল। চিতা হিসাবে বিরাট। ওকে মারার পর শিশুগাছের নীচে দাঁড়িয়ে ওই জায়গাটাকে আমার আরো ভাল লেগেছিল—আরো মধুর, আরো সুন্দর, আরো বিচিত্র।

১৩৬১

উল্টো জব্দ •

নারায়ণ দেবনাথ
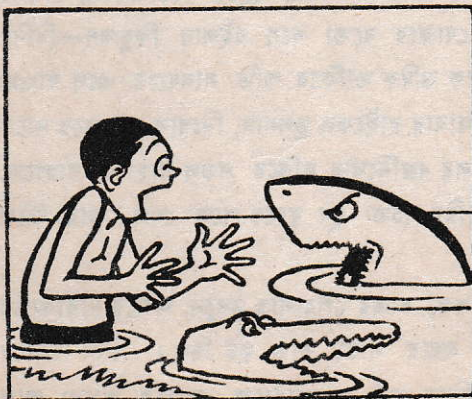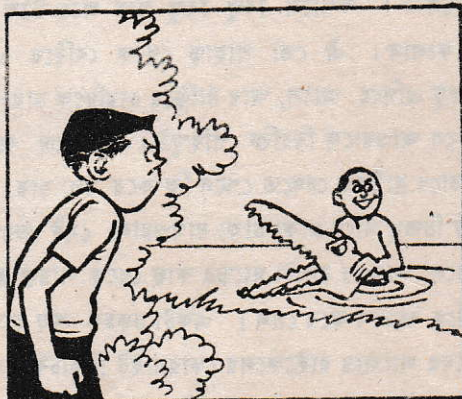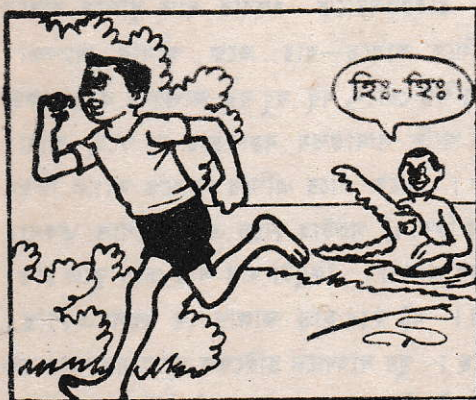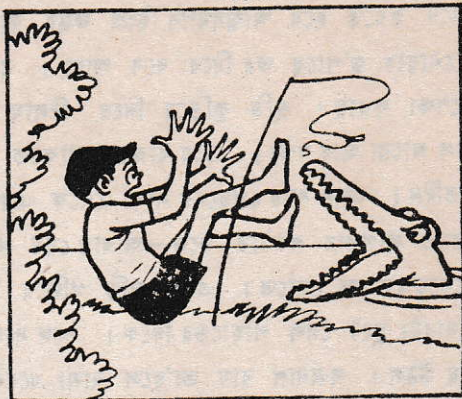
সিংহ কবলিত যাত্রী-ট্রেন

* বীরু চট্টোপাধ্যায় *

আজ তোমাদের যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছি সেটি একদিকে যেমন ভয়াবহ ও রোম-হর্ষক, অপরদিকে তেমনি নতুনত্বের জন্যও চমকপ্রদ।

সেই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে সেদিন যারা পড়েছিল, তারা বোধ করি পরবর্তী জীবনে ঐ সাংঘাতিক অভিজ্ঞতার কথা কোনদিনই বিস্মৃত হতে পারবে না। রাতের পর রাত তাদের ঐ ঘটনার দুঃস্বপ্নে চমকে চমকে বিছানায় জেগে উঠতে হবে।

এবার কাহিনী শুরু :

অকস্মাৎ একটি নারী-কণ্ঠের মর্মভেদী আর্তনাদ শুনে যারপরনাই চমকে উঠলেন মিস্টার আর্ণেসেন। এ কণ্ঠ যে তাঁর চেনা, ভীষণ চেনা। হ্যাঁ—হ্যাঁ, এ যে তাঁর নব-পরিণীতা পত্নী প্রিসিলার কণ্ঠস্বর !

ত্রস্তে পাশের ঝোপের দিকে নজর পড়ল আর তক্ষুনি ভয়ে, আতঙ্কে, বিস্ময়ে তাঁর সমস্ত রক্ত যেন জমে গেল, দেহ এল বিবশ হয়ে।

একটা বিরাট সিংহ তাঁর স্ত্রীকে পিঠে কামড়ে ধরে জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে !

— বাঁচাও! বাঁচাও!! আমাকে বাঁচাও!! প্রিসিলার অন্তিম আর্ত কণ্ঠ শোনা যেতে লাগল। পরমুহূর্তে আর্ণেসেন হাতের রাইফেল নিশানা করে কম্পিত কণ্ঠে সজোরে ট্রিগার টিপলেন।

কিন্তু হায় 'ক্লিক' করে একটা শব্দ হল মাত্র। রাইফেলে গুলি নেই। ইতিপূর্বেই তা শেষ হয়ে গেছে।

সিংহ রক্তাক্ত মেয়েটিকে নিয়ে ছুটে চলছে।

—বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে! ক্ষীণ কণ্ঠ তখনও শোনা যাচ্ছিল প্রিসিলার। উপায়ান্তর না দেখে আর্ণেসেনও ছুটে চললেন সেদিকে। কিন্তু কাঁটা-গুল্মে ভরা ঝোঁপ-ঝাড়ে বেশী দূর যেতে পারলেন না।

ওদিকে প্রিসিলার কণ্ঠস্বর সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। সব খতম।

রাত্রির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আর্ণেসেন হাউমাউ করে আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। হায় হায় সর্বনাশ হয়ে গেল।

*   *   *   *

ঘটনাটি আফ্রিকা মহাদেশের।

মোম্বাসা থেকে লেক ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত গভীর অরণ্য প্রান্তরের মধ্য দিয়ে রেল পথ চলে গেছে হাজার মাইলের ওপরে।

মিস্টার আর্ণেসেন এক বিরাট ধনীকন্যাকে বিয়ে করে বেড়াতে যাচ্ছিলেন লেক ভিক্টোরিয়ায়। হাজার মাইলের রেল ভ্রমণ। আধুনিক রেল। সপ্তাহে ঐ পথে দুবার মাত্র গাড়ি যাতায়াত করে।

যাত্রাপথ রোমাঞ্চকর, মনোরম। বেশ যাচ্ছিল এক গাড়ি রেলযাত্রী। নানা ধরণের নানা বয়সের কালো, সাদা, তামাটে সব রকমেরই লোক ছিল সে গাড়িতে।

বেশ যাচ্ছিল। প্রায় শ পাঁচেক মাইল যাবার পর ঘন জঙ্গল অধ্যুষিত জন-মানুষের বসতিহীন অঞ্চল দিয়ে যখন গাড়ি চলেছে, তখনই এক আচমকা বিপত্তি দেখা দিল।

ইঞ্জিন ড্রাইভার সহসা দেখলো সামনে রেল লাইন নেই। সে কি! রেললাইন তুলে নিল কে? এ যে দেখছি সবুজ প্রান্তর। ড্রাইভার ব্রেক টিপল। গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে আসতেই আসল ব্যাপার বোঝা গেল।

লাইনের এক দিক থেকে অপর দিকে লক্ষ কোটি সবুজ রঙের শুঁয়োপোকা ধীর গতিতে লাইন পার হচ্ছে। উক্ত পোকার নিরবচ্ছিন্ন স্রোত চলেছে প্রায় তিরিশ গজ রেল লাইনকে ঢেকে দিয়ে।

ইঞ্জিন ড্রাইভার আর গাড়ি থামালো না। তাদের ওপর দিয়েই চালাতে লাগল। তাতেই হল বিপদ। লক্ষ লক্ষ শুঁয়ো পোকা ভারী ইঞ্জিনের চাকায় পিষ্ট হয়ে চাকার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে লাগল। আর চটকানো পোকার দেহে লাইন গেল সাংঘাতিক পিচ্ছিল হয়ে। চাকা হড়কে যেতে লাগল।

ড্রাইভার গাড়ির গতি একটু বাড়াতেই আচমকা ইঞ্জিনটি লাইনের বাইরে চলে গিয়ে থেমে গেল। ব্রেক কষায় গাড়ি এত আস্তে চলছিল যে এ ঘটনাটা প্রথমটা কোন যাত্রী টের পেল না।

গাড়ি থেমে যেতে গার্ড এসে যাত্রীদলকে ঘটনাটা জানিয়ে গেল। বিপদ গণলো সবাই।

যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে লেক ভিক্টোরিয়ার একটা বড় কারখানার ক্রেন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি যাচ্ছিল একটা ওয়াগনে। সুতরাং সবাই ভাবল তারই সাহায্যে ইঞ্জিনটাকে লাইনে তোলা এমন কিছু কঠিন কাজ হবে না।

কিন্তু নিচে তখনো শুঁয়ো পোকার স্রোত চলছিল। ঘন্টাখানেক অপেক্ষার পর দেখা গেল পোকার পাল অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তখন যাত্রীদল নিচে নামলো।

যুবক যাত্রীরা লোহার জয়েষ্ট নামিয়ে ঠেকা দিয়ে ইঞ্জিন তুলতে রাজি হল। মেয়েরা নেমে কেউ হেটে চলে হাত পা ছাড়াতে লাগলো। কেউ বা সঙ্গে আনা স্টোভ জ্বালিয়ে চা, কফি, টোস্ট তৈরী করতে লেগে গেল। যেন পিকনিকের মত অবস্থা।

ঘন্টা দুই প্রচেষ্টার পর ইঞ্জিনের তলায় লোহার জয়েষ্ট দিয়ে ক্রেনের সঙ্গে বাঁধা হল। কিন্তু হায়, তখন আবিষ্কৃত হল ক্রেনে চলবার মত কোন জ্বালানি তেল নেই। অতএব যাত্রীরা মিলেই ইঞ্জিন তোলার চেষ্টা হল। তখন সূর্য ডুবে গেছে।

নেটিভ যাত্রীদের বলা হল গাড়ির চারদিকে কাঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বালাতে। রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে এল এক সময়। আলো চাই কাজের জন্য।

জোয়ান যত যাত্রী মিলে লোহার জয়েষ্টে কাঁধ লাগিয়ে প্রাণপণে হেইত্ত হেইও করে ইঞ্জিনকে লাইনে তোলবার প্রবল চেষ্টা শুরু হল।

এই সময়ই এক নিদারুণ আর্তনাদ ও হৈ চৈ-এ চমকে চেয়ে সবাই সভয়ে দেখলো একটি অল্প বয়স্ক বালককে অগ্নি-ঘেরা ট্রেনের অঞ্চল থেকে একটা সিংহ মুখে করে নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। ছেলেটা পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে!

ঘটনাটা এত আচমকা ঘটে গেল যে উপস্থিত কেউ আর বন্দুক নিয়ে আসবার সময় পেল না। সঙ্গে যদিও অনেক শিকারী ব্যক্তিই ছিল, তবু—একটা প্রাণ শেষ হল। সিংহ বনের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এক সময় ছেলেটির কাতর মর্মান্তিক আর্তনাদও সহসা থেমে গেল।

এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার পর তথাকথিত সুসভ্য মানুষ যাত্রীদলের মধ্যে যেন পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে ট্রেনের মধ্যে ঢোকবার অমানুষিক প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেল। আতঙ্কিত ভীতত্রস্ত মানুষ রেলের কামরায় ঢুকতে গিয়ে অনেক জখমও হল।

নিহত ছেলেটির মায়ের কান্নায় রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খান খান হতে লাগল।

একে একে প্রতিটি যাত্রী গাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজা জানালা বন্ধ করে দিল। অনেক মেয়েরা ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

এমন সময় বাইরে থেকে শোনা গেল বুক কাঁপানো কতগুলো গর্জন। সিংহের গর্জন। একটার নয়। অনেকগুলি সিংহ বোধ হয় এসে গেছে গাড়ির আশে পাশে। কুড়ি থেকে তিরিশটা সিংহ মানুষের গন্ধ পেয়ে থেমে থাকা ট্রেনটাকে ঘিরে ফেলেছে।

ভয়ে আতঙ্কে বুক শুকিয়ে গেল সবার।

প্রতিনিধি স্থানীয় যাত্রীরা সবাইকে হুশিয়ারী করে দিল যে তারা যেন কোন ক্রমেই গাড়ির বাইরে মুখ না বাড়ান বা নেহাত প্রয়োজন না হলে যেন গুলি না ছোঁড়েন।

প্রাচীনরা বললেন এ স্থানটি যদিও সিংহদের আড্ডাস্থল তবু সিংহ কর্তৃক ট্রেন আক্রমণ এই প্রথম।

আর্নেসেন-দের গাড়িটা হল শেষ বগী। বিপদ এ বগীর সবচেয়ে বেশী। তিন দিক থেকেই আক্রান্ত হবার সুবিধে।

ইতিমধ্যে নিস্তব্ধ জঙ্গল ভয়াবহ হয়ে উঠেছে ক্ষুধার্ত সিংহদলের বুক কাঁপানো তর্জন গর্জনে।

প্রায় মধ্য রাত্রে প্রথম শোনা গেল দরজা জানালার ওপর সিংহের থাবার আঘাত, নখরের আঁচড়ানো খিমচানো। বগীর কাঠের দেওয়ালে সে নখরাঘাত ভেতরকার প্রত্যেক যাত্রীকে মৃত্যুভয়ে প্রায় অবশ করে দিল। ওরা বুঝি দরজা জানালা ভেঙে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করছে। মেয়েরা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল।

এর পর শুরু হল গাড়ির উপর লাফিয়ে পড়া। বগীগুলি সে আঘাতে দুলে দুলে উঠতে লাগল। অবশেষে চালের ওপর আওয়াজ। কয়েকটা সিংহ গাড়ির চালে উঠে লাইটের ফোকড় দিয়ে ভেঙে ঢোকবার চেষ্টা করছে। সর্বনাশ। চালের পাটাতণ হালকা, ওদের মতো বিশালকায় জন্তুর লাফানি ঝাপানিতে ভেঙে না পড়ে।

এক সময় লাইটের যায়গায় এক থাবার আঘাতে ফুটো করে ফেললো খানিকটা। সেই ফুটো দিয়ে সিংহটা মুখ বাড়িয়ে ভেতরটা লোলুপ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলে। সিংহের সশব্দ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শোনা যাচ্ছে, আর সে নিঃশ্বাসে কি সাংঘাতিক পচা গন্ধ।

আর্নেসেন এবং আর দু'জন মিলে রাইফেল তাগ করলে সেদিকে। তারপর একই সঙ্গে গর্জে উঠল মারণাস্ত্রগুলি। ধপ করে একটা শব্দ হল। প্রাণ হারিয়ে সিংহটা বোধহয় চালের ওপরই পড়ে রইল, হু-হু করে তাজা রক্ত ঝরতে লাগল গাড়ির মধ্যে।

এর পর অন্যান্য বগীর চালে চালেও সিংহদের তাণ্ডব চলতে লাগলো। সেখানে গুলি করা সম্ভব হল না। কেন না ফুটো দিয়ে মুখ না বাড়ালে আন্দাজে তো গুলি করা যায় না।

তৃতীয় বগীর ছাদ ভেঙে এক বিরাট সিংহ এক সময় ভেতরে পড়ে গেল। মুহূর্ত মধ্যে তিনজনকে নিহত করে ফেললো সে। ভাগ্যিস জনৈক শিকারী ত্রস্তে সেটাকে গাড়ির মধ্যেই খতম করে ফেললো, নইলে অন্ততঃ কুড়ি বাইশজনের প্রাণ যেত।

এর মধ্যে দরজা ভেঙে আরেকটা সিংহ ঢুকে সবে একটি নারীর ডান হাতটা বগল থেকে ছিনিয়ে

নিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি···দরজার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে মৃত সিংহ পড়ে গেল। বাইরের অন্ধকার লক্ষ্য করেও অনেক গুলি করা হল।

এক সময় কালরাত্রি ভোর হয়ে এল। দিনের আলো ফুটতে সিংহেরা পালিয়ে চলে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

আর নয়। সকলেরই এক চিন্তা ইঞ্জিনটাকে এক্ষুণি তুলে গাড়ি ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এক রাত্রিতেই সকল যাত্রীর বয়েস যেন দশ বছর বেড়ে গেছে।

বিশালকায় ও ভারী ইঞ্জিনকে লাইনে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়। শুধু যুবকরাই নয় সমর্থ মেয়েরাও সে কাজে যোগ দিল।

বহু চেষ্টায় ইঞ্চি ইঞ্চি করে ইঞ্জিনটাকে মাটি থেকে উপরে তোলা হল। এইবারে তুলিয়ে ঠেলে দিতে হবে লাইনের ওপর।

সেটা করতে গিয়ে সহসা মড়াৎ করে এক বীভৎস শব্দ হয়ে গোটা তিনেক লোহার জয়েষ্ট, যার সাহায্যে তোলা হচ্ছিল, ভেঙ্গে গেল। ব্যস, ঝন ঝন ঝনাৎ করে ইঞ্জিন ফের যথা পূর্বম মাটিতে পড়ে গেল এবং তাতে করে চরম সর্বনাশ হয়ে গেল। লাইনের ধাক্কায় ইঞ্জিনের একটি আক্সেল ভেঙ্গে টুটুকরো হয়ে গেল। চমৎকার! আর উপায় নেই। নতুন আক্সেল, ইঞ্জিনিয়র, রেলওয়ে ক্রেন না এলে আর গাড়ি চলবে না। অথচ আগামীকাল বিকেল ছাড়া বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রেনটির সাক্ষাৎও পাওয়া যাবে না কোন মতেই।

চরম হতাশা সমস্ত যাত্রী দলকে একেবারে মাটিতে বসিয়ে ছাড়লো।

আবার আরেকটি ভয়াবহ রাত্রি সামনে। আবার অন্ধকার, আবার সিংহদলের আক্রমণ, পুনরায় কিছু প্রাণ হানি।

দিন কেটে গেল।

সন্ধ্যার আগে গাড়ির চারদিকে আরও প্রচুর সংখ্যক আগুন জেলে দেওয়া হল। আর্নেসেন ও আরো সবাই গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে গেল। চালের ওপরও আজ পাহারা থাকবে বন্দুক নিয়ে। গাড়ির চতুর্দিকেও প্রহরী থাকবে রাইফেল নিয়ে।

দু'টো ভাঙ্গা বগী পরিত্যক্ত হওয়ায় বাদবাকি চারটেতে তাদের স্থান সংকুলান হল না। গাড়ির চাকার তলায়ও কিছু যাত্রীকে ঢোকানো হল। তারই এক স্থানে রইল আর্নেসেনের পত্নী প্রিসিলা।

রাত দেড়টা নাগাদ সিংহেরা আক্রমণ শুরু করল। যেন সুপরিকল্পিত অভিযান। প্রথমে একদল অগ্নিসীমার বাইরে এসে দেখা দিল, সেখানে যেই প্রহরীদের গুলিযুদ্ধ শুরু হল, সেই অবসরে অপর দিক দিয়ে আরেক দল সিংহ অগ্নিসীমা পার হয়ে লাফিয়ে পড়ল ট্রেনের গায়ে।

একটা সিংহ মরল। দুটো···তিনটে···চারটে···পাঁচটা···

কিন্তু ততক্ষণে অনেকগুলি সিংহ এসে ট্রেনের তলার যাত্রীদের আক্রমণ করল। বীভৎস চীৎকার আর্তনাদ শুরু হয়ে গেল চতুর্দিকে।

তারপরই শোনা গেল সেই আর্তনাদ। আর্নেসেন চমকে উঠল, এ যে তার নবপরিণীতা স্ত্রী প্রিসিলার কণ্ঠস্বর।

—বাঁচাও! বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!!

পরের কাহিনী প্রথমেই বলা হয়েছে।

আর্নেসেন জ্ঞান হারিয়ে ফেললো কাঁদতে কাঁদতে।

যখন জ্ঞান হল চেয়ে দেখলো যাত্রীদলের মাঝখানে সে শুয়ে, কে যেন তার নাকে স্মেলিং সল্ট-এর শিশি চেপে ধরেছে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে আবার সে স্ত্রীর খোঁজে যাচ্ছিল। কিন্তু সবাই চেপে ধরে রাখলো। যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন যাওয়া মানে নিজেরও প্রাণ দেওয়া।

উঃ! হায় হায়, আর্নেসেন পুনরায় কেঁদে উঠল, প্রিসিলার সময়ই রাইফেলের গুলি ফুরিয়ে গেল। কী দুর্ভাগা আমি।

কে যেন কয়েকটা বড়ি জল দিয়ে খাইয়ে দিলে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আর্নেসেন ঘুমে অচেতন হয়ে গেল।

পরদিন দুপুরে রিলিফ ট্রেন এসে পড়ল। ট্রেনের দেরী দেখে নিজেরাই তারা চলে এসেছে। যন্ত্রপাতি, ওষুধ-পত্র এবং কুড়ি পঁচিশজন সশস্ত্র পুলিশও এসেছে সে ট্রেনে।

ইঞ্জিন মেরামত কালীন সশস্ত্র প্রহরী সহ কিছু লোক পাশের জঙ্গলে খোঁজ করতে বের হল। কোন লাভ হল না। শুধু নিহতদের ভুক্তাবশিষ্ট হাত-পা, হাড়-গোড় পড়ে আছে দেখা গেল। প্রিসিলার দেহাবশেষও পাওয়া গেল। সে দৃশ্য ভয়াবহ। গায়ের পোষাক দেখে সনাক্ত করা হল। আর্নেসেন পুনরায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

সমস্ত মৃতের দেহাবশিষ্ট সংগ্রহ করে এক জায়গায় কবর দিয়ে দেওয়া হল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ইঞ্জিন ঠিক করে, পুনরায় যাত্রা শুরু হল। দু'দিন পূর্বে গাড়িতে যে যাত্রীদল ছিল তাদের অনেকেই পড়ে রইল কবরে। বাদবাকিদেরও এ দু'রাত্রিতে যেমন চেহারা হয়েছে তাতে কারুর বয়েসই ঠাহর করবার উপায় নেই। ভয়ে, আতঙ্কে, উত্তেজনায় সবাই যেন আধবুড়ো হয়ে গেছে।

এরা প্রত্যেকেই বোধ করি বাকি জীবন সিংহের দুঃস্বপ্ন দেখে রাত্রে চমকে চমকে জেগে উঠবে। আর ইহ জীবনে কোন সিংহের দিকে, এমন কি তা চিড়িয়াখানার সিংহ হলেও, চোখ তুলে তাকাতে পারবে না।

সেই ভয়াবহ দু'রাত্রির স্মৃতি এক জীবনে ভোলবার নয়।
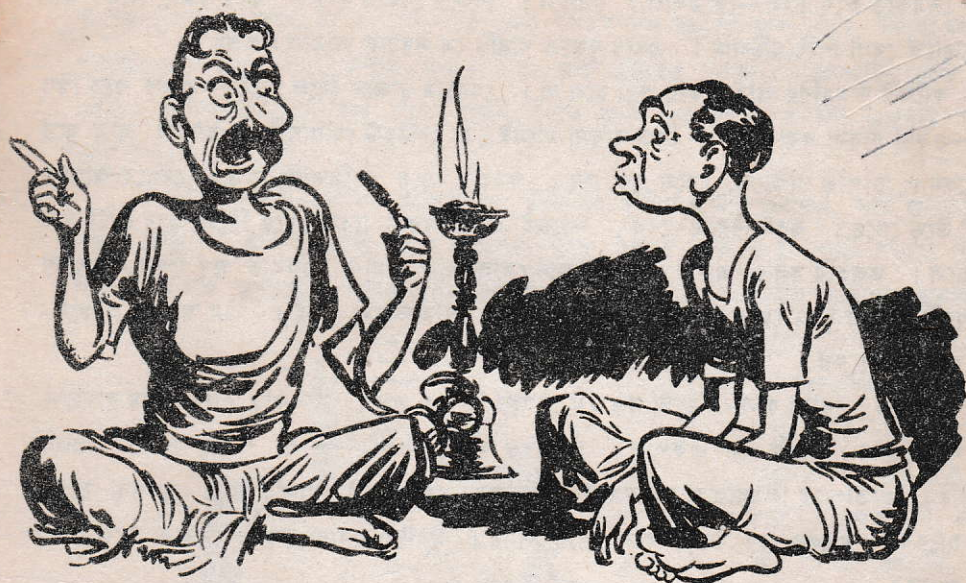
মামা-ভাগনে

শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তিনকড়ি পাল আর ভজহরি দত্ত মামা-ভাগনে। মামা-ভাগনে হলেও ওদের বয়সের তফাৎ বেশী নয়। ছেলেবেলা থেকে একবাড়ীতে মানুষ, একসঙ্গে শোয়া-বসা। তিনকুলে কেউ নেই। আপনার বলতে মামার ঐ ভাগনে, আর ভাগনের ঐ মামা। তিনকড়ির বাবা হাজার কয়েক নগদ টাকা রেখে গিয়েছিলেন; আর ভজহরির বাবা দিয়ে গিয়েছেন কয়েক বিঘা ধানের জমি। দুটো মিলিয়ে ওদের এতদিন একরকম চলে যেত। এখন আর চলতে চায় না। ভজহরির ইচ্ছা কলকাতা গিয়ে চাকরি-বাকরির চেষ্টা করে। তিনকড়ির মন সায় দেয় না। ভজহরি সেটা জানে। মাঝে মাঝে বলে—যেতে কি আমারি ইচ্ছে, মামা? কিন্তু কি করি? বসে খেলে ঐ ক'টা টাকা আর ক'দিন? তারপর ক্ষেতগুলোতেও ফসল-টসল ভালো হচ্ছে না। দুটো পেট তো চালাতে হবে।

তিনকড়ি ভাবতে থাকে। অনেকক্ষণ ধরে তামাক টানে, তারপর জবাব দেয়—যাবি, যা। আমার আর আপত্তি কি? সন্ধ্যেবেলা একহাত দাবা না হলে যে রাত্তিরে ঘুম হয় না। এই যা মুস্কিল। বদ্ অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে কিনা!

ভজহরি বলে—কেন, বিপিনদাকে বলে দেবো। রোজ এসে বসবে তোমার সঙ্গে।

তিনকড়ি রুখে উঠল—কি বললি? বিপনে! বিপনে খেলবে দাবা! ত্মাখ ভজা, অনেক কষ্ট করে তোকে খেলা শিখিয়েছিলাম। এবার বুঝতে পারছি সে সবটাই আমার পণ্ডশ্রম।

কাজেই ভজহরির আর চাকরি করা চলে না। শেষটায় দু'জনে মিলে অনেক পরামর্শ করে স্থির হ'ল—একটা ব্যবসা করা যাবে। কিন্তু ব্যবসা মানেই তো ছুটোছুটি ঘোরাঘুরি। বাজার ঘুরে ঘুরে মাল কেন। চাপাও গাড়ীতে, রেলে বুক্ কর। আবার এসে ডেলিভারি নাও। দেখবে আদ্ধেক পথেই উড়ে গেছে। ঝক্‌মারির একশেষ। কাজেই এমন একটা ব্যবসা বেছে নিতে হবে যেটা ঘরে বসে চলে। ভজহরি বলল, একটা পোল্‌ট্রি ফার্ম খোলা যাক্ মামা! একবার শুধু গিয়ে কতগুলো হাঁস-মুরগী এনে ঐ মাঠে ছেড়ে দেওয়া। ব্যস্, তারপরে আর ভাবনা নেই। ডিম আসতে থাকবে। ঘরে বসে বিক্রী কর।

পোল্‌ট্রি খোলা হ'ল। দুটো বড় বড় লেগহর্ন্ মোরগ এল। তিনকড়ি তাদের নাম রাখল—রুদ্র আর ভৈরব। মুরগী এল একপাল। তাদেরও নামকরণ হ'ল—কালী, তারা, গৌরী, কল্যাণী ইত্যাদি। খাতাপত্তর লিখবার জন্যে কেরাণী এল দু'জন, আর মুরগী চরাবার জন্যে ছোকরা চাকর জন চারেক। মালের ঘর তৈরি হ'ল সারি সারি। মুরগীর খাবার মজুত করবার জন্যে তৈরি হ'ল গুদাম।

মাসের শেষে দেখা গেল, হিসেবের খাতার ডান দিকটা অঙ্কে ভরে গেছে, বাঁ দিকটা প্রায় ফাঁকা, অর্থাৎ মুরগীগুলো বামুনের গরুর ঠিক উল্টো। চরে খুব, খায় তার চেয়েও বেশী, ডিম দেয় কম। আর দেখা গেল, ওগুলোকে খাওয়ানোর চেয়ে খাওয়ার দিকেই চাকরদের ঝোঁক বেশী। আরো মাসখানেক পরে এল এক মহামারী। পোল্‌ট্রি ফার্ম একেবারে ফর্সা। রইল শুধু ভৈরব,—ভৈরব হুঙ্কার ছেড়ে সকাল সন্ধ্যা মামা-ভাগনের কান ঝালাপালা করে দেবার জন্যে।

তিনকড়ি বলল—তোর কথা শুনেই তো এতগুলো টাকা জলে গেল। হিন্দুর ছেলে, মুরগী পুষবি। ধর্ম্মে সইবে কেন? তার চেয়ে এক কাজ কর। শূয়রের ব্যবসা কর।

ভজহরি অবাক হয়ে বলল—শূয়র!

—হ্যাঁ, শূয়র। বছরে তিনবার বাচ্চা দেবে, ফি বারে এক এক ঝাঁক। কথায় বলে শূয়রের পাল।

—তারপর? সে শূয়রের পাল দিয়ে আমরা করব কি?

—কেন, দেশ-বিদেশে চালান দেবো—ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ডেন্‌মার্ক। ওরা যে সব হ্যাম্ বলতে অজ্ঞান। হ্যাম্ মানে জানিস তো?—শূয়রের মাংস।

শ' পাঁচেক টাকা পকেটে করে ভজহরি বেরোল 'হরিজন' পাড়ায় শূয়রের খোঁজে। রাস্তায়

এক জায়গায় তার রিক্স গেল থেমে। ভীষণ ভীড়। কি ব্যাপার? মস্ত বড় জ্যোতিষী এসেছেন একজন। হাত দেখে কিংবা ঠিকুজিতে চোখ বুলিয়ে ভুত ভবিষ্যৎ বলে দেন। কিসে কার কপাল খুলবে, আর কবে কার কপাল পুড়বে, সব তার ঠোঁটের ডগায়। ভজহরি ঢুকে পড়ল। শূয়রের কারবারটা ঠিক তার পছন্দ হয়নি। কি জানি কি হয়? হাতটা একবার দেখানোই যাক্ না।

জ্যোতিষী মামা-ভাগনের আগাগোড়া ইতিহাস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন, আর শুনলেন তাদের নতুন প্ল্যান্। তারপর হাত দেখে বললেন—কিছু করতে হবে না। পড়ে পাওয়া ধন লেখা আছে তোমার কপালে। রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাবে। তোমার মামাকে একদিন নিয়ে এসো।

তিনকড়ি কিন্তু আসতে রাজী হ'ল না। অনেক বলা কওয়ার পর ঠিকুজিটা পাঠিয়ে দিল। জ্যোতিষী অনেকক্ষণ ধরে সেটা দেখলেন, কি সব অঙ্ক টঙ্ক কষলেন, তারপর কাগজটা আস্তে আস্তে গুটিয়ে, ফিরিয়ে দিলেন ভজহরির হাতে।

—কি দেখলেন, ঠাকুর?

—বড় খারাপ খবর।—শুক্‌নো মুখে বললেন জ্যোতিষী ভজহরিকে।

—খারাপ খবর?

—হ্যাঁ।

ভজহরির মুখে আর কথা সরলো না। জ্যোতিষী গম্ভীরভাবে বললেন—মৃত্যুযোগ রয়েছে তোমার মামার। এক বছরের মধ্যেই উনি মারা যাবেন।

ভজহরি চলে যাচ্ছিল। ইসারা করে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন জ্যোতিষী ঠাকুর। অনেকক্ষণ ধরে দু'জনে চুপি চুপি কি সব কথা হ'ল। মামার খবর শুনে যে রকম দুশ্চিন্তা ফুটে উঠেছিল ভজহরির মুখে, যাবার সময় দেখা গেল, তার কোনো চিহ্ন নেই।

এক বছরের মধ্যেই মৃত্যু! খবর শুনবার পর তিনকড়ি দিন কয়েক মনমরা হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ বেপরোয়া ফুর্তি শুরু করে দিল। আজ গানের জলসা, কাল নাচের আসর, পরশু বিরাট ভোজ, তারপর দিন তুব্‌ড়ি কম্‌পিটিশন্‌। কি হবে টাকা দিয়ে? একবছর তো পরমায়ু!

ভজহরি ভাবনায় পড়ল। অনেক ভেবে চিন্তে শেষটায় একদিন সন্ধ্যেবেলা দাবার ছক পেতে বসল—একটা কথা বলব, মামা?

—বল্‌ না কি বলবি।

—তুমি তো মরতে চলেছ, আমাকেও মেরে রেখে গিয়ে কি লাভ? একটা উপকার করে যাও। বছরে বছরে ঘটা করে তোমার শ্রাদ্ধ করব। আত্মার তৃপ্তি হবে।

—কি করতে বলিস?

—একটা লাইফ ইন্‌সিওর করে যাও তোমার নামে,—বলে ভজহরি মামার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল, তোমার তো আর কেউ নেই। মরবার পর টাকাটা আমিই পাব।

কথাটা তিনকড়ির মনে লাগল। সত্যিই তো ভজাটার চলবে কি করে? এটুকু উপকার তার করাই উচিত।

ইন্‌সিওরেন্সের দালাল জ্যোতিষীর জানা লোক। খবর পাওয়া মাত্র কাগজপত্তর নিয়ে এসে তিনকড়ির নামে পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবন বীমা করে দিয়ে গেল। প্রিমিয়ম দিতে হবে তিনমাস অন্তর সাতশ' পঞ্চাশ টাকা; একবছরে তিন হাজার। তারপর মামা চোখ বুজলেই ভাগনের হাতে চলে আসবে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা। ভজহরির চোখ দুটো জল্‌জল্‌ করে উঠল।

আট-ন' মাস যায়।

তিনকড়ি বলল—আর ক'দিন? চল্‌ ভজা, একটু তীর্থধম্মো করে আসি।

—তাই চল মামা!

অনেক তীর্থ ঘোরা হ'ল। হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, হরিদ্বার থেকে আরম্ভ করে পুরী, রামেশ্বরম্‌ মহাবলীপুরম্‌ পর্য্যন্ত। মস্ত বড় একটা চক্কোর দিয়ে ওরা ফিরে এল গয়ায় এবং বাড়ী ভাড়া করে ঐখানেই রয়ে গেল। তিনকড়ি বলল—এখানেই থাকি, কি বলিস ভজা? সব হয়ে-টয়ে গেলে পিণ্ডিটা দিয়ে বাড়ী চলে যাস।

কিন্তু এ কি হ'ল! বছর পার হয়ে চৌদ্দমাস কেটে যায়। মৃত্যু-যোগের কোনো লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না। বরং শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে তিনকড়ি দিব্যি শুক্লপক্ষের শশিকলার মত দিন দিন বেড়ে উঠতে লাগল। এদিকে ইন্‌সিওর কোম্পানীকে তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। আর একটা সাতশ' পঞ্চাশের নোটিস এসেছে। এক মাসের মধ্যে না দিলে ঐ তিন হাজারও পচে যাবে।

ভজহরি ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। তিনকড়ির ওসব খেয়াল নেই। রোজ মন্দিরে যায়, জপতপ করে, সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে বসে দুটো ধর্ম্মকথা শোনে।

এমনি সময়ে একদিন ফল্‌গুনদীর ঘাটে জ্যোতিষীর সঙ্গে ভজহরির দেখা। ভজহরি ছুটে গিয়ে তার গলা টিপে ধরে গর্জ্জে উঠল—তোমাকে পুলিশে দেবো জোচ্চোর কোথাকার!

জ্যোতিষী কোনো রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নরম হয়ে বলল—আহা চটছ কেন? একটু ফাঁকায় চল। সব বলছি।

ভজহরি চোখ পাকিয়ে বলল—বলবে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু। পনেরো মাস কেটে গেছে। খবর রাখো হাতে একটা পয়সা নেই।

জ্যোতিষী বলল—কি করব, ভাই! একটুখানি হিসেবের ভুলে এ দুর্ভোগ ভুগতে হ'ল। আর দেরি নেই। তিন-চার দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সপ্তাহে একদিন করে তিনকড়ি বুদ্ধগয়ার মন্দিরে যেত। সকালে গিয়ে ফিরত সন্ধ্যায়। এবার সে গেল, আর ফিরল না। তার বদলে এল তার মৃত্যু-সার্টিফিকেট—পাশ-করা ডাক্তারের সই করা। তাতে লেখা আছে—বুদ্ধগয়ার মন্দিরের পাশে ধ্যান করতে করতে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে তিনকড়ি পালের মৃত্যু হয়েছে। জন চারেক সাক্ষীও পাওয়া গেল, যারা বলল, শব তারাই গিয়ে দাহ করেছে বুদ্ধগয়ার শ্মশানে।···

মফঃস্বল সহর। তার মধ্যে সব চেয়ে যেটা সেরা বাড়ী, তার ফটকের বাঁ-দিকের পিলারে লেখা—'তিনকড়ি-নিলয়'। ডানদিকের পিলারে লেখা—ভজহরি দত্ত। জ্যোতিষীর সঙ্গে ভাগে কারবার চলেছে ভজহরির। একখানা রেশনের দোকান, দুখান বাস্‌ আর খান তিনেক মাল-লরী। সন্ধ্যার পরে আগেকার মত এখনো দাবার আসর বসে। অনেক রাত পর্য্যন্ত বিস্তর তামাক-সিগারেট পোড়ে, কেটলি কেটলি চা আর ঝুড়ি ঝুড়ি চপ-কাটলেট উড়ে যায়।

বছর খানেক পরের কথা। দাবার আড্ডা জোর জমে উঠেছে। সদর দরজায় কার গলা শোনা গেল—ভজহরি আছ?

সবাই চমকে উঠল। সাড়া দেবার মত স্বর ফুটল না। একজন গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে ভিতরে এসে দাঁড়াল। পলকের মধ্যে যে যেখানে ছিল একেবারে সাফ, শুধু রইল ভজহরি। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—একি, তুমি!

সন্ন্যাসীর মুখে হাসি ফুটে উঠল—বড্ড অবাক হয়ে গ্যাছ, না?

একটু থেমে আবার বলল—মনে করেছিলে গুণ্ডার হাত থেকে লোকটা ।ফরে এল কি করে? কিন্তু গুণ্ডাগুলো তোর চেয়ে অনেক ভালো। তারা আমাকে মারেনি। এক বছর খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ভজহরি বলল—কিন্তু মামা, তুমি তো বেঁচে নেই।

—তার মানে?—গর্জ্জে উঠল তিনকড়ি।

—তার মানে, তুমি মরে গ্যাছ। আইনের চোখে আর ইন্‌সিওর কোম্পানীর কাগজে পত্তরে তুমি মৃত।

—মৃত! আচ্ছা, দেখি, তুমি জীবিত থাক কি করে?

হন্‌হন্‌ করে বেরিয়ে গেল তিনকড়ি। ভজহরি পেছন পেছন ছুটল—শোনো মামা, শোনো। তিনকড়ি ততক্ষণ থানার পথে।

* * *

তিনকড়ি পাল আর ভজহরি দত্ত। এককালে তারা এক বাড়ীতে মানুষ হয়েছিল। আজও
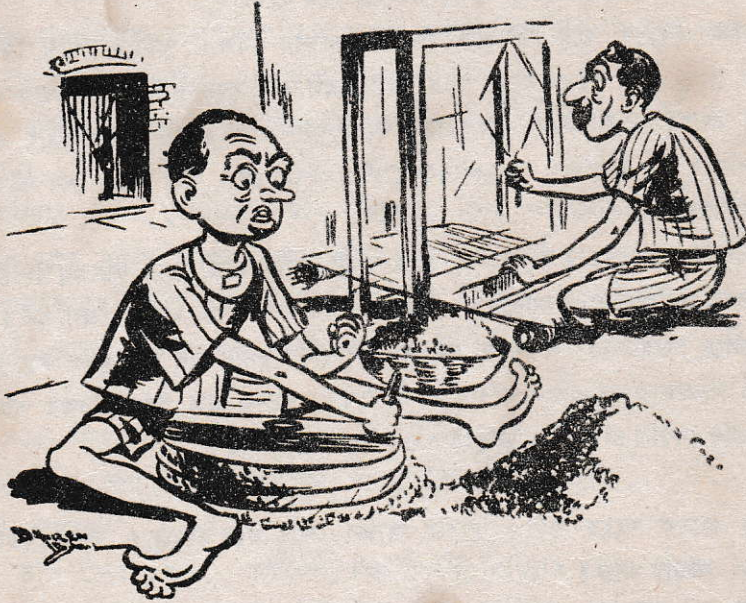
তারা এক বাড়ীতে বাস করে। সে বাড়ীটার নাম জেলখানা। ভজহরি ডাল ভাঙ্গে, আর তিনকড়ি চালায় তাত।

জ্যোতিষী ঠাকুর ফেরার। পুলিশ এখনো তার খোঁজ করছে।

—

—কি বললেন ?—আতঙ্কে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল এবিংহাউসের। অবশেষে ডক্টর রোজারের এই অদৃষ্ট ? দেখুন, ভাল করে দেখুন আপনি।

কেপ হর্নের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হোল। কিন্তু সেখানেও ওঁরা কিছু করতে পারলেন না। সংকেত পাঠাবার বেতার-তরঙ্গ কোন কাজই করছে না। হ্যামিণ্টনকে বললেন এবিংহাউস—আমি খুবই দুঃখিত, মিঃ হ্যামিণ্টন। রোজার এবং তাঁর সহকারী আর ইহলোকে নেই।

—তার মানে ?

—আমাদের অদূরদর্শিতার আর একটি ব্যর্থফল। এদিকটা গবেষণাকালে আমরা ভেবেই দেখি নি। আপনি হয়ত জানেন, সূর্য থেকে নিরন্ত প্রচণ্ড পরিমাণে মহাজাগতিক কণিকা ছড়িয়ে পড়ছে। এরাই সৃষ্টি করে মহাজাগতিক রশ্মি। আমাদের পৃথিবীর উপরও পড়ছে এরা, তবে কম, তাই রক্ষে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্টার ১ সূর্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় একটা অজ্ঞাত কণিকার প্রবাহে গিয়ে পড়ে। আর তা তাঁর ক্যাপসুলের আধার যে ধাতু দিয়ে তৈরী, তার সঙ্গে শুরু করে বিক্রিয়া। সে পারমাণবিক বিক্রিয়া এমনই যে প্রথমে আমরা আশঙ্কা করেছিলাম, কেউ হয়ত পৃথিবীতে বাঁচবে না। একে বলা হয় অস্থির শৃঙ্খল বিক্রিয়া। ধাতু থেকে পৃথিবীর আবহাওয়া ছড়িয়ে হয়ত শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর প্রতিটি পদার্থ-কণিকার সঙ্গে একের পর এক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবে মৃত্যু। একেবারে মৃত্যুই তার পরিণতি।

—বলেন কি স্যার ?

—কেন, কাগজে কি তার লক্ষতম ভাগের এক ভাগের ক্ষমতার কথা পড়েন নি ?

—তেইপি, তাসমেনিয়ার মত—এখানেও কি— ?

—না। সে আশঙ্কা আর নেই। কোন কারণে অস্থির শৃঙ্খল বিক্রিয়া থেমে গেছে। তার বদলে রোজারের সমস্ত যানটিই বিস্ফোরিত হয়ে অগ্নিকুণ্ডরূপে মহাকাশে বিরাজ করছে। পৃথিবীর মানুষ এ যাত্রায় রক্ষা পেল, মিঃ হ্যামিলটন।

—ডক্টর রোজার ? তিনি আর ফিরবেন না ?

—সে কথা না-ই বা শুনলেন আর। আপাততঃ কাগজওয়ালাদের বলুন, তারা যেন আজই বিশেষ সংস্করণ বের করে জনসাধারণকে জানায় : বিপদ দূর হয়েছে। অনেক কিছুই হতে পারত। বিধাতার আশীর্বাদে এ যাত্রায় আমরা রক্ষা পেয়েছি।

১৩৭০

শ্রীমনোজিৎ বসু

নন্দদুলাল তরফদার—
মাথায় ঢালো বরফ তার।
কারণ, মাথা গরম যে,
নেইকো লজ্জা-শরম যে!

রাতদুপুরে বাঁধায় গোল
গাবুর গাবুর বাজায় খোল।
শব্দে পাড়া-পড়শীতে
এসেই দেখে বঁড়শিতে

নন্দ মাছের চার গাঁথে
একখানা ছিপ্ তার হাতে।
পড়শী দেখে ভড়কে যায়.
দাঁত-খোঁচানো খড়্কে চায়!

নয়তো খাটে চিৎপটাং,
খড়ম পায়ে খট্‌খটাং
দরজা খুলে বাইরে যায়
তার কোনো হুঁশ নাই রে হায়।

রাত দুপুরে ঘর ছেড়ে
কাণ্ড একি করছে রে!
নন্দদুলাল খানিক পর
এসেই বলে, 'মাণিক ধর'

আমার সে যে পাওনাদার,
আঃ কী ছিল গাওনা তার।
মরে গিয়েও গান শোনায়,
শুনতে সে গান যান কোণায়।

দেখিয়ে ঘরের পুবের কোণ
নন্দ বলে, 'কুবের, শোন্।'
কোণায় গলা ফুলিয়ে ব্যাঙ্
ডাকছে গ্যাঙর দুলিয়ে ঠ্যাঙ্।

হল্লা হাসির অট্টরোল
তখন কেবল হট্টগোল।
কুবের বলে, 'তরফদার'
ঢাল রে মাথায় বরফ তার।

গরম মাথা ঠাণ্ডা কর্
নয়তো সবাই ডাণ্ডা ধর্,
মুণ্ডু তাহার ফটিয়ে দে
নয় তো রাঁচী পাঠিয়ে দে।

★

॥ একটি রহস্য কাহিনী ॥

নেস্ হ্রদের ভয়ঙ্কর !

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

১৯৩৩ সালের ১৪ই এপ্রিল; বসন্তকালের মনোরম এক সন্ধ্যায় নেস হ্রদের তীরে বেড়াচ্ছিলেন মিষ্টার ম্যাকে; সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা; স্কটল্যাণ্ডের ছোট বড়ো নানা হ্রদের মধ্যে এই পাহাড় দিয়ে ঘেরা লক্ নেসের শোভাই বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর। তাই বছরের এই সময়টায় দেশ বিদেশ থেকে বহু পর্যটক বেড়াতে আসেন এখানে। ড্রাম্‌নাড্রচিট নামে একটা ছোট্ট হোটেলের মালিক ম্যাকে সাহেবও দিনের কাজ সেরে বেরিয়ে পড়েছিলেন তাই। মেঘমুক্ত আকাশ। চারিদিক মোটামুটি বেশ নিঃস্তব্ধ নির্জন। লক-নেসের উত্তর দিক দিয়ে আড়াআড়ি-ভাবে যে পিচের রাস্তাটা চলে গেছে সেই রাস্তা ধরে মনের আনন্দে গাড়ি ছুটিয়েছিলেন মিষ্টার ম্যাকে। পিছনের সীটে ছিল তাঁর ছেলেমেয়েরা। আর গাড়িও ছুটছিল বেশ দ্রুতগতিতে। গাড়ি চালাতে চালাতে সবার আগে দৃশ্যটি চোখে পড়লো মিসেস ম্যাকের; সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতি কমিয়ে ফেললেন তিনি; তারপর তার স্বামী আর ছেলেমেয়েদের তাকাতে বললেন, নেস্ হ্রদের দিকে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও এখনও মোটামুটি দেখা যাচ্ছে সব কিছু; সেই আলো আঁধারে হঠাৎ নেসের স্থির জলে প্রবল আলোড়ন তুলে হুস করে ভেসে উঠলো দীর্ঘাকার, নিকষ কালো এক অচেনা জীব; তারপর তীর বেগে সাঁতরে গেল বেশ কয়েক শো গজ; ম্যাকে পরিবারের সকলে গাড়ি থামিয়ে ততক্ষণে নেমে পড়েছেন হ্রদের তীরে; তাঁদের চোখের সামনেই কিছুক্ষণ ধরে চললো সেই অচেনা, ভয়ঙ্কর জীবটির দাপাদাপি; তারপর এক সময় সেটি টুপ করে ডুবে গেল রহস্য ঘেরা নেস্ হ্রদের অতল তলে!

ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে ম্যাকে সাহেব তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন তাঁর হোটেলে। সেখানে সেই রাতে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বন্ধু আলেকজাণ্ডার ক্যাম্পবেল; আর ক্যাম্পবেল সাহেব ছিলেন স্কট-ল্যাণ্ডের 'ক্যুরিয়র' পত্রিকার একজন রিপোর্টার। তিনি সব বিবরণ শুনে ঐ অচেনা, অতিকায় জীবটির নামকরণ করলেন—'নেস হ্রদের দানব।' পরের দিন 'ক্যুরিয়র' কাগজে ফলাও করে ছাপাও হল সেই হঠাৎ দেখা দেওয়া 'দানবে'র বিবরণ। লোকেরা সেই বৃত্তান্ত পড়ে অবাক হল। কারণ শান্ত, নির্জন নেস্ হ্রদের জলে যে এমন কোন জীব লুকিয়ে থাকতে পারে এ ধারণা এতকাল

স্থানীয় কোন মানুষেরই ছিল না।

ঐ বছরেই ১১ই মে তারিখে আবার দেখা গেল ঐ অদ্ভুত প্রাণীটিকে! এবার তার দেখা পেলেন আলেকজাণ্ডার শ' আর তাঁর ছেলে এলিস্ টেয়ার। নেসের দক্ষিণ তীরে প্রায় দেড়শ' ফুট উঁচু একটা টিলার ওপর দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। ভোরের হালকা রোদে ঝলমল করছিল হ্রদের ছোট ছোট ঢেউগুলো ; হঠাৎ ৫০০ গজ দূরে লক-নেসের জলে দেখা দিল একটা বিরাট আলোড়ন। তারপর কালো, লম্বা মত কি যেন একটা ভেসে উঠলো হুস্ করে। প্রথমে দেখতে পেয়েছিল এলিস্‌টেয়ার। তারপর চীৎকার শুনে মুখ ফেরালেন শ'। কয়েক মুহূর্ত ভেসে থেকে উর্কুহার্ট উপসাগরের দিকে তীব্রগতিতে ছুটে গেল সেই দানব ; দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল দিগন্তের আড়ালে।

এরপর থেকে ঘন ঘন দেখা পাওয়া যেতে লাগলো ঐ অদ্ভুত জানোয়ারটির। নানা দেশের এড্‌ভেঞ্চার প্রিয় ভ্রমণকারীরা এসে ভীড় করতে লাগলেন লক-নেসের দুই তীরে। দলে দলে ভীড় করতে থাকেন সাংবাদিকেরাও। ১৯৩৩ সালে সারা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হতে থাকলো নানা বিচিত্র সংবাদ—'লক-নেসের জলে ভয়ঙ্কর দানোর আবির্ভাব! প্রাগৈতিহাসিক ডাইনাসোরস আবার ভেসে উঠেছে!' ইত্যাদি। নানা প্রত্যক্ষদর্শীর নানা রোমাঞ্চকর বিবরণও ছাপা হতে থাকলো পত্র-পত্রিকায়। এমন কি ঐ নাম না জানা দানবের কয়েকটি অস্পষ্ট ফটোগ্রাফও ছাপা হল সংবাদপত্রে। স্থানীয় অধিবাসীরা তখন ঐ নিরীহ, রহস্যময় জীবটির নাম রাখলো 'নিসী'!

ইংল্যাণ্ডের 'ডেলীমেল' পত্রিকায় সমীক্ষা অনুযায়ী প্রায় এক হাজার দর্শনার্থীকে এ পর্যন্ত নাকি দেখা দিয়েছে 'নিসী'; অন্ততঃ ৩০০ বার লক-নেসের জলে বা তীরে দেখা গেছে তাকে! কখনও দু' পাঁচ সেকেণ্ডের জন্যে, আবার কখনও ঘন্টার পর ঘন্টা। হ্রদের ধারে ভোর বেলা রোদ পোহাতেও দেখেছে কেউ কেউ। তবে কারও তেমন কোন ক্ষতি করে নি 'নিসী'; চেহারাটা যেমনই ভয়ংকর হোক না কেন স্বভাবটা তার মোটামুটি নিরীহ। অবশ্য এই 'নিসীর' অস্তিত্ব সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিকও জীব বিজ্ঞানীরা এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন নি। তবু ইয়েতি বা তুষার মানবের মত 'লক-নেসের দানব' ও এখনও বহু এডভেঞ্চার প্রিয় তরুণকে রহস্যময় পাহাড় ও কুয়াশা ঘেরা নেস্ হ্রদের তীরে টেনে নিয়ে যায়। লণ্ডন, গ্লাসগো, এবারডীন, এডিনবার্গ থেকে ছুটে আসেন পর্যটকেরা। তাঁদের দৌলতে একদা অখ্যাত নেস্ সহর ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি হয়ে উঠেছে রীতিমত সমৃদ্ধ। হ্রদের চারিদিকে যে ঝোঁপ জঙ্গল ছিল তাও কেটে সাফ করে ফেলেছে বনভোজনকারীরা। নেসের চারধারে ভালো রাস্তাও ছিল না এতদিন। এই 'নিসীর' কৃপায় সেটাও তৈরী হয়ে গেছে। যেসব জায়গা থেকে দানবকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা সে সমস্ত জমির দামও এখন নাকি আকাশ ছোঁয়া। যে নেসের তীরে আগে দু' চারটে জেলে ডিঙি

ছাড়া আর কোন নৌকা চোখে পড়তো না। এখন সেখানে দেখতে পাওয়া যাবে সার সার মোটর বোট আর ইয়ট্। অর্থাৎ 'নিসী'র কৃপায় স্থানীয় গরীব গ্রামবাসীর ভাগ্য ফিরে গেছে এখন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মাতামাতি হয়েছে এই 'নিসী'কে নিয়ে। যুদ্ধের সময় লোকেরা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়েছিল তাকে। এখন আবার পত্র-পত্রিকায় শুরু হয়ে গেছে 'নিসী'কে নিয়ে নানা আলোচনা। একমাত্র 'ডেলী মেল' পত্রিকাতে এ-যাবৎ ঐ দানব সম্বন্ধে যত খবর বেরিয়েছে তা এক সঙ্গে পড়তে গেলে সময় লাগবে দশ ঘন্টার মত।

এই মাতামাতিতে সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়েছেন বিজ্ঞানীরা। ২৪ মাইল লম্বা, ২ মাইল চওড়া, ৭০০ ফুটের মত গভীর নেস্ হ্রদের জলে স্যালমন, ট্রাউট, ইল মাছ আর কাছিম ছাড়া আর কি-ই বা থাকতে পারে? মোটর বোটে সারাদিন টহল দিয়ে, নানাভাবে জাল ফেলে জলের নীচে ডুবুরী নামিয়ে ঐ দানবের সন্ধান করেছেন তাঁরা। কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায় নি সে চেষ্টায়।

স্কটল্যাণ্ডের স্থানীয় অধিবাসীরা বলে 'নিসী' আসলে গেলিক উপকথার 'কেল পাইস' দানব। যার বাস পাতালপুরীতে; ঐ ড্রাগন সুযোগ পেলেই মানুষকে নাকি গিলে খায়। অবশ্য জলে নেমে এখনও পর্যন্ত কেউ ঐ দানবের খপ্পরে পড়েছেন বলে আমরা শুনি নি। এই সূত্রে, 'নিসী'র যাঁরা মুখোমুখি হয়েছেন এমন দু'জনের কথা বলা যেতে পারে।

ক্যালিডোরিয়ান ক্যানেল কোম্পানীর ম্যানেজার ছিলেন মিঃ হোয়াইট; তিনি বাস করতেন নেস্ হ্রদের উত্তর সীমানায়; ঐ অঞ্চলেই হ্রদ থেকে একটি ছোট্ট নদীর ধারা গিয়ে পড়েছে সমুদ্রে। অনেকের ধারণা ঐ নদী পথেই সমুদ্র থেকে 'নিসী' বেড়াতে আসে লক্ নেসে। সমুদ্রেই তার স্থায়ী আস্তানা। ঐ বিষয়ে নানা খোঁজ খবর নিয়ে মিসেস হোয়াইটি বই-ও লিখে ফেলেছেন একখানা। তিনি নাকি বেশ কয়েকবার খুব কাছ থেকে দেখেছেন 'নিসী'কে। হোয়াইটির মতে 'নিসী' আসলে এক ধরণের উভচর, অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জীব। সে নিরামিষাশী। মানুষের দেখা পেলেই সে লুকিয়ে পড়ে। চেহারাটা ভীষণ হলেও সে স্বভাবে নির্জনতা প্রিয়।

একদিন গ্রান্ট নামে এক ভদ্রলোক মোটর সাইকেল চেপে লক্ নেসের ধার দিয়ে যেতে যেতে একেবারে গিয়ে পড়েছিলেন নিসীর ঘাড়ে। সেটা ছিল ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাস। আকাশে ফুট ফুট করছিল জ্যোৎস্না। মনের খুশিতে মোটর সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন গ্রান্ট; হঠাৎ হেড লাইটের আলোয় দেখেন পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো রং-এর এক বিশাল দানব। ল্যাজ থেকে মাথা পর্যন্ত তার দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ২০ ফিট! আলো দেখেই এক লাফে সেই দানবটি সরে গেল এক পাশে। তারপর হড়বড় করে নেমে গেল নেসের জলে! ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গ্রান্ট সাহেব ফিরে এলেন তাঁর বাড়িতে। প্রথমে তো কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করতেই চায় না। সবাই

বলে নেশার ঝোঁকে কি দেখতে কি দেখেছেন তিনি। অবশেষে ঐ জায়গায় গিয়ে দেখা গেল ঝোপ জঙ্গল ভেঙ্গে সত্যিই খানিকটা জায়গা তছনছ করে দিয়েছে নিসী। তাছাড়া কিম্ভূত কিমাকার কয়েকটা পায়ের ছাপও রয়েছে কাদার ওপর। তখন বিশ্বাস হল সকলের।

চারিদিকে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা গেল ঐ জায়গায় নিসীকে দেখেছে আরও কয়েকজন। যেমন, গ্রান্টের মতই গাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলেন মিষ্টার ও মিসেস স্পাইসার; ভোরবেলা নেসের ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা। হঠাৎ দেখেন পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে এক অদ্ভুত জীব। হাতীর শুঁড়ের মত তার লম্বা গলা, ছোট মাথা, ড্যাবড্যাবে চোখ। তাঁদের দিকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে চেয়েই সে ঝাঁপ দিল হ্রদের জলের গভীরে!

জীব বিজ্ঞানীরা এই বিবরণ শুনে বললেন, এটা আর কিছুই না, আলো আঁধারে দৃষ্টি বিভ্রম। আসলে গ্রান্ট বা স্পাইসার দেখেছেন একটা হাতী সীল। যারা ক্বচিৎ কখনো হ্রদের ধারে চরতে আসে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরা কেউই এ কথা মেনে নেন নি। তাই লক হ্রদের দানব আজও আমাদের কাছে এক অভেদ্য রহস্য!

১৩৮১

মামার বাড়ী

হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মামার বাড়ী, মামার বাড়ী,
আমার সাথে সবার আড়ি।
মামা বেজায় কিপটে ধাড়ী,
মামীর কিন্তু দেমাক ভারি,
রাঙা মাসীর রঙিন শাড়ি,
কাজল চোখের চাউনি তারই,
লাগে ভালো ছাড়তে নারি,
দাদু দিদা শুক ও সারী,
গল্প কথায় মনটি কাড়ি,
আসবে যখন, থাকতে পারি!
এবার এলে হাওয়া গাড়ি
চলে যাবো মামার বাড়ী!

বৃষ্টির ছড়া

বিমল সেন

বৃষ্টি নামে যদি
রাজধানীরও রাস্তাগুলো
মুহূর্তে হয় নদী।
ডবল ডেকার রথ
তখন সাঁতরে চলে পথ
তিন বৃষ্টির জলে ডোবেন
মৈনাক পর্বত।
আয় বৃষ্টি, আন্ বৃষ্টি
তবু সমুদ্দুর,
কাঠ কেটেছে, মাঠ ফেটেছে
অসহ্য রোদ্দুর!

১৩৮১

কানা পণ্ডিত আর পাদ্রী সায়েব

মহাশ্বেতা দেবী

সকালবেলা উঠেই নন্দ দেখলে আকাশে মেঘ, উঠোনে বিষ্টি।

দেখেই সে প্রমাদ গণলে। বিষ্টি যদি বেশী হয়, তা হলে একরকম নিশ্চিন্ত, বেরুতে হবে না। বিষ্টি যদি কম হয় তা হলে মুশকিল, মা নির্ঘাৎ তাকে বেগুনক্ষেতে পাঠাবে। মণ্ডলদের বেগুনক্ষেতে অন্য সময়ে যেতে তার বেশ লাগে ; কিন্তু বিষ্টিবাদলে মোটে যেতে ইচ্ছে করে না।

ওখানে গেলে ফিরতে ফিরতে বেলা দুপুর। তখন আর টোলে যাওয়াও হবে না, পড়ালেখাও হবে না। অবশ্য টোলে গিয়েছে জানতে পারলে তার মা বেদম প্রহার দেবে সন্দেহ নেই। কিন্তু মারের ভয় করলে মানুষ হওয়া চলে না, আবার মানুষ হবার চিন্তা করলে মারের ভয় রাখা চলে না।

সাত-পাঁচ ভেবে নন্দ বিরসবদনে পা ঝুলিয়ে বসে বসে মুড়ি খেতে লাগল। বারো বছর বয়স

হলেও নন্দ এখনো তেমন ঢ্যাঙা হয় নি। এই সেদিন ওর মা চেয়েচিন্তে পৈতে দিয়েছে, এখনো কানে রূপোর কাঠি, মাথায় সবে চুল উঠছে, দাঁতগুলো একটু বড় বড়, সর্বাঙ্গে তিল;

ওর বাবা ছোটবেলা ডাকত 'তিলেখাজা' বলে।

কান্দীর রাজবাড়ী থেকে নাকি একবার ওর বাবা প্রসাদী মিষ্টির সঙ্গে এত এত তিলেখাজা এনেছিল।

নন্দ তা খায় নি। তখন সে নেহাৎই ছোট। সর্বদা 'খাই খাই' করে। মা কখন খেতে দেবে সে ভরসায় বসে না থেকে নিজেই উঠোনের মাটি, লালপিঁপড়ে, বাবার পৈতে, তার হাতের মাদুলী—যা পেত চুষে খেত আর পেটের অসুখে ভুগত।

এখনো তার সেই 'খাইখাই' মনটা আছে, কিন্তু 'তিলেখাজা' এখনো খাওয়া হয়ে ওঠে নি।

আর তিলেখাজা! নন্দদের এখন পান্তা ভাত জোটে কি না তারই ঠিক নেই। সংসার তবু একরকম চলছিল ওদের। কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে ছোটয় বড়য় ষোলটি দেববিগ্রহ পূজো হয়। সেখানে ছোটয় বড়য় আট-দশটি পুরুত লাগে।

বামুনরাই সেখানে ভোগ রাঁধে, পুজো করে, ভোগ দেয়। মূল পুরোহিত হচ্ছেন আগমবাগীশ মশাই। তিনি যদি সিংহ হন, নন্দর বাবার মত গরীব পুরুতরা ছিল একেবারেই পোকামাকড়ের মত। বড়জোর চন্দনটা ঘষা, কি ফুলটা তোলা, এর চেয়ে দরকারী কাজ তারা করত না।

কিন্তু, নন্দর ভাসা ভাসা মনে পড়ে নিত্য সিধে আনত বাবা, প্রসাদ আনত। তা ছাড়া পুণ্যাহতে, রথের দিনে, দুর্গাপুজোয়, বরাদ্দের চারখানা কাপড়ের ওপর আরো কাপড়, গামছা, সব আনত বাবা।

তখন তার মাকে হিংসে করে সবাই বলত, 'কুঞ্জঘাটার রাজা নন্দকুমার, বলতে গেলে একটা বটগাছ। তুই বটগাছের ছায়ায় আছিস কেশী, তোর ভাবনা কি?'

এখন আর তার মাকে কেউ হিংসে করে না।

সেবার ভয়ানক বর্ষায়, সর্বত্র যখন ওলাউঠার প্রকোপ, পাড়ায় পাড়ায় ওলাইচণ্ডীর পুজো, সেবার ভয়ে গোরাবাজারের গোরা পল্টনরা অবধি পুজো করালে, আর সেই পুজোর প্রসাদ খেয়ে নন্দর বাবা গেল মরে।

বাবা মরে যেতে এখন নন্দদের দিন চলাই ভার হয়েছে। মা কাদাইএর টোলবাড়ীতে রামগতি ভট্টাচার্যের বাড়ীর কাজ করে। ভাত রেঁধে দিয়ে, বেলা গড়িয়ে নন্দর জন্যে ভাত বয়ে আনে।

নিজে ওখানেই দুটো অন্নপ্রসাদ পায়। রাস্তা দিয়ে বয়ে আনা ভাত-তরকারী ত আর নিজে খেতে পারে না। সবাই বলে—নন্দর পৈতে হয়েছে, ওরও খাওয়া উচিত নয়।

আড়ালে বলে। কেশী, অর্থাৎ মুক্তকেশীকে সবাই ভয় পায়। এই সেই দিনের কথা, গত বছর

নবাবদের 'বেড়াভাসান' দেখবার জন্য গঙ্গার ধারে লোক ঠেলাঠেলি করছিল, গোরা পল্টনরাও এসেছিল।

ওরা ভীড় ঠেলে এগোবার জন্য বন্দুকের বাঁট ঘোরাতেই 'কে র‍্যা?' বলে কেশী দুটো গোরার মাথায় মাথায় ঠুকে দিয়েছিল। ওদের কাপ্তেন সায়েবকে বলেছিল, 'মুরোদ দেখাতে হয়, তবে গিয়ে যুদ্ধ লড়াই করগে, নিরীহ মানুষের কোমরে গুঁতো মারিস কেন?'

'অল রাইট মাদার' বলে কাপ্তেন তার গোরাদের নিয়ে পালিয়ে মান রক্ষা করেছিল।

সেই থেকে নন্দর মাকে সবাই ভয় পায়। মণ্ডলকর্তা বলেন, 'কেশী নামে পুরাকালে এক দৈত্য ছিল, এবার সে-ই মায়া করে মুক্তকেশী সেজে সৈদাবাদে এসেছে, সবাইকে জব্দ করবে ব'লে।'

নন্দর সে-কথাটা একেবারে অবিশ্বাস হয় না। দৈত্যরা যে মায়াবলে নতুন নতুন সাজে সাজতে পারে সে-কথা সে ভালমতই জানে।

'বলি ও নন্দ!'

নন্দর মা হঠাৎ ভিজে কাপড়ে বাড়ীতে ঢুকল। বলল, 'বিষ্টি থেমে গেছে। যা, গিয়ে ওদের বেগুনক্ষেতে চৌকি দে। গৌর আগেই গিয়েছে।'

কটমট করে চেয়ে বললে, 'আমি আজ টোল থেকে সোজা আসব। খবরদার, ঘুরপথে টোলে যাবি না, আর চৌকি দিতে গিয়ে কস্তং কস্তং করবি না, তা হলে দেখতে পাবি।'

'বাঁ রেঁ, আঁমি আঁবার পুঁথি পঁড়ি কোঁথায়...' নন্দ একটু নাকে কাঁদল, শুকনো চোখ মুছল, তারপর তালপাতার টোকা মাথায় দিয়ে, পেয়ারাগাছের ডালের লাঠি হাতে গুটি গুটি মণ্ডলদের বেগুনক্ষেতের দিকে গেল।

গঙ্গার ধারে ডাঙা জমিতে মণ্ডলদের মস্ত বেগুনক্ষেত। এখন মাঘ মাসে, মুনিষ মাহিন্দার সবাই ছোলা, অড়হর, মুগ, রবিশস্য নিয়ে ব্যস্ত।

তাই মণ্ডলকর্তা মাঝে মাঝে নন্দকে ক্ষেত চৌকি দিতে বলেন। ওঁরা সম্পন্ন চাষী, ভারী ভক্তি দেবদ্বিজে। নন্দদের মাসে মাসেই ক্ষেতের গুড়টা, ডালটা এটা সেটা পাঠান।

নন্দর মা তাই নন্দকে ক্ষেত চৌকি দিতে পাঠায়। ওর মনে গোপন ইচ্ছে, মণ্ডলকর্তা তাঁদের বাড়ীর যজমানীটা নন্দকে দিলে আর ভাবনা থাকে না কিছু।

বেগুনক্ষেতের মাঝে উঁচু মাচা। সেখানে চিৎ হয়ে শুয়ে মণ্ডলদের নাতি গৌর গলা ছেড়ে গান গাইছিল, 'কবে গোষ্ঠে যাবে হে, যেয়ে দেখ, তোমার সাধের বাঁশী রুই (উই)-য়ে খেয়েছে, গরুগুলো দুষ্টু লোকে খোঁয়াড়ে পুরেছে, তোমায় মারবে বলে নন্দরাণী বেত কিনেছে!'

নন্দ একটু শুনে বলল, 'বাজে!'

গৌর দুঃখিত হয়ে বলল, 'এ গানটাও ভাল হয় নি?'

'ছাই হয়েছে। কেষ্ট ঠাকুরের গরু কেউ খোঁয়াড়ে দিতে পারে?'

'নিশ্চয় পারে। এই ধর তুই নদীপারে খাগড়াঘাট গিয়ে বসে রইলি। তোদের ছাগল যদি আমাদের ক্ষেতে আসে তবে ঠাকুরদা তাকে খোঁয়াড়ে দেবে না! তোর মা তোকে মারবে বলে কঞ্চি ভাঙবে না?'

'তুই আকাট বোকা!'

'তবে সেই গানটা গাইব? কাঁদীর মুড়কী খাব বলে কাঁদতে লেগেছি?'

'নাঃ, গান তোর হবে না।'

গৌর কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর দুঃখিত হয়ে বলল, 'লেখাপড়া না জানলে কি আর গান বাঁধা যায়? যেমন তোর মা, তেমনি আমার দাদু, পড়তে দেখলেই রেগে যায়।'

দুজনে কিছুক্ষণ বেগুনক্ষেতের মধ্যে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়াল। তারপর গৌরদের রাখাল ওদের জন্য জলপান নিয়ে এল—চিড়ে ভাজা, শসা, বড় বড় পদ্মবীজের মোয়া, পেতলের ঘটিতে জল। তিনজনে একসঙ্গেই খেল। তারপর নদীর ধারে যেয়ে একটা উপুড়-করা নৌকো চড়ে অনেকক্ষণ ধরে গৌরের বাঁধা গান গাইল।

তারপর স্নান-খাওয়ার সময় হতে গৌর বাড়ী চলে গেল।

নন্দ এসে বাঁশের মাচায় বসে রইল। মাঘ মাসের বাতাসে হাড় কাঁপে। বেগুনক্ষেতের ওপাশে বসে বসে খ্যাকশেয়াল মতলব ভাঁজছে কখন এসে বেগুন চুরি করবে। ওদিকে ধু-ধু গঙ্গা। মোষের পিঠে চড়ে রাখালরা ওপারে যাচ্ছে সাঁতরে সাঁতরে। কবে নন্দ ভট্চাজমশায়ের সঙ্গে নৌকো চড়ে সেই আশ্চর্য জায়গায় যাবে, যার নাম কলকাতা?

ওদিকে, মুক্তকেশী ভট্চাজ মশায়ের রান্নাবাড়া সেরে ওঁকে খেতে দিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ভট্চাজমশায় বললেন—'আমায় উঠোনে বসিয়ে দাও।'

তাঁর হাত ধরে মুক্ত উঠোনে নিয়ে গেল। ভট্চাজমশায় চোখে বলতে গেলে দেখেন না। বললেন—'কই, ছাত্ররা সব কোথায়? পড় বেটারা, পড়।'

গুটি কয়েক ছাত্র আছে। ভট্চাজমশায় মস্ত বড় পণ্ডিত। তাঁর ঘরে এত বড় বড় মানপত্র আছে। খাস মুর্শিদাবাদ মালদ'র ভাঁজ সোনালী রেশমের ওপর খুদে খুদে অক্ষরে কত কত হাড়ভাঙা শব্দ লেখা।

নন্দর মা মাঝে মাঝে বলে, 'হ্যাঁ বাবা, যারা এত এত মানপত্তর দিয়েছে, তাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়?'

'হয় বই কি!'

'এবার তাদের সঙ্গে যখন দেখা হবে, তখন আমি যা বলব তা বলে দিও।'

'মুক্ত! তুমি যা বল, তা অপরকে যথাযথ বলা বড়ই কঠিন মা! তুমি বামুনের মেয়ে হলে কি হয়। আমার ছাত্রদের অবধি ব্রহ্মদত্যি, মূর্খ, অজ, আরো কত কি বল···!'

নন্দর মা তখন চুপ করে যায় বটে। কিন্তু অন্য সময়ে বলে, 'সবাই বলে, তুমি এ-দেশের গৌরব। তা মুখপোড়ারা শুধু শুধু মানপত্তর দেয় কেন গা? ওরা ঘরটা সারিয়ে, দু'চারখানা বাসন কিনে, কবরেজ ডেকে ওষুধ কিনে, তোমাকে একটু আরামে রাখতে পারে না?'

ভট্টচাজ্জমশায় মাথা চুলকে চুপ করে যান। নইলে বলেন, 'তুমি ভাব কেন মুক্ত? আমার ত কোন কষ্ট নেই। ঘরের এককোণা দিয়ে বিষ্টি পড়লে অন্য দিকে গিয়ে শুই। কাঁসারীরা মাঝে মধ্যে বাসন দেয় বটে, কিন্তু বাসন ত ঘরে থাকে না। বেটা নিধিরাম বলে—ও সব ভূতের কারবার। ভূতে বাসন নিয়ে যায়।'

ভট্টচাজ্জমশায় এত এত পুঁথি জানেন, তাঁর নামের পেছনে এত লম্বা লম্বা খেতাব থাকলে কি হয়, ভূতকে তিনি বড়ই ভয় পান। নিধিরাম তাঁর চাকর, সে যা বলে তাই শোনেন।

আজ, বাইরে রোদে বসে তিনি খুশী হয়ে বললেন—'ছাত্ররা কোথায়?'

ছাত্ররা তখন ডালে ডালে পাখীর ছানা ধরতে, পেয়ারা পাড়তে ব্যস্ত।

নন্দর মা বললে—'ওরা সব চরতে গেছে।'

'সে যাক গে!'

ভট্টচাজ্জমশায় পুরনো চাটাইয়ে এ পাশ ও-পাশ করে বললেন—'নন্দ কই? নন্দ আসবে না?'

'না। আসলে তার ঠ্যাঙ ভেঙে দেব।'

'সে কি! ঠ্যাঙ ভেঙে দেবে কি! নন্দ কি ফড়িং যে তার আবার ঠ্যাঙ গজাবে? মানুষের দেহ, বুঝলে মুক্ত, চরক বলছেন…'

'আর, থাম দেখি বাবা!'

নন্দর মা ঝনাৎ করে এঁটো বাসন নামিয়ে রেখে বললে—'ঠ্যাঙ ভেঙে দেব না ত কি করব বল? তোমায় বললাম এখানে বড় বড় লোক ধন্না দিতে আসে, ওকে একটা যজমানী দেখে দাও, তা যদি না দাও তবে ও আসবে কেন?'

'যজমানী করতে কি বলছ? আমি যে নন্দকে ভাল ভাল জিনিস সব শেখাচ্ছি গো! তোমায় বলি নি, কলকাতা থেকে পান্তা সায়েব এখনো খবর পাঠাচ্ছে আমাকে যাবার জন্যে?'

ওয়ারেন হেস্টিংস এখন কলকাতায় বড়লাট। কিন্তু সেই যে কবে, গল্প না সত্যি কে জানে, কান্ত মুদীর দোকানে পান্তা খেয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন বলে কথা আছে। সেই থেকে সৈদাবাদ, খাগড়া, কুঞ্জঘাটা, কাদাইএর মানুষ ওঁকে 'পান্তা সায়েব' ছাড়া কিছু বলবে না।

'যেতে বলছে, নিজে যাও না।'

'সায়েবের সংস্কৃত পণ্ডিতদের মান দেবার ইচ্ছে। আমায় যখন ডেকে পাঠালে, তখন ত আমার চোখ গেছে মুক্ত! এখন সায়েব বৃত্তি দিতে চায়। আরো কত কি। মান দিতে চায়। আমার বলতে গেলে জীবন গেছে, তোমার নন্দর যদি হয়, তা হলে মানুষ হয়ে যাবে।'

'না বাবা। ' গোরা সায়েবদের আমি দেখতে পারি না। ওদের হয়ে পূজো করতে গিয়েই নন্দর বাপ মরল।'

'আরে, নন্দর কুষ্টিতে দেখছ না ও মস্ত পণ্ডিত হবে!'

'পণ্ডিত হলে ত তোমার দশা হবে বাবা। নিধিরাম ক্ষীর খাবে, আর তুমি হবিষ্যি করে ভাঙা ঘরে পড়ে থাকবে।'

ভট্‌চাজমশায় আস্তে আস্তে বললেন, 'এ-কথাটা তুমি ঠিক বলেছ মা! আমি শুধু নিজের কথাই ভাবি। নন্দর এমন মাথা, ওকে সব বিত্তে দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে।'

'বেশী বিত্তেতে লক্ষ্মী নেই বাবা। এই দেখ না, মণ্ডলকর্তাকে। এদিকে ক অক্ষর গোমাংস। ওদিকে ফি-বছর দুর্গোৎসব বাদে সব পুজো করছে।'

ভট্‌চাজমশায় বসে বসে খুব ভাবতে লাগলেন।

এখন তিনি বুড়ো হয়েছেন, চোখেও দেখেন না। তা ছাড়া কলকাতায় যেতে তাঁর বড়ই অনিচ্ছে। কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীর নায়েব দেখে এসেছে, সে বলে গিয়েছে সুতোনুটিতে এই এত বড় বড় ইটের বাড়ী আর পাকা রাস্তা। সে বাড়ীতে ঢুকলে আর বেরোন যায় না। গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে মানুষ বর্ধমানে চলে যায়। সায়েবরা না কি টুলোপণ্ডিত দেখলেই টিকি ধরে টান মেরে বর্ধমানে পাঠিয়ে দেয়।

সুতোনুটিতে গেলে জাতও থাকে না। কিন্তু এবার তাঁর বড়ই বিপদ। পাস্তা সায়েব রাজ্যের সংস্কৃত পণ্ডিতদের ডেকে মান জানাচ্ছে, বৃত্তি দিচ্ছে। এত এত পুঁথি কিনছে। সেই পণ্ডিতরাই বলেছে, 'সে কি? বাংলাদেশে রামগতি হচ্ছেন পণ্ডিতদের মাথার মুকুট। তাঁকে আনেন নি?'

পাস্তা সায়েব তাই শুনে কান্তরাজাকে খবর দিয়েছে। এখন কান্তরাজা দু'বেলা জানাচ্ছে ভট্‌চাজমশায়কে যেতে হবে। তাঁর বড় ইচ্ছে, এই ঝি-এর ছেলে নন্দকে নিয়ে যান। ওর একটা ব্যবস্থা করে দেন।

কিন্তু নন্দর মা যা বললে তাও ত সত্যি।

অনেক ভেবে চিন্তে তিনি ঠিক করলেন নন্দকে বুঝিয়ে বলবেন, 'বাবা, এত কষ্ট করে তোমায় পণ্ডিত হতে হবে না। তার চেয়ে তোমায় একটা যজমানের কাজ ধরিয়ে দিই।'

নন্দ অবশ্য তাঁর কথা শুনলে না।

তার অনেক দিনের ইচ্ছে কলকাতায় যায় আর পাস্তাসায়েবকে বলে ভট্‌চাজমশায়ের মত এত এত লেখাপড়া শেখে।

ভট্‌চাজমশায় তার কথা শুনে মহাবিপদে পড়লেন। নন্দকে কি বলেন, তার মাকেই বা কি বলেন?

শেষে ভেবে চিন্তে বললেন, 'চল্ নন্দ, আরেক নন্দর কাছে যাই!'

কুশুঘাটার মহারাজা ত ভট্‌চাজমশায়কে কোথায় বসান, কি দিয়ে অভ্যর্থনা করেন, ভেবেই পান না।

ভট্‌চাজমশায় সব বলে টলে বললেন, 'দেখ ত দেখি, অনেক সময়ই ত আমাকে বিদায়ী দিতে চেয়েছ, এখন এই ছেলেটির সংসার যাতে চলে এমন কিছু করতে পার না কি?'

নন্দর বাবা তাঁর সেরেস্তায় পূজারী ছিল জেনে তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'খাতাঞ্চি কোথায়? আমার ত ব্যবস্থা করাই আছে, যে এখানে কাজ করতে করতে মরে যাবে বা অসুস্থ হবে, তার পরিবারে সিধে আর টাকা পাঠাতে হবে, ছেলে থাকলে কাজ দিতে হবে।···কি রে বেটা, এখানে কাজ করবি?'

খাতাঞ্চিরা সব ভয়ে তটস্থ। তারা ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। কোথায় কোন খেরো-বাঁধা খাতায় পতিতপাবন পূজারীর নাম লেখা আছে, তার খোঁজ পড়ল।

ভট্‌চাজমশায় মাথা চুলকে বললেন, 'বাবা, এখন নন্দর খুব লেখাপড়ায় মন, ওকে সেরেস্তায় বসাবে?'

'তা বেশ। ওর বাড়ীতে সিধে যাবে, ওর মা সংসার-খরচ একটি টাকা পাবে,·তাতে হবে ত?'

নন্দ ত চোখ তুলে আর চাইতেই পারে না।

'কলকাতায় যাবেন না কেন ভট্‌চাজমশায়? আপনাকে সম্মান জানাবে, এ ত ভাল কথা।'

'কিন্তু বাবা, সুতোনুটিতে গেলে যদি জাত যায়?'

'তারও ব্যবস্থা আছে। আপনি গঙ্গায় বসে কথা কইবেন।'

'পান্তা সায়েব আসবে ত?'

'নিশ্চয়। আপনি কম কিসে? আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না?'

এখন আর চাইবার কিছু রইল না। ভট্চাজমশায় 'জয়স্ত' বলে আশীর্বাদ করলেন। নন্দ দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম ঠুকলে।

মহারাজার গলার আওয়াজ পেল্লায় বাজখাঁই। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'যেতে হলে তাড়াতাড়ি যাবেন। আমার সঙ্গে আপনার পান্তা সায়েবের তেমন বনছে না। যে কোনদিন ঝগড়াঝগড়ি হতে পারে। তার আগেই ঘুরে টুরে আসুন।'

ভট্চাজমশায় বাইরে এসে বললেন, 'কেমন গলার আওয়াজ শুনেছিস? হবে না? রোজ নাকি একরতি করে সোনার গুঁড়ো খায়।'

একরতি সোনা! নন্দ অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে শুধু রাজবাড়ীর চূড়োটা দেখতে লাগল।

'পান্তা সায়েব কি এখনো পান্তা খায়?'

'নিধিরাম ত তাই বলে। নিধিরাম সব জানে ত।'

নন্দ ভেবে পেল না পান্তা সায়েব পান্তা খেয়ে কোন সাহসে ঐ লম্বাচওড়া পেল্লায় পুরুষের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাচ্ছে। কি গলার আওয়াজ! তার ওপর নিত্যি একরতি সোনা খাওয়া!

এরপর আর নন্দর মার বলবার কিছুই রইল না। আরো কিছুদিন গেলে পরে একদিন ভট্চাজমশায় আর নন্দ দু'জনে মহারাজের খাসনৌকো চড়ে কলকাতা রওনা হলেন।

নন্দর মা দুজনেরই কাপড়-চাদর ক্ষারে কেচে দিল। মাথায় তালপাতার ছাতা, বগলে পুঁথি, পায়ে চটি, ভট্চাজমশায় নৌকোয় গিয়ে বসলেন। নন্দর মা নন্দকে বলল, 'তোর মনে থাকবে না, তাই যা বলবার, সব কথা মনে পড়বে বলে ঐ সুতোয় গেরো দিয়ে দিয়েছি।'

সত্যি সত্যিই পান্তা সায়েব খবর পেয়ে নৌকোয়, ভট্চাজমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে এল।

ভট্চাজমশায় আগেই নন্দর কাছে শুনে নিলেন গঙ্গাতীরে সুতোনুটি কেমন দেখতে, নিধিরাম যে-সব গল্প করে, তেমনি বড় শহর কি না!

সায়েবদের কেল্লার চূড়োর কোম্পানীর নিশান দেখে তখন নন্দর দু'চোখ অবাক। সে ফিস-ফিস করে বললে, 'হাজার হাজার নৌকো! ঘাটে ঘাটে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ! মা গো, আশ্চর্য কাণ্ড।'

পান্তা সায়েব সেখানেই এল। সবাই তাকে বারণ করেছিল, কিন্তু সে হেসে বলল, 'ইনি এত বড় পণ্ডিত হয়ে এতটা আসতে পারলেন, আমি এটুকু যেতে পারব না?'

পান্তা সায়েবের খাস বজরায় পাল তোলা, সায়েবের হাতে আলবোলার কুরসি। একজন মুন্সী সায়েবকে সব কথা বুঝিয়ে দিতে লাগল।

সায়েবের মাথার চুল ফুরফুরে, গায়ে খাসা মুর্শিদাবাদের রেশমের জামা, সে বললে, 'আপনি এখানে টোল খুলতে চান?'

ভট্চাজমশায় বললেন, 'সে কি! কলকাতায় তোমরা গড় বেঁধে আছ, রাজ্য চালাচ্ছ, সে বেশ ভাল। কিন্তু এখানে লেখাপড়া করবার মানুষ কোথায়?'

'হবে, মানুষ হবে। এ শহরে একদিন অনেক মানুষ হবে, অনেক ছাত্র পড়বে।'

ভট্চাজমশায়ের তা বিশ্বাস হল না। কিন্তু সায়েব কি ভাববে ভেবে তিনি কিছু বললেন না।

'আপনাকে আমি কি দিতে পারি। কিসে আপনার সাহায্য হবে?'

'আমার? আমার ত কিছুই দরকার নেই। তবে এই ছেলেটি, এর নাম নন্দ, একে যদি পরে সংস্কৃত টোল খুলে দাও, বড় ভাল হয়। ছেলেটি বড় মেধাবী।'

'বেশ ত, তাই হবে।'

'ছেলেটি বড় গরীব।'

'বেশ ত, ওকে আমি বৃত্তি দেব।'

নন্দ এবার তার মা-র দেওয়া সুতোর গিঁঠ ধরে ধরে, মনে করে করে বললে, 'মা বলেছেন ভট্চাজমশায়ের ঘরের চালে খড় নেই, রান্নার বাসন নেই, সে-সব দিতে পারলে ভাল হয়। তাছাড়া নিধিরামটা বড় দুষ্টু। ওকে একটা দূর দেশে তাড়িয়ে দিলে খুব ভাল হয়।'

'সে কি!' ভট্চাজমশায়ের দুরবস্থার কথা শুনে পাস্তা সায়েব বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারপর তার মুন্সীকে বলল, 'ফিরে গিয়েই রাজা কান্তিচন্দ্রকে একটা চিঠি দিও। ওঁর মত এত বড় পণ্ডিত এমন কষ্ট করে থাকেন, এ ত ভাল কথা নয়।'

কিন্তু ভট্চাজমশায় রেগে টং।

'এ ছোঁড়া দেখছি ভারী ফিচেল। কে তোকে বলেছে এ-সব কথা বলতে, শুনি? ভট্চাজমশায়ের হ্যানো নেই, ত্যানো নেই!'

'মা যে বললে···মা যে আপনার কষ্ট দেখে নিত্যি দুঃখ করে!'

'দুঃখ করে? অ্যাঁ? মুক্ত আমার ঘরকন্না দেখে দুঃখ করে?'

ভট্চাজমশায় সায়েবের দিকে ফিরে বললেন, 'বাবা! মুক্ত, ওর মা হচ্ছে মায়ের জাত্, তাই দুঃখ করে। কিন্তু, বুঝলি রে নন্দ, তোমাকেও বলছি বাবা, ওর মা আমার চেয়েও কানা। তাই চোখে দেখতে পায় নি যে, আমার ঘরে অতুল ঐশ্বর্য ছড়াছড়ি যায়!'

সায়েব মুগ্ধ শ্রদ্ধায় অন্ধ ব্রাহ্মণের মুখের সৌম্য প্রসন্নতা, জীর্ণ গরদের ধুতি, ময়লা উপবীত দেখছিল।

'আমার ঘরে, বুঝলে বাবা, আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহের হাতের লেখায় 'উজ্জ্বল নীলমণি'র পুঁথি রয়েছে। স্বয়ং প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী, বুঝলে ত? মহাপ্রভুর শিষ্য, বৈষ্ণব পণ্ডিত, বইয়ের লেখক, তিনি সেটি স্বহস্তে শুধরে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া আমার পিতামহ যখন গিয়ে কাশীর পণ্ডিতদের তর্কে হারিয়েছেন, কাঞ্চীপুরমের রাজা তাঁকে একটি পেটিকা বোঝাই পুঁথি দেন, তা-ও

আমার ঘরে রয়েছে। তা ছাড়া, আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহ নীলাচল থেকে তামার কৌটোয় মহাপ্রভুর পায়ের ধূলো এনেছিলেন, এর কোন জিনিসটি বাংলাদেশের কোন্ রাজা, অথবা ধর তোমারই ঘরে আছে কি?'

'না।'

'এ জিনিসের দাম সোনায় রূপোয় হয়?'

'না। সোনায় রূপোয় এর দাম হয় না।'

অন্ধ ব্রাহ্মণ সরল আবেগে বলতে লাগলেন, 'সবাই বলে তোমরা নাকি দেশের যত সোনা, যত রূপো, সব নিয়ে যাচ্ছ। আমি বলি ওরে, তাতে তোরা গরীব হবি ঠিকই, কিন্তু আরো সম্পত্তি আছে রে, আমার মত অনেকের ঘরেই আছে।'

চোখ মুছে বললেন, 'কেউ বিশ্বাস করে না বাবা। তালপত্র, যা দেখ সর্বত্র পাওয়া যায়, আর লোহার শলা, খাগের কলম, হীরেকষের কালি—এ থেকে যে সম্পত্তি হয় তা কেউ বিশ্বাস করে না।'

'আপনাদের জাত নিজেদের কি আছে তা জানে না।'

'আর বাবা, আমার ঘরে দিব্যি দক্ষিণের বাতাস আসে, দক্ষিণে নিমগাছ আছে, 'দক্ষিণে নিম্বতরু' চরক বলছেন তার বাতাস বড় উপকারী। ঐ স্বাস্থ্যকর বাতাসটি পাই, তা ছাড়া নন্দদের সৈদাবাদ-খাগড়া থেকে আমাদের কাদাইয়ের পথে, ডুমুরগাছ প্রচুর। মুক্ত ডুমুরের ঝোল রাঁধে, ব্রাহ্মী শাক, যাতে মস্তিষ্ক ভাল থাকে, তা ভেজে দেয়, কলাপাতায় খাই, কবরেজ বলেছিল একটু গাওয়া ঘি খেতে, তা হলে চোখ দুটো বাঁচত। আমি বলি চোখ গেছে ত কি হয়েছে? এক নন্দ বিনে আমার ত অন্য ছাত্র নেই।'

'ছাত্র নেই?'

'আছে বাবা। সেগুলো ছেলে নয়, পিলে, বাতশ্লেষ্মা, দন্তশূল, অতি চঞ্চল সব। দিনেরাতে গাছে গাছে ঘোরে! এক নন্দটারই মন আছে। তা ওকে আমি স্মৃতি থেকেই সব শেখাতে পারি।'

'তাই না কি?'

'নিশ্চয়।'

এবার ভট্‌চাজ্জিমশায়ের গর্ব হল। বুকটি ফুলিয়ে বললেন, 'সহস্রাধিক পুঁথি আমার কণ্ঠস্থ বাবা। গরীব পণ্ডিতের ছেলে, মিথিলায় বল, কাশীতে বল, আচার্যরা পুঁথি দেখতে দিতেন না। সব আমরা মুখস্থ করতেই শিখেছিলাম।'

'ধন্য আপনি! সত্যিই আপনি বাংলার গৌরব!'

পান্তা সায়েব মুগ্ধ হয়ে বললেন, 'জানেন, আমার মনে একটা মস্ত স্বপ্ন আছে।'

'কি বাবা ?'

'আপনাদের মত পণ্ডিতদের ডেকে এনে তাঁদের কাছ থেকে সব বই-এর নকল করিয়ে নিই, ন্দুদের যত সব আইন-কানুন আছে, ওদিকে আইন-ই-আকবরীর নকল করাই, অনুবাদ করাই, তারপর এমন একটা জায়গা করে দিই, যেখানে ভারতবর্ষের আর এশিয়ার সব দেশ দেশান্তের শাস্ত্র-চর্চা হয়, পুঁথি রাখা হয়। এ কাজে পণ্ডিতদের এনে লাগাই। সবাই আপনার ধাতুতে গড়া নয় পণ্ডিতমশায়, তাঁদের সুখসুবিধে সচ্ছলতাও দরকার।'

'তা ত নিশ্চয়ই। তৈল-তণ্ডুল নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কি শাস্ত্রচর্চার কাজ হয় ?'

'আমি যে জানি, আপনাদের ভাগবদ্‌গীতা এক মহৎ গ্রন্থ। হয়ত একদিন পৃথিবীর লোক ইংরেজী ভাষা ভুলে যাবে, তবু গীতার ভাষা ভুলবে না !'

'তুমি বলছ ! অ্যাঁ ?'

'হ্যাঁ, বলছি বই কি !'

'তা বটে, গঙ্গাবক্ষে দাঁড়িয়ে কি আর তুমি মিথ্যে বলবে ? অ, তুমি ত আবার গঙ্গা মান না।'

গঙ্গা মানেন না ? ওয়ারেন হেস্টিংসের হাসি পেল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সরলতা দেখে নিজেকে যেন ছোটও মনে হল। গঙ্গা মানেন না ? এই গঙ্গার ধারে তাঁরা সিরাজকে পরাজিত করেছেন, এই গঙ্গার তীরে নতুন সাম্রাজ্য গড়ছেন, গঙ্গা মানেন না ?

'খুব ভাল নদী,' তিনি আস্তে বললেন।

'তোমাকে আমার যে দেখতে ইচ্ছে করছে বাবা ! যবন হয়ে দেবভাষার ওপর এমন টান, আ হা হা হা, চোখটি থাকলে তোমায় দেখতাম !'

'তবে, আপনি এখানে থাকবেন না ?'

'না না,' ভট্‌চাজমশায় ব্যস্ত হয়ে ঘাড় নাড়লেন, 'এখানে শুনেছি তোমরা আচার-নিয়ম মান না, মানুষ পয়সার দাপে ভিখিরী কাঙালীকে পয়সা দেয় না, তা ছাড়া মানুষ কালীঘাটে, চিত্রেশ্বরীতে, দেবতাকে নিয়েও ব্যবসা করে। এখানে থাকলে আমার গলা দিয়ে ভাত গলবে না বাপু !'

এখন চলে যাবার সময় হল। দুটি নৌকো এবার তফাতে যাবে। বাংলার প্রথম কোম্পানী-লাট ওয়ারেন হেস্টিংস আর বৃদ্ধ, অন্ধ গরীব ব্রাহ্মণ রামগতি ভট্টাচার্য দুজনেই দুজনকে শুভেচ্ছা জানালেন।

হঠাৎ, নন্দর মাথায় কি ভূত চাপল কে জানে ! সে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করে বসল, 'আচ্ছা, এখনো কি আপনি পান্তা খান ?'

'পান্তা ? হোআট ইজ দ্যাট ?'

ভট্টাচার্যমশায় তাড়াতাড়ি বললেন, 'বাবা, ও বালক, ওর কথা তুমি শুনো না। আমাদের দেশে একটা কথাই আছে, কান্তমুদীর দোকানে পান্তা খেয়ে ···'

পান্তা সায়েবের হাসি আর থামতে চায় না।

সে বললে, 'বালক, ছেলেরা আমার নামে গান বেঁধেছে জানি,

হাতীপর হাওদা আর ঘোড়াপর জিন্

জলদি যাও জলদি যাও ওআরেন হেস্টিন!

কিন্তু পান্তা খাওয়ার গল্প?'

সে হাসতে হাসতে বজরায় গিয়ে উঠল। হাত তুলে বলল, 'বয়, যদি হোআট ইজ ট্রু, তা জানতে চাও, তা হলে বী এ ভেরি ভেরি গুড স্টুডেন্ট অফ্ গ্রেট ভট্টাচারিয়া! পরে আমার কাছে যখন চাকরিতে আসবে তখন জানতে পারবে।'

নন্দর প্রশ্নের জবাব আর মিলল না।

ভট্চাজমশায় বললেন, 'বাব্বাঃ, খুব বেঁচে গেছি। বুঝলি নন্দ। কোম্পানীর লাট ত? আমাকে একটু নরম হতে দেখলেই সোনার মোহর টোহর দিয়ে বসত আর কি! নে, তোর সব ব্যবস্থাই ত হল? এখন ব্যাকরণ আর অলঙ্কারটা শিখিয়ে, তোকে চাকরিতে জুড়ে দিতে পারলে আমার মুখটা থাকে। আর চার-পাঁচটা বছর কি বাঁচব না?'

তাঁদের নৌকো মুখ ফিরিয়ে আবার মুর্শিদাবাদের দিকে চলল। এখন তাঁদের খিদে পেয়েছে। নন্দর মার দেওয়া চিড়ে-বাতাসা কোঁচড়ে নিয়ে ভট্চাজমশায় মাথায় জল থাবড়ে কুটুর কুটুর করে খেতে লাগলেন। নন্দ দেখল তাঁর মুখে রোদ চিকমিক করছে, মাথায় ভিজে গামছা পাট করে দেওয়া। এখন মনে হল তিনি সকলের চেয়ে বড়, কুঞ্জঘাটার মহারাজা কান্তরাজা, পান্তাসায়েব, সকলের চেয়ে অনেক বড়, যেন দুর্গা প্রতিমার মাথার উপর শিবঠাকুরের মত সবার উঁচুতে ওঁর জায়গা।

'ঠিক দেবতাদের মতন', সে মনে মনে বলল। তারপর হঠাৎ কি মনে হতে বলল, 'ও ভটচাজ-মশায়, সায়েব যে আপনার হাঁটু ছুঁয়ে বলল—এবার আসি। তাতে দোষ হল না!'

'দূর বোকা, গঙ্গাবক্ষে, বৃহৎকাষ্ঠে দোষ নেই। শোন না, রামায়ণে কি বলছে···'

ভট্চাজমশায় নন্দকে রামায়ণের গল্প বলতে লাগলেন। গঙ্গার বুকে হাজার হাজার রোদের টুকরো নাচছে। দেখতে দেখতে সুতোনুটি দূরে চলে যেতে লাগল, অনেক দূরে।

১৩৭২

শ্রীঅমরনাথ রায়

সুইডেন দেশ। রাজধানী তার ষ্টক্‌হলম। এই ষ্টক্‌হলম শহরেই জন্মগ্রহণ করেন আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল। জন্মদিন ২১শে অক্টোবর, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ। নোবেলের বয়স তখন চৌদ্দ বছর মাত্র। এই অল্প বয়সেই নোবেলের বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ প্রবল।

এই বছরই নাইট্রোগ্লিসারিন আবিষ্কৃত হলো। আবিষ্কার করলেন ইটালী দেশের একজন বৈজ্ঞানিক। নাম তাঁর সোব্রেরা। নাইট্রোগ্লিসারিন হলো হলদে রঙের এক রকম তরল রাসায়নিক দ্রব্য—ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ। একটু নাড়াচাড়া বা একটু গরম করলেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যায়।

বালক নোবেল শুনলেন এই আবিষ্কারের কথা। দেখলেন জিনিসটি, মনে মনে সংকল্প করলেন: আমিও আবিষ্কার করব এমনি কোন বিস্ফোরক পদার্থ। অল্প বয়সেই নাইট্রোগ্লিসারিন নিয়েই গবেষণা শুরু করলেন নোবেল। গবেষণা করতে গিয়ে অনেকবার তাঁর জীবন বিপন্ন হলো। তবুও আশা ছাড়লেন না তিনি।

আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল

একদিন এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। কোনও এক রেল স্টেশনে পড়ে ছিল এক বাক্স নাইট্রোগ্লিসারিন। রাতের ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে তার আয়তন গিয়েছিল বেড়ে। ফলে বাক্সটি গেল ফেটে।

ভোরবেলায় এক কুলীর নজরে পড়লো ঐ ফাটা বাক্সটি। কুলী মতলব আঁটলো—পেরেক মেরে বাক্সটিকে সে ঠিক করবে। সে নিয়ে এলো পেরেক আর হাতুড়ী। বাক্সের ওপর পেরেক রেখে বসালো হাতুড়ীর ঘা। বুম্……

পলকে প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। ভীষণ শব্দে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটলো। রেল স্টেশনের খানিকটা গেল উড়ে। মারা গেল কয়েকজন লোক।

এমনি ভয়াবহ বিস্ফোরক দ্রব্য নাইট্রোগ্লিসারিন নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এমনি-ভাবেই একদিন ধ্বংস হয়ে গেল নোবেলের গবেষণাগার ; কিন্তু ভাগ্যক্রমে নোবেল গেলেন বেঁচে। তবুও আশা তিনি ছাড়লেন না। নতুন উদ্যমে আবার তিনি গবেষণা আরম্ভ করলেন।

আর একটি ঘটনা।

নোবেলের এক সহকর্মী একদিন কয়েক বোতল নাইট্রোগ্লিসারিন প্যাক করছেন। বিদেশে পাঠাতে হবে। হঠাৎ হাত ফস্কে একটি বোতল পড়ে যায় মেঝেতে। মেঝেতে ছিল বালি, বালির ওপর পড়েও বোতল যায় ফেটে। সবাই তো ভয়ে অস্থির। এখনই হয়তো ঘটবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সব।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, বিস্ফোরণ ঘটলো না। নোবেল ভাবলেন—বোতলে হয়তো নাইট্রোগ্লিসারিনের বদলে আছে অন্য কিছু। তখনই ফাটা বোতলের মধ্যেকার জিনিস পরীক্ষা করলেন নোবেল। দেখা গেল—অন্য কিছু নয়—ওটা নাইট্রোগ্লিসারিনই। তবে?

আবার পরীক্ষা চালালেন নোবেল। তিনি দেখলেন যে বালির সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসারিন মিশলে তা জমাট বেঁধে কঠিন হয়। ফলে নাইট্রোগ্লিসারিন নাড়াচাড়া করার পক্ষে বেশ নিরাপদ হয়। নোবেল তখন সিদ্ধান্ত করলেন : যে জিনিসের শোষণ করার ক্ষমতা আছে তা নাইট্রোগ্লিসারিনের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে ইচ্ছেমত বিস্ফোরণ ঘটানো যায়। এই সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে নোবেল আরও পরীক্ষা চালালেন।

'কিসেলগার' হলো এক রকম সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত বেলে পাথর। নোবেল নাইট্রো-গ্লিসারিনের সঙ্গে কিসেলগার মিশিয়ে দেখলেন যে, নাইট্রোগ্লিসারিন বেশ কঠিন হয়েছে। নাড়াচাড়া করারও বেশ সুবিধে। শুধু তাই নয়, এতে নাইট্রোগ্লিসারিনের বিস্ফোরণ-শক্তিও কমে নি।

এইভাবে নাইট্রোগ্লিসারিনের সঙ্গে কিসেলগার মিশিয়ে এক নতুন বিস্ফোরক দ্রব্য

তৈরি করলেন নোবেল। তার নাম দিলেন তিনি 'ডিনামাইট'। সেটা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ। ছেলেবেলায় নোবেল যে সংকল্প করেছিলেন তা সিদ্ধ হলো।

দেখা গেল ঐ নতুন বিস্ফোরক দ্রব্য 'ডিনামাইট' খুবই শক্তিশালী। এর সাহায্যে পাহাড়-পর্বত উড়িয়ে দেওয়া যায়—পাহাড়ের ভেতর সুড়ঙ্গ তৈরি করা যায়।

এত বড় একটা আবিষ্কারের জন্যে নোবেলের নামে চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন নোবেল। ডিনামাইট থেকে প্রচুর অর্থও পেলেন তিনি। কিন্তু অর্থের অপব্যয় করেন নি নোবেল। নিজের সঞ্চিত অর্থ থেকে তিনি ১৭,৫০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২,৪০,০০,০০০ টাকা দিলেন সুইডেনের নোবেল সমিতির হাতে। শর্ত হলো—সমিতি ঐ টাকা খাটিয়ে যে সুদ পাবে তা থেকে প্রতি বছর পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হবে। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন-বিদ্যা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং আন্তর্জাতিক শান্তি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে অসামান্য যাঁদের দান তাঁরাই ওই পুরস্কার পাবেন। পুরস্কারের মূল্য বর্তমানে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। মহানুভব আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল-এর নাম অনুসারে ঐ পুরস্কারের নাম রাখা হলো 'নোবেল পুরস্কার'। আজকের দিনে 'নোবেল পুরস্কার' পাওয়া মানে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করা।

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এই নোবেল পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাহিত্যে তাঁর অসামান্য দানের জন্যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পুরস্কার পান। পদার্থ-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য আর একজন ভারতবাসী এই নোবেল পুরস্কার পান। তিনি হলেন বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন। সেটা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দর কথা।

বিজ্ঞানী নোবেল ছিলেন শান্তিকামী। তিনি চান নি যে তাঁর 'ডিনামাইট' ধ্বংসের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হোক—মানুষের অকল্যাণ করুক। ডিনামাইট শুধু মানব-জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হবে—এই ছিল তাঁর আশা। তিনি শান্তি মনে-প্রাণে কামনা করতেন বলেই তো রেখে গেছেন বিশ্ব-শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ৬৩ বছর বয়সে মহানুভব নোবেল দেহত্যাগ করেন কিন্তু আজও তিনি অমর হয়ে আছেন এবং অমর হয়েই থাকবেন চিরকাল।

শ্রীনিখিল সেন

খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরল কি সেক্ পোক।

কতটুকু বা বয়স। এখনো পুঁচকে ছেলেমানুষ। দু'গাল বেয়ে তার চোখের জল ঝরতে লাগল দরদর ধারায়।

ঘরে লাকড়ি ছিল না। কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল সে বনে। কিন্তু বনে কাঠ কুড়ানও অপরাধ! দেশের শত্রু লি সিউঙ ম্যানের পুলিস তাকে ধরে তাই মেরেছে নিষ্ঠুরের মত।

ভাঙা কুঁড়েটার দাওয়ায় বসে ঠাকুরমা ছটফট করছিলেন নাতির জন্যে। বুড়ী আবার চোখে পায় না দেখতে।

নাতির পায়ের শব্দ শুনে ঠাকুরমা বলে উঠলেন, 'কি দাদা, কাঠ পেলি?'

কি সেক্ পোক তখন কাঁদতে কাঁদতে সব ঘটনাটা বললে ঠাকুরমাকে।

বুড়ী ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। তারপর চুপি চুপি বলল, 'ছাড়া পেলে শেয়ালগুলো অমন দাঁত খিঁচোয় বই কি! মেরে ফেলতে যখন পারবি নে, ওদের পেছন না নিলেই পারিস।'

'আমি নাই বা পারলাম,' ফোঁস করে উঠল কি সেক্ পোক। চোখের জলটা মুছে নিয়ে বলল, 'কিন্তু ইল এন-দা মেরে কত সাবাড় করে দিলে।'

ইল এন কি সেক্ পোকের বড় ভাই, সে গেরিলা যোদ্ধা। ঘরে থাকে না। মিশমিশে অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির রাত্রে কোনদিন হয়ত বা এল। আপাদমস্তক বর্ষাতিতে তার ঢাকা। পায়ে

বুট ; গায়ে খাকি সামরিক পোশাক। পিঠে ঝুলান টমিগান। হাতে থাকে বাঁধাকফি বা শালগম, কোন দিন হয়ত বা পাহাড়ী নদী থেকে ধরা মাছ। ইল এন এসে ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে, ঠাকুরমাও ফেটে পড়েন খুশিতে। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে ইল এন এসে শোয় তাঁর পাশে 'ক্যানের' মধ্যে, আর বলতে থাকে গেরিলাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কথা—দেশদ্রোহী লি সিউঙ ম্যানের ফৌজ আর পুলিসের বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়ান দেশভক্তদের অসীম দুঃসাহসের গল্প।...

কি সেক্ পোক কান খাড়া করে শোনে। শুনতে শুনতে বুক তার গর্বে ফুলে ওঠে, দম আসে বন্ধ হয়ে। দুঃখও হয়। সে যদি দাদাদের মত বড় হোত! প্রতিশোধ নিত সেও পিতৃহত্যার। লি সিউঙ ম্যানের সেপাইরা ঠিক যমদূতের মত এসে বাপকে তার নিয়ে গিয়েছিল ধরে। তারপর ঐক গাছের ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে তাকে ফাঁসি দিয়েছিল। সে প্রায় বছর খানেক হোল।

সেদিনকার কথা এখনো তার মনে আছে। চোখের উপর ভেসে ওঠে অদ্ভুত পোশাক-পরা লম্বা সেই লোকটার হিংস্র মুখখানা। ওই তো তার বাবাকে ফাঁসি দিতে হুকুম দিয়েছিল। তাদের কোরীয় ভাষা লোকটা জানে না। গাছতলায় নিয়ে গিয়ে ফাঁসির দড়িটা যখন তার বাপের গলায় পরিয়ে দিচ্ছিল, তখন লোকটা কি যেন সব বললে বিদেশী ভাষায়। দোভাষী তা গাঁয়ের সবাইকে বুঝিয়ে দিলে ; বললে, 'গেরিলাদের যারা সাহায্য করবে, এমনি করে তাদের মরতে হবে।'

বুড়া ঠাকুরমা তখন কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসেছিলেন। বিদেশী ওই অফিসারটার পায়ের উপর আছড়ে পড়ে অনুনয় করেছিলেন, এবারকার মত বাবাকে যেন প্রাণে রেহাই দেয়। কিন্তু লোকটা অমন করে পা ছুঁড়লে, ঠাকুরমা ছিটকে পড়লেন দূরে। বিদেশী অফিসারটার হাতে ছিল রূপোমোড়া একটা ছড়ি। ছড়িটা সে ঠাকুরমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। সাঁ করে গিয়ে লাগল ঠাকুরমার চোখে। চোখ ফেটে ঠাকুমার ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। সেই থেকে তিনি দেখতে পান না চোখে, অন্ধ হয়ে গেছেন।

বিদেশী সেই অফিসারটার বাজখাঁই গলা এখনও তার কানে লেগে আছে। ওই তো জল্লাদকে হুকুম দিয়েছিল তার বাপকে ফাঁসি দিতে। ছড়ির খোঁচা দিয়ে অন্ধ করে দিয়েছিল তার ঠাকুরমাকে।

সে তা ভুলে কি করে? সে কি ভুলবার মত ঘটনা!

একদিন সবেমাত্র ভোর হয়েছে, গাঁয়ে এমন সময় খবর এল : লি সিউঙ ম্যানের সৈন্যরা সব যুদ্ধে হেরে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। উত্তর কোরিয়ার বীর যোদ্ধারা ওদের তাড়া করেছে দক্ষিণমুখো। কথাটা কি সেক্ পোকও শুনল। সে তখন ছুটে গিয়ে বাপের বাঁশের ছড়িটা নিয়ে এল। ছড়িটাকে সে ভেঙে সমান দু' টুকরো করে নিলে। ঠাকুরমার কাছ থেকে এক টুকরো লাল সিল্কের ন্যাকড়া চেয়ে নিয়ে সে ছোট ছোট দুটি লাল ঝাণ্ডা বানালে।

উত্তর কোরিয়ার গণ-বাহিনীর প্রথম পল্টনকে যখন মার্চ করে আসতে দেখা গেল, কি সেক্ পোক তখন করল কি, সে তাদের কুঁড়ের চালায় উঠে ছোট ছোট সেই লাল ঝাণ্ডা দুখানা দোলাতে লাগল, আর গ্রামবাসীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চীৎকার করতে লাগল—'ম্যানস্ মুগ্যান কিম্ ইল্ সুঙ্!'*

গণ-বাহিনী এসে পড়ার কিছুদিন পর ইল এন গাঁয়ে ফিরে এল। সে কৃষক-সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হোল। কৃষকদের মধ্যে সে যখন জমি বিলির তদারক করত, কি সেক্ পোকের ছোট বুকখানা তখন আনন্দে নেচে উঠত। দাদাকে তার গাঁয়ের সবাই কত মান্য করে, ভালবাসে অমন। জমি বিলির ব্যাপারে তার দাদার ন্যায়-বিচারের কত তারিফ করে সবাই।

বুড়া ঠাকুরমা চোখে দেখতে পান না। তবু তিনি আপন মনে বিড়-বিড় করতে থাকেন, 'আমার চোখ নেই রে, তবু দেখতে পাচ্ছি, গাঁয়ের প্রতি ঘরে ঘরে কি সুখ-শান্তিই না ফিরে এসেছে!'

কিন্তু বেশি দিন এই সুখ-শান্তিতে থাকা গেল না। আবার সাম্রাজ্যবাদী বর্গীরা এসে বাদ সাধল। লি সিউঙ ম্যান এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের ওরা লেলিয়ে দিলে উত্তর কোরিয়ানদের বিরুদ্ধে। সারা দুনিয়ায় সঙ্গে সঙ্গে প্রচারও করলে: আসল আক্রমণকারী হোল উত্তর কোরিয়া। আর ওদের ঠেকাতে বিদেশী যুদ্ধবাজরা উত্তর কোরিয়ায় পাঠাতে লাগল লাখে লাখে সৈন্য-সামন্ত, বোমারু বিমান আর তাদের সেরা নৌ-বহর। তাদের কোপানলে পড়ে কোরিয়ার কত শত গ্রাম-নগর বোমার আগুনে পুড়ে খাক হয়ে গেল, কত অসহায় শিশু প্রাণ হারাল—কত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ধরণীর বুক থেকে! চারদিকে পড়ে গেল হাহাকার!

কি সেক্ পোকের গাঁয়েও পিটুনী পুলিস এসে তাঁবু গাড়ল। গ্রামবাসীদের সবাইকে ওরা ধরপাকড় করতে লাগল। এনে জড়ো করতে লাগল পুরানো সেই গাছটার নীচে যার ডালে কি সেক্ পোকের বাপকে একদিন ওরা ফাঁসি দিয়েছিল। গাঁয়ের লোকেরা তো ভয়েই অস্থির! তাদের লক্ষ্য করে ঢেঙা মত একজন অফিসার বলে উঠল, 'কমিউনিস্টদের কে কে তোমরা অভিনন্দন করেছিলে, বল। কই, কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

সবাই চুপ। কোনো কথা নেই কারো মুখে। লি সিউঙ ম্যানের এক প্রাক্তন পুলিস তখন এগিয়ে এল। ইতিপূর্বে সে গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছিল। বিদেশী সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এসেছে। বিদেশীরা ওই দেশদ্রোহীটাকে মোড়ল করে দিয়েছে গাঁয়ের। ওরই কথামত সেপাইরা গ্রামবাসীদের গুলি করে মারে।

পুঁচকে কি সেক্ পোককেও ওরা পাকড়ে এনেছে। ভিড়ের মধ্যে মিশে সে কটমট করে তাকাচ্ছিল ওই মোড়লটার দিকে। মোড়লের চোখ গিয়ে পড়ল তার উপর। ইল এন-এর কথাও

* লক্ষ বছর বেঁচে থাক কিম্ ইল্ সুঙ্ (উত্তর কোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী)।

তার মনে পড়ে গেল। ইম এন তার প্রকাণ্ড বাড়িখানাকে দখল করে তাদের কৃষক-সমিতির সদর দপ্তর বানিয়ে তুলেছিল। জমিগুলো তার দিয়েছিল বাজেয়াপ্ত করে আর জোয়ান জোয়ান তার দশটা বলদ ধরে নিয়ে গিয়েছিল জনসাধারণের ব্যবহারের জন্তে।

মোড়ল তা ভোলেনি। কি সেক্ পোকের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে সে প্রতিহিংসার কুটিল হাসি হাসলে।

'হুজুর, এই ছোড়াটার ভাই এখানকার সব কমিউনিস্টদের নেতা।' বলে হাতের ছড়িটা দিয়ে সে কি সেক্ পোককে দেখিয়ে দিলে অফিসারকে। আরও বললে, 'এই তো প্রথম কমিউনিস্টদের লাল ঝাণ্ডা দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, হুজুর!'

'তাই নাকি ?' অফিসারটা তাকাল কি সেক্ পোকের দিকে। তারপর গর্জে উঠল, 'এই ছোড়া, এদিকে আয় !'

কি সেক্ পোকের বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। ভয়ে কচি মুখখানা হয়ে গেল সাদা ফ্যাকাশে। সে একবার ইতস্ততঃ করলে। তারপর দৃঢ়পদে অফিসারটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে মাথা উঁচু করে।

'লাল ঝাণ্ডা তুই কেমন করে ওড়ালি দেখা তো ?' অফিসারটা তাকে শুধালে। মুখে ঠোঁটে তার কুটিল হাসি।

কি সেক্ পোক অমনি দিলে এক ছুট্। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বাড়ি এসে বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা লাল ঝাণ্ডা দুটো কুড়িয়ে নিলে। তারপর তা নিয়ে অফিসারটার সামনে এসে হাজির হোল। বললে, 'এমনি করে উড়িয়েছিলাম।'...

লাল ঝাণ্ডা দুটো সে মাথার উপর তুলে ধরলে। তারপর ফুস্ফুস্ ফুলিয়ে চীৎকার করে উঠল, 'ম্যানস্থ মুগ্যান কিম্ ইল্ সুঙ্ !'

ভীড়ের মধ্য থেকে একটা চাপা আর্তনাদ শোনা গেল। বোকা ছোড়াটার পরিণাম ভেবে সবাই হায় হায় করে উঠল।

অফিসারটা চাপা ক্রোধে ঠোঁট কামড়ালে ; বললে, 'এ দুটো ছাড়া লাল ঝাণ্ডা আর নেই এ তল্লাটে ? আমি এ দুখানার ব্যবস্থা করছি।'

অফিসারটা সৈন্যদের দিকে ফিরে দাঁড়ালে। আদেশ দিলে, 'ছোড়াটার হাত দুখানা কেটে নাও !'

এটি উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের ৪ঠা অক্টোবরের কথা। ঘটনাটি ঘটেছিল উত্তর কোরিয়ার ছুন্ছন এলাকায়।

সূর্য তখন মুঠি মুঠি সোনালি রোদ ছড়াচ্ছিল ; বনের গাছপালাগুলো মর্মরিত হচ্ছে ঝিরঝিরে হাওয়ায় ; পাহাড়ী নদীটি কুল-কুল করে বয়ে চলেছে আপন মনে। আর তারই পাশে গাছের একটা গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা বছর নয়েকের একটা ছোট ছেলে। নিঃসাড় মাথাটা ঝুলে পড়েছে তার বুকের উপর। কনুই পর্যন্ত হাত দুখানা তার কাটা। চুইয়ে চুইয়ে তখনও রক্ত ঝরছে নীচে—বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা দুটি লাল ঝাণ্ডার ঠিক উপরটায়।......

১৩৫৮

রবিবার। সকালবেলা হাসুবাবু তার বাড়ীর ল্যাবোরেটরীতে বসে কেমিষ্ট্রীর হরেক রকম ম্যাজিক দেখাচ্ছিল আর চন্দ্রভানু, তুতুল, লবু, কুশু, অপু, তপু ওরা সবাই অবাক হয়ে তাই দেখছিল। হাসুবাবু বলল—আপনারা সবাই দেখুন, এইবার আমি এই লাল জলকে নীল করে দিচ্ছি। হাসুবাবু লাল জলকে নীল করতেই ওরা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো।

এমনি সময়ে ঘরে এসে ঢুকলেন ছোটমামা। উনি কেমিষ্ট্রীর প্রফেসর। ছোটমামাকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাসুবাবু, চন্দ্রভানু, সবাই ঘিরে ধরলো—মামা, আমাদের ভালো ভালো কেমিষ্ট্রীর ম্যাজিক দেখাতে হবে।

ছোটমামা হেসে বললেন—আচ্ছা দেখাচ্ছি।

হাসুবাবু বললো—শুধু দেখালেই হবে না মামা, কি ক'রে ম্যাজিকটা করছো তাও শিখিয়ে দিতে হবে।

মামা বললেন—নিশ্চয়ই দেব।

ছোটমামা কেমিক্যাল ম্যাজিক দেখানোর জন্য সাজসরঞ্জাম জোগাড় করতে বসলেন। উনি যে মজার মজার খেলাগুলো দেখিয়েছিলেন এখানে তার কথা বলা হচ্ছে।

আগুনের উপরে লেখা—ছোটমামা দশগ্রাম পটাসিয়াম নাইট্রেটকে পঁচিশ সি সি. জলে গুললেন। তারপর তিনি একটা সাদা পুরু শক্ত কাগজের উপর তুলি দিয়ে দ্রবণের সাহায্যে বেশ মোটা মোটা হরফে লিখলেন 'কেমিক্যাল ম্যাজিক—স্বাগতম্।' তারপর তিনি ল্যাবোরেটরীর সব জানালা-দরজা বন্ধ করে তার হাতের সিগারেটটা দিয়ে ঐ কাগজের এক কোণে আগুন লাগালেন। আর কি আশ্চর্য, কাগজটা পোড়াবার সঙ্গে সঙ্গে কি সুন্দরভাবে ঐ কথাগুলি ফুটে উঠলো! ছোটমামা বললেন—অন্ধকার ঘরে এই খেলা খুব ভালো হয়।

রক্তের ছাপ—ছোটমামার দ্বিতীয় খেলাটিও খুব মজার। একটা ছোরা নিয়ে সেটা হাতের পিছন দিকে ছুঁয়ে দিতেই—হাতের পিছনটা রক্তে লাল হয়ে গেল! আসলে কিন্তু খেলাটি খুবই সহজ।

পাঁচ গ্রাম পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট ও পাঁচ গ্রাম ফেরিক ক্লোরাইডের ভিতর সামান্য জল দিয়ে ছোটমামা দু'টো আলাদা সংপৃক্ত দ্রবণ তৈরি করলেন। তারপর তিনি একটা ছোরা নিয়ে সেটাকে পটাসিয়াম—থায়োসায়ানেটের ভিতর ডোবালেন। আর হাতের পেছনে লাগালেন ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ। এরপর ছোরাটা হাতের পিছনে লাগাতেই ফেরিক আয়ন পটাসিয়াম থায়োসায়ানেটের সাথে ক্রিয়া করে রক্তের মতো লাল রং সৃষ্টি করলো। এটি খুবই ভাল খেলা এবং সেই সঙ্গে ফেরিক আয়রণ উপস্থিতির একটি সুন্দর পরীক্ষা।

ঠাণ্ডা আগুন—ছোটমামার এই খেলা দেখে অপু, তপু আর চন্দ্রভানু আনন্দে ডিগবাজী খেয়েছিল! ছোটমামা ডান হাতের তালুর উপর একটি রুমাল দু' ভাঁজ ক'রে রেখে তার উপর পনের সি.সি. কার্বন-ডাই-সালফাইড ও দশ সি. সি. কার্বন-টেট্রা-ক্লোরাইডের একটি মিশ্রণ রাখলেন। হাসুবানু এসে এক টুকরো কাগজ পুড়িয়ে মিশ্রণটির উপর ধরতেই সেটা জ্বলতে আরম্ভ করলো। আগুনের শিখাটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে জ্বললো—কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার রুমালটির কিছুই হ'লো না বা হাতও পুড়ে গেল না। চন্দ্রভানু জিজ্ঞাসা করলো—মামা রুমালটা পুড়ে গেল না কেন? মামা বললেন—মিশ্রণটি খুব তাড়াতাড়ি বাষ্পীভবনের দরুন ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে এটি সম্ভব হয়েছে।

আগুন

ঠাণ্ডা আগুনের দ্রবণ

রহস্যজনক পাত্র—ছোটমামা একটি জাগ থেকে জল ঢাললেন ছ'টা কাচের শূণ্য পাত্রে। আর অবাক কাণ্ড, জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে ছ'টি পাত্রে ছ'রকমের বিভিন্ন রং তৈরি হ'লো। এগুলি হচ্ছে—(১) লাল (২) সাদা (৩) নীল (৪) কালো (৫) সবুজ (৬) এ্যামবার।

কেরিক এ্যামোনিয়াম সালফেট

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
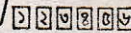
ছোটমামা কি করে এটা করেছিলেন তা তোমাদের বলছি। জাগের মধ্যে ৫০০ সি. সি. জল নিয়ে তিনি তার মধ্যে পাঁচ গ্রাম ফেরিক এ্যামোনিয়াম সালফেট গুললেন। আর এক থেকে ছয় নম্বর পর্যন্ত খালি পাত্রের ভিতর তিনি রাখলেন খুব অল্প জলে আধ গ্রাম কয়েকটি জিনিষ। এরা হ'ল—(১) পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট (২) বেরিয়াম ক্লোরাইড (৩) পটাসিয়াম-ফেরো সায়ানাইড (৪) ট্যানিক এ্যাসিড (৫) টারটারিক এ্যাসিড (৬) সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট্। ফেরিক এ্যামোনিয়াম সালফেটের সাথে বিভিন্ন আয়নের বিক্রিয়ার জন্য পাত্রে এই রকম ভিন্ন ভিন্ন রংয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

সাপের খেলা—বেসিনে তিন গ্রাম প্যারা-নাইট্রো-এ্যাসিটানালাইড এবং এক সি. সি. ঘন সালফিউরিক এ্যাসিড ছোটমামা একটু ঢেলে সেটাকে বুনসেন বার্নারের সাহায্যে দু'তিন মিনিট উত্তপ্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেসিন থেকে এক ফুটেরও বেশি লম্বা সাপের মতন দেখতে, এঁকে বেঁকে বেরিয়ে আসতে লাগলো আর চারদিক ধোঁয়ায় ভরে উঠলো। ঘন সালফিউরিক এ্যাসিড প্যারা-নাইট্রো-এ্যাসিটানালাইডকে কালো কার্বনে পরিণত করার জন্যই বেসিন থেকে সাপ বেরিয়ে এল!

বরফের গাছ—ছোটমামা প্রায় সাত ইঞ্চি লম্বা এবং পাঁচ ইঞ্চি চওড়া পাতলা একটি তামার পাত (কপার সীট) নিয়ে সেটাকে গাছের মত করে কেটে নিলেন। তারপর তিনি তিন লিটারের একটা বড় বীকারের মধ্যে দু'গ্রাম সিলভার নাইট্রেটের একটি জলীয় দ্রবণ তৈরি করলেন। এবার তিনি ঐ তামার সীটটা সম্পূর্ণ বীকারের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। চন্দ্রভানু হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে—কি সুন্দর বরফের গাছ হয়েছে!
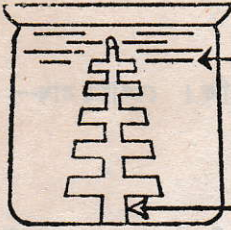
লবু জিজ্ঞাসা করল—কি করে বরফের গাছ হ'ল মামা?

মামা বললেন—কপার জারিত অর্থাৎ অক্সিডাইজড্ হ'ল সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে। আর সেই সঙ্গে সিলভার আয়ন বিজারিত অর্থাৎ রিডিউসড্ হ'য়ে গেল সিলভার ধাতুতে।

সেদিন ওদের বাড়ীতে ছোটমামার কেমিক্যাল ম্যাজিক জমেছিল খুব ভালো।

১৩৭৭

★ আমরা আপন কর্ম্ম স্বহস্তে করিলে যত উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবেক, অন্যের উপর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে; হয়ত সম্পন্নই হইবেক না। অতএব আমরা স্বয়ং যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারি, অন্যের উপর সে বিষয়ের ভার সমর্পণ করা কদাচ উচিত নহে।

—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ইন্দ্রজাল

যাদুসম্রাট পি. সি. সরকার

এবারে একটি খুব সহজ অথচ সুন্দর ইন্দ্রজালের কৌশল নিয়ে হাজির হচ্ছি। খেলাটির নাম—

মন্ত্রঃপূত দুধের খেলা
(MILK MIRACLE)

যাদুকর রঙ্গমঞ্চে এক বোতল দুধ নিয়ে এসে হাজির হলেন। কলিকাতায় যেমন কেভেন্টার অথবা হরিণঘাটার দুধের বোতল পাওয়া যায় অনুরূপ বোতল। বিলাত, আমেরিকা ও জাপানে খুব সুন্দর সুন্দর অনুরূপ দুধের বোতলে দুধ বিক্রী হয়। সেই বিলাতী কায়দা এখন আমাদের দেশেও চালু হয়েছে। তবে ওদের দেশের দুধের বোতল আরও সুন্দর স্বচ্ছ কাঁচে তৈরী এবং খেলার [illegible]ক্ষ বিশেষ উপযোগী।

যাদুকর একটি কোয়ার্টার বোতল তিন-চতুর্থাংশ দুধ ভর্তি করে দর্শকদের সামনে আসলেন। তারপর একটি কাগজ, কার্ডবোর্ড বা খালি হাত দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরে (প্রদত্ত চিত্রের মত করে) একদম উপুড় করে ধরে তারপর হঠাৎ নীচ থেকে হাত, কাগজ বা কার্ডবোর্ড সরিয়ে নিলেন। যাদুকরের যাদুমন্ত্র প্রভাবে ঐ উপুড়-করা বোতল থেকে এক ফোঁটা দুধও মাটিতে পড়বে না। যাদুকর তার হাতে একটা লম্বা সরু তারের লম্বা পিণ ঐ বোতলের নীচ মুখ দিয়ে ক-এর মত করে উপর দিকে ঠেলে তুলে দিলেন। উলের বড় সরু কাঁটা, হ্যাট-পিণ কিম্বা সরু তারের তৈরী লম্বা একটা ফলা দিয়ে নীচ থেকে উপর দিকে খুঁচিয়ে দিলেও দুধ পড়বে না। অথচ মজা এই যে, গ-এর মত করে বোতলটা সামান্য কাঁত করে ধরলে অনায়াসে নীচে একটা বাটীতে দুধ ঢেলে দেখানো যেতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে দুধ পড়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে আবার একদম উপুড় করে দেখানো যায়। যতবার খুশী দুধ ইচ্ছা মত ঢালা যায় আবার ইচ্ছামত দুধ পড়ে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া যায়। সবাই এই মন্ত্রঃপুত দুধের খেলা দেখে অবাক হয়ে যাবেন। দুধের পরিবর্তে জল দিয়ে, সরবৎ দিয়ে, সিরাপ প্রভৃতি

তরল পদার্থ দিয়ে এই খেলা দেখানো চলে। তবে অর্ধেক দুধ, অর্ধেক জল গুলে পাতলা দুধ দিয়ে এই খেলাটি দেখানো উচিৎ ; তাতে খেলাটা সুন্দর হয় এবং খরচও অপেক্ষাকৃত কম হয়।
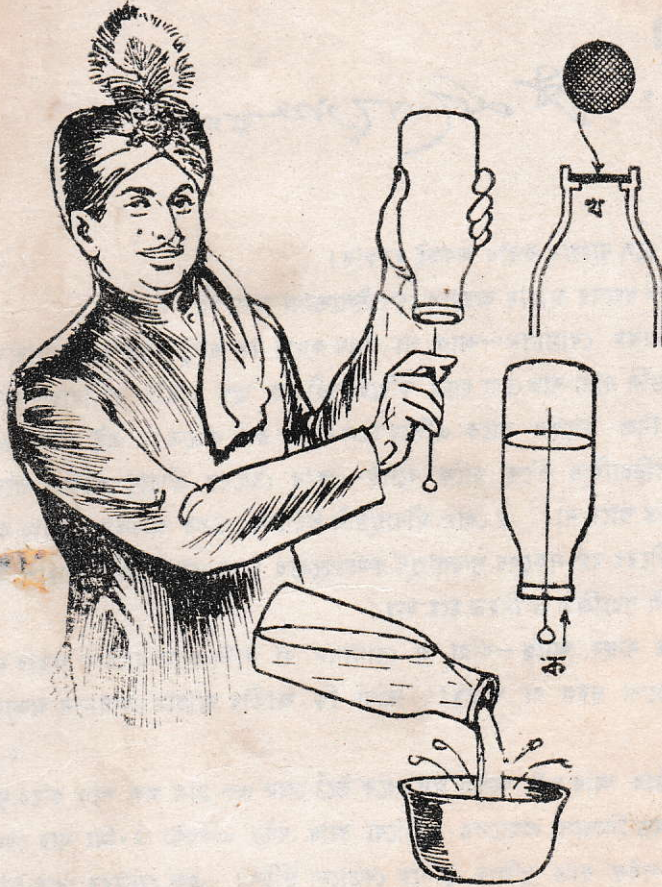
এবার খেলাটির মূল কৌশল বলা হচ্ছে। 'খ' চিত্রে একটা গোল জালের চাকা দেখানো হয়েছে ঐটি বোতলের মুখে লাগিয়ে নিতে হয়। সরু তারের জাল কেটে এটি তৈরী করে নিতে হয়। বিলাতে প্লাষ্টিকের সরু জাল কিনতে পাওয়া যায়—সেগুলি দিয়ে এটি খুব সুন্দর হয়। প্রদত্ত চিত্রের মত গোল জালের চাকতিটি বোতলের মুখে লাগানো থাকাতে—এক-দম উপুড় করলে দুধ পড়বে না কিন্তু বোতলটি অর্ধেক কাত করে ধরলে দুধ পড়তে থাকবে। সরু তার, লম্বা ছুঁচ, ঐ জালের ফাঁকের মধ্য দিয়ে অনায়াসে যাতায়াত করবে। কাঠিটা চলে যাবে অথচ দুধ পড়বে না—এ দেখে সবাই অবাক হবে। বিজ্ঞানের Surface tension বা Capillary action-এর দরুণ এই খেলাটি সম্ভবপর হয়েছে। নিজেরা করে দেখলে অবাক হয়ে যাবে।

১৩৭৭

—

শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হলে ব্যায়াম করার অবশ্যই দরকার।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি ধরণের ব্যায়াম অভ্যাস বেশ উপভোগ্য হতে পারে ?

আমার ধারণা সহজ, প্রথম যোগাসন—আর গা গরম করার মত একটু খালি-হাতে ব্যায়াম। এর ফলে শরীরের ভেতরের যন্ত্রগুলি যারা খাদ্য দ্রব্য হজম করিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখার দাবীদার—তারা অলস হয়ে না থেকে নিজ নিজ কাজের ডাকে এগিয়ে চলে কর্ত্তব্য রক্ষা করতে। এই কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব অবিরত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হ'তে থাকে বলেই—কোন রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করলেও ঠিক আস্তানা গাড়তে পারে না। ঐ রোগ জীবাণুগুলি শরীরের ভেতর অধিকার পাবার জন্য প্রচণ্ড লড়াই সুরু করে কিন্তু শরীরের যন্ত্র সকলের শৃঙ্খলাপুর্ণ কর্মচাঞ্চল্যের দ্বারা যে শক্তির বিকাশ হয় তারই আঘাতে রোগ জীবাণুগুলি পরাজিত ও নিহত হয়ে যায়।

আমাদের মধ্যে এমনও মানুষ আছে—যারা ঐ যোগাসন বা খালি-হাতে ব্যায়াম করার মত শারীরিক অবস্থা নেই—খুবই হয়তো দুর্বল বা অসুস্থ। তারা কি জাতীয় ব্যায়াম যোগাসন অভ্যাস করতে পারেন ?

তাঁদের পক্ষে—সূর্য ওঠার আধ ঘন্টা আগে ঘুম থেকে উঠে স্রেফ এক গ্লাস জল পান ক'রে মুক্ত জায়গায় বড় বড় পা ফেলে বড় বড় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সাহায্যে আধ ঘন্টা একঘন্টা ২০মিঃ যার যেমন শরীরের অবস্থা তেমন সময় পর্যন্ত হাত দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়ানো উচিৎ। এবং ভোরের রোদ গায়ে লাগানো উচিৎ। এতে কি উপকার হবে জানো ? সেই সুস্থতা রক্ষা করতে প্রাথমিকভাবে তোমার শরীরে যে জাতীয় শক্তি ও রক্তের প্রয়োজন ছিল তার যথেষ্ট অভাব আছে বলেই তুমি সাধারণের চাইতে দুর্বল বা কমজোর। সেই শক্তি পেতে হলে তোমায় প্রথম প্রথম কোন ব্যায়াম জাতীয় কিছু অভ্যাস না ক'রে এভাবে বিশুদ্ধ বায়ু এবং সূর্যকিরণ থেকে রোগ নিবারক শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। যোগ ব্যায়াম

এবং খালি-হাতে ব্যায়ামের দ্বারা যেমন হজমের পুষ্টি বৃদ্ধি হয় তেমনি এ দ্বারাও হজম শক্তির উন্নতি হয়। কিছু দিন নিয়মিত তোমরা অভ্যাস ক'রে দেখো শুধু শরীরই নয়, মনটাও কেমন হালকা অথচ ভরসায় ভরে উঠেছে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় "প্রাকৃতিক পদ্ধতি।"

দুর্ব্বল জাতীয় ব্যক্তিরা এই প্রাকৃতিক নিয়মে কিছু দিন থেকে যদি পরে যোগাসন এবং খালি-হাতে ব্যায়াম অভ্যাস সুরু করে খুবই আশাপ্রদ ফললাভ হবে—মানে সেই সৌম্য জৌলুস চেহারা প্রকাশ পাবেই।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে তোমাদের একটি কথা বলে রাখা ভাল—এই যে যোগ ব্যায়াম বা যোগাসন এবং খালি-হাতে ব্যায়ামের কথা বলা হ'ল—তার পরিমাণ-মাত্রা প্রথম প্রথম যেন খুব একটা বেশী না হয়, রোজ সহজ ও শান্তিভাবে যাতে অন্ততঃ ১৫ থেকে ৩০ মিঃ অভ্যাস করলেই আপাততঃ যথেষ্ট হবে।

আর প্রতিটি যোগাসনের আলাদা ধরণের গুণাগুণ রয়েছে। ঝট্‌পট্ যেটা খুশী, যতগুলি খুশী—যতক্ষণ করে যাওয়াটিও সমীচীন নয়। যোগাসনের মোটামুটি গুণাগুণ সম্বন্ধে—অভ্যাসের পরিমাণ সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকলে ভাল হয়। শরীরের প্রকার থেকে কাউকে একটু বেশী সময় কম সময় এবং সংখ্যায় ও কম বেশী ক'রে নিতে হয়। আর প্রত্যেক আসনের পরে শবাসন একটি অত্যাবশ্যকীয় অধ্যায়। এই "শবাসনও" শরীরের প্রকার ভেদে কম বেশী দিতে হয়। খুব একটা বেশী সময় শবাসন করলেও আবার আসনের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে না। তবে সাধারণত ২০, ২৫ সেঃ শবাসন প্রত্যেক আসনের পরে একান্তই প্রয়োজনীয়।

আর খালি-হাতে ব্যায়ামগুলি হবে যাতে শরীরের বিভিন্ন পেশীগুলিতে বেশ একটা হালকা ধরণের সঙ্কুচন এবং প্রসারনের কাজ সমাধান হয়। তাতে পেশী কোষগুলির শক্তি বৃদ্ধি হয়ে নমনীয়তা রক্ষা করবে।

এর বেলায় যোগাসনের মত শুয়ে শবাসন করার দরকার হয় না। ক্লান্ত বোধ হলে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিলেই ক্লান্তি দূর হবে এবং ফের সুরু করা যেতে পারে।

এবার আমার একটি প্রশ্ন আছে তোমাদের কাছে। খাবে কি? ঠিক মত না খেলে তো আর ব্যায়াম করলে শরীর ভাল থাকবে না। যাই হোক খেতেও হবে, আবার তাকে হজমও করতে হবে। হজম না হলেই ভাবতে হবে, হয় সেই খাদ্য সাচ্চা নয় বা পরিমাণের অতিরিক্ত হয়ে গেছে কিংবা নিয়ম মাফিক পাকস্থলীকে খাদ্য না দেবার ফলে Stomach Juice মানে Gastrick Juice যা পরিমাণ মত খাদ্যের সঙ্গে মেশা উচিৎ ছিল হজমের কাজের জন্য। কিন্তু খাদ্য না পেয়ে বেচারী খালি পেটে পড়লে বদ হজম হতে পারে। এই জুসটা পেটে হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড হয়ে পাকস্থলীতে যে সব খাদ্যে ব্যাক্‌টেরিয়া জীবাণু থাকে তাদের ধ্বংস করে এনজাই মেটিক কাজের চূড়ান্ত উন্নতি করে। তাই যথা সময়ে খাদ্য গ্রহণ করা প্রত্যেকের উচিৎ।

আমি এখানে আলোচনা করতে চাই না—তোমাদের প্রত্যহ কি খাওয়া উচিৎ। তবে একটা কথা স্মরণ রাখবে যাতে প্রত্যেক খাদ্যে A B C D ভিটামিন বস্তুটি থাকে। শরীর সুস্থ রাখতে প্রত্যেকটি ভিটামিনের একান্ত দরকার নচেৎ শরীর কম জোরী হয়ে যায়।

শাক-সব্জি, ডাল, ফল-মূল, মুড়ি, চিড়া, খই ইত্যাদি ভেজাল হওয়া কঠিন। অথচ এতে সব ভিটামিনই বিদ্যমান। কাজেই যার যেমন সহ্য হয় তেমন পরিমাণ খাবে। তার পর সাধ্য মত বিশুদ্ধ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, যার যেমন খুশী খেতে পারো। মনে থাকবে তো?

ছোট্ট টুকুন মেয়ে

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী

ছোট্ট টুকুন মেয়ে
কোঁকড়া কালো চুলের রাশি পড়ছে দু'ধার ছেয়ে।
ডাগর দুটি চপল আঁখি
মনের ভাষা বল্‌ছে তা' কি ?
খিল্‌-খিল্‌-খিল্‌ হাস্‌ছে সদাই উপ্‌চে পড়ে বেয়ে।

ছোট্ট টুকুন মেয়ে
এধার ওধার বেড়ায় ছুটে খুশীর ধারায় নেয়ে।
দূরের থেকে হঠাৎ ঝুঁকে
লুটিয়ে পড়ে মায়ের বুকে,
দু'হাত দিয়ে আঁক্‌ড়ে ধরে ঝল্‌কে হঠাৎ যেয়ে।

ছোট্ট টুকুন মেয়ে
কখন কারো আশ মিটে না মুখের পানে চেয়ে।
আলতা-রাঙা নরম গালে
টোল পড়ে গো নাচের তালে,
ছল্‌কে চ'লে নাচছে সদাই আপন-মনে গেয়ে।

ছোট্ট টুকুন মেয়ে
আকুল-করা রূপটি নিয়ে দীপ্ত সবুজ কে এ ?
(ভাবি) দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরি
দু'হাত দিয়ে হৃদয় ভরি,
শূন্য হৃদয় পূর্ণ হবে এমন মেয়ে পেয়ে।

১৩৫২